contents

রিয়াযুছ-ছালিহীন

জীবন পথের পাথেয়

[২য় খণ্ড]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

contents

সূচীপত্র

contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় – ১১

আল্লাহর রাস্তায় মেহনত-মোজাহাদা

মুজাহাদা অর্থ নফস নামক যে একটি শক্তি মানুষের মাঝে গচ্ছিত রাখা হইয়াছে উহাকে পার্থিব জীবন এবং পরকালীন জীবনের যাহা কিছু কল্যাণকর তাহাতে নিয়ুক্ত করা এবং যাহা কিছু ক্ষতিকর তাহা হইতে নিবৃত্ত করা। কিন্তু নফস স্বভাবগতঃভাবেই প্রবৃত্তি তথা ক্ষতি ও অকল্যাণমূলক কর্মে আসক্ত এবং উপকার ও কল্যাণমূলক কর্মে অনিচ্ছুক। ফলে নফসের সহিত তাহার একটা লড়াই লাগিয়াই থাকে; যেমন মানুষ তাহার প্রতিপক্ষ মানুষ-শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে। তবে মানুষ-শত্রুর সহিত মানুষের লড়ায় হয় অস্থায়ী। পক্ষান্তরে নফসশত্রুর সহিত তাহার লড়াই হইল স্থায়ী। মৃত্যু পর্যন্ত উহা একটানা অব্যাহত থাকে। এই লড়াইয়ে শয়তান সর্বদা নফসকে শক্তি যোগায়। সুতরাং অকল্যাণ ও ধ্বংসের পথ হইতে বাঁচিয়া চিরকল্যাণ ও চিরমুক্তির পথে অগ্রসর হইবার জন্য মানুষকে নিরন্তর দুইটি প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া চলিতে হয়। একটি হইল নফস, অপরটি হইল শয়তান। এই লড়াইকে হাদীছ শরীফে বলা হইয়াছে الجهاد الاكبر কেননা এখানে শত্রু দৃশ্যের অগোচর এবং তাহার অস্ত্র হইল খাহেশাত। তবে এই জিহাদে মানুষ একা নহে। আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, নফস

ও শয়তানের বিরুদ্ধে বান্দা যখন জিহাদ ও মুজাহাদা করিবে তখন আমি তাহাকে সাহায্য করিব।

নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে এই জিহাদ ও মুজাহাদায় জয়ী হইবার একমাত্র পথ হইল শরীয়তের উপর অবিচল থাকা এবং সুন্নতের ইত্তিবা করা। বস্তুতঃ সুন্নতের উপর আমল যত বেশী পূর্ণাংগ হইবে নফস ও শয়তান তাহার মুকাবেলায় তত বেশী দুর্বল হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে বান্দা সুন্নতের রাস্তা হইতে যত বেশী দূরে সরিয়া যাইবে নফস ও শয়তানের আধিপত্য তাহার উপর তত বেশী প্রবল হইবে। মানুষ-শত্রুর বিরুদ্ধে সাধারণ যুদ্ধেও যোগ্য সেনাপতির অধিনায়কত্ব ছাড়া জয় লাভ করা সম্ভব হয় না। তদ্রূপ নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ ও মুজাহাদার ক্ষেত্রেও একজন যোগ্য সেনাপতির অধিনায়কত্ব মানিয়া লওয়া অপরিহার্য। অন্যথায় পরাজয় ও ধ্বংস অনিবার্য। এই দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং ইহা তাঁহার নবুয়তি দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ *

(তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদের (হৃদয় ও আত্মাকে মুজাহাদার মাধ্যমে) পবিত্র করিবেন।

তাঁহার পরবর্তী যুগে এই দায়িত্ব বর্তাইয়াছে হক্কানী ওলামায়ে কেরাম তথা পীর মাশায়েখগণের উপর। নবীর ওয়ারিছ হিসাবেই নববী তরীকায় এই দায়িত্ব তাঁহারা যুগ পরম্পরায় আঞ্জাম দিয়া আসিতেছেন। সুতরাং যে কোন হক্কানী আলিম বা শায়খের ছোহবত ও তারবিয়াত গ্রহণ করা অতীব জরুরী।

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ *

যাহারা আমার জন্য মেহনত-মুজাহাদা করে আমি তাহাদিগকে আমার (নৈকট্য লাভের) পথ সমূহ অবশ্যই প্রদর্শন করিব। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুহসিনদের সংগে আছেন।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا *

(হে নবী!) আপনি আপন প্রতিপালকের নাম স্মরণ করিতে থাকুন এবং তাঁহার প্রতি একান্তভাবে নিবেদিত হউন।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ *

আপনার নিকট মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত আপন প্রতিপালকের ইবাদত করিতে থাকুন।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ *

যে কেহ্ বিন্দু পরিমাণও নেক আমল করিবে সে (আপন প্রতিপালকের নিকট) উহা(র ছাওয়াব ও প্রতিদান অবশ্যই) পাইবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا *

তোমরা নিজেদের জন্য যে কোন নেক কাজ অগ্রবর্তী করিবে উহা আল্লাহর নিকট পাইবে আর উহা (তোমাদের দুনিয়ায় ছাড়িয়া আসা সম্পদ হইতে) উত্তম এবং প্রতিদান হিসাবেও বড়।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ *

তোমরা যে কোন নেক আমল করিবে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। (সুতরাং তিনি উহার প্রতিদান দিবেন।)

এই সংক্রান্ত কোরআনী আয়াত সুপ্রচুর ও সুপরিজ্ঞাত।

ফায়দা ঃ

(যাহারা আমার জন্য মুজাহাদা করে) অর্থাৎ কাফির মুশরিক ও বিধর্মীদের পক্ষ হইতে আগত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া আমার পথে অবিচল থাকিতে চাহে; তদ্রূপ নফস ও শয়তানের ধোকা ও প্ররোচনার মুকাবিলা করিয়া আমার পথে অবিচল থাকিতে চাহে এবং সেই জন্য মেহনত মুজাহাদা করে অথচ কোন কূল কিনারা পাইতেছে না। তদ্রূপ কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে আমার মুহব্বতে জিহাদ করিতেছে অথচ বিজয় লাভের উপায় খুঁজিয়া পাইতেছে না–এই উভয় প্রকার জিহাদ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ওয়াদা করিতেছেন যে, আমি অবশ্যই তাহাদিগকে আমার পথসমূহ প্রদর্শন করিব। অর্থাৎ যেই পথে তাহাদের কল্যাণ নিহিত সেই পথে তাহাদিগকে পরিচালিত করিব।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইলম অনুযায়ী আমল করিবার জন্য যাহারা মেহনত মুজাহাদা করে আমি তাহাদের জন্য ইলমের নতুন নতুন পথ খুলিয়া দেই। ফলে তাহাদের ইলম গভীর হইতে গভীরতর এবং ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইতে থাকে।

ফোযায়ল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেন, যাহারা আমার দ্বীন ও শরীয়তের ইলম হাছিল করিবার জন্য মেহনত করে আমি তাহাদের জন্য ঐ ইলম মুতাবিক আমল করাও সহজ করিয়া দেই।

এইভাবে মুজাহাদার বিভিন্ন অর্থ বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি মুজাহাদা হইল বিপদাপদের পরীক্ষার সময় ধৈর্যধারণ করা এবং মুখে শেকায়াতের শব্দ উচ্চারণ না করা। তখন

আল্লাহর নৈকট্য এবং হৃদয়ের স্বচ্ছতা লাভ হইবে। হাদীছ শরীফে আছে–

ان ابتلاء المؤمن يذهب عنه درنه *

মুমিনের বিপদাপদ তাহার (অন্তরের) ময়লা দূর করে।

আরেকটি মুজাহাদা হইল নফসকে সংযমের মধ্যে রাখা। খাহেশাত হইতে বঞ্চিত করা এবং আল্লাহর ফরমাবরদারিতে বাধ্য করা। হাদীছ শরীফে ইহাকে الجهاد الاكبر বা বড় জিহাদ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইকে الجهاد الاصغر বা ছোট জিহাদ বলা হইয়াছে। ইহা অবশ্য অতি ব্যাপক বিষয়, ইহার অধীনে শরীয়তের যাবতীয় আদেশ নিষেধ আসিয়া গিয়াছে।

(পথসমূহ প্রদর্শন করিব) বহুবচনের ব্যবহারে এই দিকে ইংগিত রহিয়াছে যে, আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের পথ অসংখ্য।

(মুহসিনদের সংগে আছেন) মুহসিন ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে, আল্লাহর এমনভাবে ইবাদত করে যেন সে আল্লাহকে দেখিতেছে। যদি সে আল্লাহকে নাও দেখে তবে আল্লাহ তাহাকে দেখিতেছেন। এই অনুভূতি যাহার অন্তরে জাগরূক থাকিবে সে আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যসৌভাগ্যে ধন্য হইবে। এই আয়াতে সেই সুসংবাদই দান করা হইয়াছে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন–

انا جليس من ذكرني و انا مع عبدى اذا ذكرني و تحركت بى شفتاه *

যে আমার যিকির করে আমি তাহার সহচর হই। আর বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে এবং আমার স্মরণে তাহার ঠোঁট নড়ে তখন আমি তাহার সংগে থাকি। (বায়হাকী)

(যে কেহ বিন্দু পরিমাণ নেক আমল করিবে) এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন ক্ষুদ্র নেক আমলকেও তুচ্ছ মনে করিতে নাই। কেননা আমল যত ক্ষুদ্রই হউক তাহার প্রতিদান আল্লাহর নিকট পাওয়া যাইবে এবং হইতে পারে যে, উহাই তাহার নাজাত লাভের ওছিলা হইবে।

(উহা আল্লাহর নিকট পাইবে।) অর্থাৎ যাহা আল্লাহর পথে ব্যয় করিবে তাহাই তোমাদের কাজে আসিবে। আর যাহা সঞ্চয় করিবে তাহা তোমাদের কোন কাজে আসিবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবা কেরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মাঝে এমন কে আছে যাহার নিকট আপন সম্পদের চাইতে তাহার ওয়ারিছদের সম্পদ অধিক প্রিয়? ছাহাবা কেরাম আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রত্যেকেরই নিকট তাহার নিজস্ব সম্পদ তাহার ওয়ারিছদের সম্পদের চাইতে অধিক প্রিয়। তিনি বলিলেন, চিন্তা করিয়া দেখ কি বলিতেছ? তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো ইহাই জানি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই নিকট তাহার নিজস্ব সম্পদ হইতে তাহার ওয়ারিছের সম্পদ উত্তম। তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কিভাবে? তিনি বলিলেন, নিজস্ব সম্পদ তো যাহা তোমরা (নিজেদের জন্য) অগ্রবর্তী কর। আর ওয়ারিছদের সম্পদ হইল যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখ। (আর সঞ্চয়ের প্রতিই হইল তোমাদের সকল মোহ)

হাদীছসমূহ

৯৭। আল্লাহর নৈকট্য লাভের বরকত

فَالْاَوَّلُ: عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ: مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ: وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ، فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهٖ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهٖ، وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا، وَاِنْ سَاَلَنِيْ اعطيته؛ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِيْ لَاُعِيذَنَّهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

«آذَنْتُهُ»: اَعْلَمْتُهُ بِاَنِّيْ مُحَارِبٌ لَهُ «اسْتَعَاذَنِيْ» رُوِيَ بِالنُّوْنِ وَبِالْبَاءِ.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার অলীর সহিত শত্রুতা পোষণ করে তাহার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি। আর আমার নিকট ফরযের চাইতে প্রিয় কোন আমল নাই যাহা দ্বারা আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে। আর বান্দা নফল আমল দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করিতে থাকে। এমন কি আমি তাহাকে মুহব্বত করি। আর আমি যখন তাহাকে মুহব্বত করি তখন তাহার কান হইয়া যাই, যাহা দ্বারা সে শুনে এবং তাহার চক্ষু হইয়া যাই, যাহা দ্বারা সে দেখে এবং তাহার হাত হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে ধরে এবং তাহার পা হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে হাঁটে। সে যদি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে তবে অবশ্যই তাহাকে আমি দান করিব আর যদি সে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে অবশ্যই তাহাকে আমি আশ্রয় দান করিব। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

যে সকল হাদীছ আল্লাহ পাক তাঁহার রাসূলের যবানীতে স্বয়ং কালাম করিয়াছেন সেই সকল হাদীছকে হাদীছে কুদসী বলে। এই সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনা পিছনে গিয়াছে।

অলী শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রিয়পাত্র বা বন্ধু। তাছাওউফের পরিভাষায় আল্লাহর অলী বলা হয় ঐ নেক বান্দাকে যিনি আল্লাহর আদেশ নিষেধ মান্য করিয়া, তাঁহার রাসূলের সুন্নতের পূর্ণ ইত্তেবা করিয়া এবং অধিক হইতে অধিকতর নফল ইবাদত করিয়া আল্লাহর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। আল্লাহর প্রেমে তিনি এমনই মশগুল থাকেন যে, মুহূর্তের জন্য তাঁহার স্মরণ হইতে গাফেল হন না এবং আল্লাহর মারিফাতের নূরে এমনই নিমজ্জিত থাকেন যে, তাহার নূরাণী কলবে অন্য কাহারও কল্পনাও স্থান পায় না। ফলতঃ তিনি শুধু আল্লাহর কুদরত অবলোকন করেন এবং তাঁহার আয়াত শ্রবণ করেন এবং তাহার প্রশংসা উচ্চারণ করেন এবং শুধু তাহার আনুগত্যের আচরণ করেন। তিনিই হইলেন মুত্তাকী। তাই আল্লাহ বলেন, ان اولياؤه الا المتقون তাহার অলীগণ অবশ্যই মুত্তাকী হইয়া থাকেন।

(তাহার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি।) বস্তুতঃ ইহা সর্বচূড়ান্ত এক হুঁশিয়ারি যাহার উপরে আর কোন হুঁশিয়ারি হইতে পারে না। আল্লাহর অলীর সহিত শত্রুতা পোষণের ক্ষেত্রে

এই চরম হুঁশিয়ারি হইতে বুঝা যায় যে, অলীর প্রতি ভক্তি মুহব্বত পোষণের আজর-ছাওয়াব ও ফযীলতও অপরিসীম হইবে।

মনে রাখিতে হইবে যে, শত্রুতা পোষণ করা আর নিজ নিজ ইজতিহাদ মুতাবিক হক ও সত্যের খাতিরে বিরোধিতায় অবতীর্ণ হওয়া এক কথা নহে। যেমন ছাহাবা কেরামের মাঝে ঘটিয়াছিল, অথচ তাহারা সকলেই ছিলেন আল্লাহর অলী।

(ফরযের চাইতে প্রিয় কোন আমল নাই) অর্থাৎ ফরযসমূহ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়, আবার নফল দ্বারাও হয়। তবে ফরয দ্বারা যে নৈকট্য লাভ হয় উহা আল্লাহর নিকট নফল আমল দ্বারা অর্জিত নৈকট্য হইতে অনেক প্রিয়। বর্ণিত আছে যে, ফরযের ছাওয়াব নফলের চাইতে সত্তর গুণ বেশী। তাহাছাড়া ফরয হইল বুনিয়াদ আর নফল হইল উক্ত বুনিয়াদের উপর তৈয়ার প্রাসাদ। কিংবা ফরয হইল তরুতাজা বৃক্ষ আর নফল হইল তাহার ফুল ও ফল।

(আমি তাহার কর্ণ, চক্ষু, হস্ত পদ হইয়া যাই।) ইহার অর্থ সর্ববিষয়ে আমি তাহার সাহায্যকারী হইয়া যাই। মানুষ সাধারণতঃ বিভিন্ন কাজে এই সকল অংগ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। তাই আল্লাহ পাক এই সমস্ত অংগ উল্লেখ করিয়া তাহাকে পূর্ণরূপে সাহায্য করিবার কথা বুঝাইয়াছেন।

সর্বেশ্বরবাদীরা ইহাকে বাহ্য অর্থেই গ্রহণ করিয়া থাকে এবং বলে যে, আল্লাহ ও বান্দাতে কোন ভেদ নাই। উভয়ে অভেদ। কিংবা তিনি বান্দার মাঝে আত্মপ্রকাশ করেন। এই আকীদা কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা কুফুরি ও গোমরাহী রূপে সুপ্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ তাঁহার অনুরূপ কিছু নাই।

৯৮। বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

اَلثَّانِي : عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : «اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَاِذَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَاِذَا اَتَانِي يَمْشِي اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আনাস (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, আর তিনি আপন প্রতিপালক (আল্লাহ রাব্বুল আলামীন) হইতে বর্ণণা করেন। আল্লাহ বলেন, বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় তখন আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যখন সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তখন আমি তাহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। আর বান্দা যখন আমার দিকে হাঁটিয়া আসে আমি তখন তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

বুখারী শরীফের বিখ্যাত ভাষ্যকার ইমাম কিরমানী (রহঃ) বলেন, শরীয়তের অকাট্য দলীল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, এই জাতীয় শব্দাবলী আল্লাহ সম্পর্কে প্রযুক্ত হওয়া অসম্ভব।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা শরীর ও আকার আকৃতির ক্ষুদ্রতা হইতে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র। সুতরাং শব্দগুলির রূপক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ বান্দা যদি সামান্য আমলও করে আমি তাহাকে অসামান্য ছাওয়াব দান করি। সে ইবাদত বন্দেগী যত বাড়াইয়া দেয় আমি সেই অনুপাতে ছাওয়াব ও প্রতিদান কয়েকগুণ বাড়াইয়া দেই এবং তাহার প্রতি অধিক হইতে অধিকতর সন্তুষ্ট হইতে থাকি।

বস্তুতঃ এই হাদীছ সকল দয়াময়ের বড় দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সীমাহীন অনুগ্রহ ও দানশীলতারই পরিচায়ক। মানুষ তো এইভাবে দু'আ করে যে, হে আল্লাহ! আমাকেও তোমার রহমতের সামান্য অংশ দান কর। আপন ক্ষুদ্রতা ও অযোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই হয়ত তাহারা এইরূপ দু'আ করে। তাহাদের এই অনুভূতি ও মনোভাব খাটো করিয়া দেখা উচিত নহে। কিন্তু আসুন আমরা আল্লাহর বড়ত্ব ও দানশীলতার প্রতি ভরসা করিয়া এই দু'আ করি। হে আল্লাহ! আমাদিগকে তোমার অপরিসীম করুণার সুবিপুল পরিমাণ দান কর। এমন পরিমাণ যাহা তোমার দানশীলতার পূর্ণ শান মুতাবিক হইবে। আমীন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এইরূপ দু'আ শিক্ষা দিয়াছেন–

اللهم اصنع بنا ما انت اهله و لا تصنع بنا نحن اهله *

হে আল্লাহ! আমাদের সহিত ঐ আচরণই কর যাহা তোমার উপযুক্ত। ঐ আচরণ করিও না যাহা আমাদের উপযুক্ত।

কিতাবে হাদীছটির অংশ বিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ণ হাদীছ এই–

انا عند ظن عبدی بی و انا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی و ان ذکرنی فی ملاء ذکرته فی ملاء خیر منه و اذا تقرب ....

আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণার অনুরূপ আচরণ করি এবং যখন সে (আমার যিকির ও স্মরণ) করে তখন আমি তাহার সংগে থাকি। সুতরাং যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে তবে আমিও তাহাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে মজলিসে স্মরণ করে তবে আমি তাহাকে উহার চাইতে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। আর যখন সে আমার দিকে ....

এই জন্য ওলামায়ে কেরাম বলেন, বেশী বেশী নেক আমল করিয়া এবং মন্দ আমল বর্জন করিয়া আল্লাহর প্রতি রহমত ও মাগফিরাতের সুধারণা পোষণ করা উচিত। তবে নাফরমানিতে লিপ্ত থাকিয়া রহমত ও মাগফিরাতের আশা করা অতি ভয়ংকর।

৯৯। দুইটি অমূল্য অথচ অবহেলিত নেয়ামত

اَلثَّالِثُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «نِعْمَتَانِ(٣) مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : اَلصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٤).

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, (বিরাট) দুইটি নেয়ামত এমন যাহাদের ব্যাপারে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত

অবস্থায় আছে। একটি স্বাস্থ্য, অন্যটি অবসর।

ফায়দা ঃ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই দান করা হইয়াছে যে, তিনি এমন সুসংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ কথা বলিতেন যাহা অন্য মানুষের পক্ষে সম্ভব হইত না। তাহার শব্দচয়ন ও বাক্য সংক্ষেপণ এমন চমৎকার হইত যে, শ্রোতাবর্গ মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিত এবং তাহাদের হৃদয়ের গভীরে চিরজীবনের জন্য উহা রেখাপাত করিত। তদুপরি তাহা এমন অশেষ ভাব ও মর্মসমৃদ্ধ হইত যে, তাহাদের চিন্তাশক্তি উহার ব্যাপ্তি ও গভীরতার সামনে স্তব্ধ হইয়া যাইত। এই সম্পর্কে তিনি নিজেই বলিয়াছেন اوتيت جوامع الكلم। আমাকে সুসংক্ষিপ্ত ও সুসমৃদ্ধ কথা বলিবার অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করা হইয়াছে। বিশাল হাদীছ ভাণ্ডারে এই ধরণের বাণী ও বক্তব্যের অসংখ্য উদাহরণ রহিয়াছে।আলোচ্য হাদীছটি তেমনি একটি সুসংক্ষিপ্ত ও সুসমৃদ্ধ বাণী।

(নেয়ামত) নেয়ামত অর্থ যাবতীয় উত্তম অবস্থা যাহা মানুষকে আল্লাহর পক্ষ হইতে দান করা হয়।

(ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আছে।) হাদীছের মূল শব্দ হইল مغبون ইহার অর্থ যে ব্যক্তি ব্যবসা ও ক্রয় বিক্রয় করিতে গিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ঠকিয়া আসে। যেমন প্রতারিত হইয়া অতি উচ্চ দামে ক্রয় করিল কিংবা অতি অল্প দামে বিক্রয় করিল। এখানে সুস্থতা ও অবসর জীবনের অধিকারী ব্যক্তিকে ব্যবসায়ীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অর্থ সম্পদ হইল ব্যবসায়ীর পুঁজি বা মূলধন, যাহাকে বিচক্ষণতার সহিত ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিয়া সে মুনাফা অর্জন করিয়া থাকে কিংবা নির্বুদ্ধিতার কারণে মুনাফা লাভের পরিবর্তে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুনাফাও যায়, মূলধনও যায়।

তদ্রূপ বান্দাকে মূলধন রূপে সুস্থতা ও অবসর দান করা হয়। এই দুনিয়া হইল আখেরাতের ব্যবসাক্ষেত্র। বান্দা আল্লাহপ্রদত্ত মূলধন তথা সুস্থতা ও অবসর সময়কে আমল ও ইবাদতের কাজে নিয়োজিত করিয়া আখিরাতের বিরাট মুনাফা অর্জন করিতে পারে। ইহা দ্বারা সে জান্নাত খরিদ করিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ লোক এই মূলধনকে কাজে না লাগাইয়া অপচয় ও নষ্ট করে। অতি তুচ্ছ জিনিসের পিছনে কিংবা গোনাহ ও বদ আমলের পিছনে খরচ করে। ফলে যাহা দ্বারা সে জান্নাত খরিদ করিতে পারিত তাহা দ্বারা জাহান্নাম খরিদ করিয়া বসে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ *

উহারাই হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করিয়াছে। ফলে তাহাদের ব্যবসা মোটেও লাভজনক হয় নাই এবং তাহারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হয় নাই।

(স্বাস্থ্য) বস্তুতঃ স্বাস্থ্য ও সুস্থতা আল্লাহ পাকের কত বড় নেয়ামত তাহা ঐ লোকেরাই বলিতে পারিবে যাহারা এই নেয়ামত হারাইয়াছে। চোখের কি মূল্য তাহা ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর যাহার চোখের আলো নিভিয়া গিয়াছে। হাত ও পায়ের কি মূল্য তাহা ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর যাহার এই সকল অংগ কর্তিত হইয়াছে। সুস্থ শরীরের কি মূল্য তাহা ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর যে অর্ধাংগ রোগে বিছানায় পড়িয়া আছে। সুস্থ মস্তিষ্কের কি মূল্য তাহা ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া

বুঝিতে চেষ্টা কর যাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। সুতরাং কেন তুমি এই নেয়ামতের শোকর আদায় করিতেছ না?! কেন তুমি দিন-রাত্র আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হইতেছ না, যিনি তোমাকে এই সুস্থ শরীর ও সুস্থ জীবন দান করিয়াছেন?! ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? যে কোন মুহূর্তে এই নেয়ামত তোমার হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে! বাঁচিয়া থাকিয়াও তুমি মৃতের ন্যায় হইয়া যাইতে পার! তখন ইচ্ছা করিলেও মনের মত ইবাদত করিতে পারিবে না। সুতরাং এখনই সাবধান হও।

তদ্রুপ অবসর জীবনও এক বিরাট নেয়ামত। কিন্তু মানুষ বড় নির্দয়ভাবে সময়ের অপচয় করে। অবসর জীবনের বে-কদরী করে। একশত টাকা চাহিলে কেহই দিতে রাজি হয় না। কিন্তু এক ঘন্টা বসিয়া গল্প গুজবে কাটাইয়া দিতে স্বানন্দে রাজি। অথচ এই সময়টা আমি আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করিতে পারিতাম। এই সময়টুকুই আমার আখিরাতের পুঁজি হইত। এখনও তো জীবনের কিছুটা সময় বাকি আছে। এখনও হুঁশ হওয়া দরকার। আল্লাহর যে সকল বান্দা সময়ের মূল্য বুঝিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবন কাহিনী পড়িয়া দেখুন, কিভাবে সময়কে তাঁহারা কাজে লাগাইতেন এবং কেমন হিসাব করিয়া করিয়া ব্যয় করিতেন।

হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, এক ছাহাবী একদিন উত্তপ্ত বালুতে গড়াগড়ি খাইতেছিলেন আর বলিতেছিলেন, দেখ, মজা ভোগ কর। জাহান্নামের গরম তো ইহার চাইতে বহুগুণ বেশী। রাত্রে মড়ার মত পড়িয়া ঘুমাও। আর সারাদিন বেকার ঘুরিয়া বেড়াও। তিনি এই অবস্থা করিতেছিলেন; এমন সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকট গেলেন এবং বলিলেন, তোমার জন্য আসমানের দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ পাক তোমাকে লইয়া ফিরিশতাগণের মজলিসে গর্ব করিতেছেন।

হযরত দাউদে তাঈ বড় বুজুর্গ ছিলেন। তিনি রুটির টুকরা পানিতে গুলিয়া গিলিয়া ফেলিতেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে বলিলেন, রুটি চিবাইয়া খাওয়া ও গিলিয়া খাওয়ার মধ্যে পঞ্চাশটি আয়াত তিলাওয়াতের ক্ষতি হইয়া যায়।

সুবহানাল্লাহ! এই ত হইল আল্লাহর বান্দাদের অবস্থা। পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা কি? রাত্র গল্পগুজবে কাটিয়া যায়। আবার ঐ বেহুদা রাত্রি জাগরণের কাফ্ফারা দুপুর বেলা পর্যন্ত ঘুমাইয়া আদায় করি।

১০০। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত ও শোকরের জযবা

اَلرَّابِعُ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟! قَالَ: «اَفَلَا اُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا؟» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ، وَنَحْوُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রের কিয়দংশে নামাযে দাঁড়াইতেন। এমন কি তাঁহার কদম মোবারক ফুলিয়া যাইত। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এমন কেন করেন? অথচ আল্লাহ আপনার

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যাবতীয় গোনাহ্ মাফ করিয়া দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, তবে কি আমি শোকরগুযার বান্দা হওয়া পছন্দ করিব না? (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) হইতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

ফায়দা ঃ

মহাতত্ত্বজ্ঞাণী আরিফ বিল্লাহ ইবনে আবী জামরা (রহঃ) বলেন, ইহা যেন কাহারও কল্পনাতেও না আসে যে, আল্লাহ পাক তাঁহার প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সমস্ত গোনাহ স্বীয় করুণাবশতঃ ক্ষমা করিবার সুসংবাদ দান করিয়াছেন উহা আমাদের কৃত গোনাহের সমপর্যায়ভুক্ত। নাউযুবিল্লাহ। এমন মোটেও নহে। উম্মতের সর্ববাদীসম্মত মতে নবীগণ কবিরা গোনাহ হইতে পবিত্র। এমন কি যাবতীয় ছাগীরা গোনাহ্ হইতেও পবিত্র।

বরং তাঁহার ক্ষেত্রে গোনাহের অর্থ এই যে, রাবুবিয়তের যে পরিমাণ হক ও শোকর আদায় করা কর্তব্য, সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের পক্ষে উহা করা সম্ভব নহে। আল্লাহর রাসূলের পক্ষেও সম্ভব নহে, যত উর্ধ্বেই হউক তাঁহার মর্যাদাগত অবস্থান। কেননা উচ্চ মর্যাদা অনুপাতে তাঁহার উপর আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতও অন্যের চাইতে অধিক হইবে। সুতরাং তাঁহার উপর রাবুবিয়াতের হকও বহু গুণে বেশী হইবে। ফলে তাঁহার ক্ষেত্রেও অক্ষমতা সাব্যস্ত হইবে। এই অক্ষমতাকেই গোনাহ হিসাবে মাফ করিবার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে।

মনে রাখা দরকার যে, এই পরিমাণ কষ্টকর ইবাদত তাহাকেই শুধু করিতে বলা হইবে যিনি ইবাদতে ক্লান্ত ও নিরুদ্যম না হন। যেমন হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান ছিল। কেননা নামাযে দাঁড়াইয়া কদম মুবারক ফুলিয়া গেলেও তিনি নিরুদ্যম হইতেন না। বরং বলিতেন–

جعلت قرة عينى فى الصلوة *

নামাযের মাঝেই আমার চক্ষুর শীতলতা রাখা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে যাহারা অতিমাত্রায় ইবাদতে ক্লান্ত ও নিরুদ্যম হইয়া পড়ে তাহাদের জন্য এমন করা মোটেই উচিত নহে। কেননা হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

اكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا *

ঐ পরিমাণ আমলই কর যাহা করিতে সক্ষম হইবে। কেননা আল্লাহ ক্লান্ত হইবেন না। বরং তোমরাই ক্লান্ত হইয়া পড়িবে।

১০১। রমযানের শেষ দশ দিনের রাত্রি জাগরণ

اَلْخَامِسُ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَالْمُرَادُ: الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. «وَالْمِئْزَرُ»: اَلْإِزَارُ، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ

اِعْتِزَالِ النِّسَاءِ، وَقِيْلَ: اَلْمُرَادُ تَشْمِيْرُهُ لِلْعِبَادَةِ. يُقَالُ: شَدَدْتُ لِهٰذَا الْاَمْرِ مِئْزَرِيْ، اَيْ: تَشَمَّرْتُ، وَتَفَرَّغْتُ لَهُ.

হযরত আয়েশা (রাঃ)হইতে বর্ণিত যে, যখন (রমযানের শেষ) দশদিন উপস্থিত হইত তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব রাত্রি জাগরণ করিতেন এবং পরিবার পরিজনকে জাগ্রত করিতেন এবং (সাধারণ সময়ের তুলনায়) অত্যধিক মেহনত করিতেন এবং কোমর বাঁধিয়া ইবাদতে লাগিয়া যাইতেন।

'দশ' দ্বারা রমযানের শেষ দশ দিন উদ্দেশ্য এবং কোমর বাঁধা দ্বারা স্ত্রী সহবাস বর্জনের প্রতি ইংগিত। কাহারও কাহারও মতে ইহার অর্থ ইবাদতের জন্য উত্তম রূপে প্রস্তুত হওয়া।

ফায়দা ঃ

তখন রাত্রি জাগরণের কারণ এই যে, শেষ দশদিনে লাইলাতুল কদর রহিয়াছে যাহা হাজার মাসের চাইতে উত্তম।

তিরমিযি শরীফে হযরত যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে-

لم يكن النبى صلى الله عليه و سلم اذا بقى من رمضان عشرة ايام يدع احدا من اهل بيته يطيق القيام الا اقامه *

যখন রমযানের শেষ দশদিন অবশিষ্ট থাকিত তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পরিবারের (নামাযে) দাঁড়াইতে পারে এমন সকলকেই নামাযে দাঁড় করাইয়া দিতেন।

১০২। কর্মোদ্যম ও তাকদীরে বিশ্বাস

اَلسَّادِسُ: عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ. اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ. وَاِنْ اَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ اَنِّيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلٰكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللّٰهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সামর্থ্যবান মুমিন দুর্বল মুমিনের তুলনায় উত্তম এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। তবে উভয়ের মাঝেই খায়র ও কল্যাণ রহিয়াছে। তোমরা (দ্বীন ও দুনিয়ার) যে কোন কল্যাণকর বিষয় অর্জনে উদ্যগী হও এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। অক্ষম হইয়া পড়িও না। যদি তুমি কোন বিপদ মুছীবতে আক্রান্ত হও তবে এই রূপ বলিও না যে, যদি এমন করিতাম তবে এমন হইত। বরং এইরূপ বল যে, ইহা আল্লাহ পাকের ফায়সালা। আল্লাহ পাক যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছেন। কেননা لو বা 'যদি' শব্দটি শয়তানের কাজের সুযোগ খুলিয়া দেয়।

ফায়দা ঃ

(সামর্থ্যবান মুমিন) সামর্থ্যবান অর্থ যিনি তাঁহার আত্মিক শক্তির কারণে আসবাব (বা উপায় উপকরণের) দিকে তাকান না বরং আসবাবের স্রষ্টা আল্লাহর উপর তাঁহার নযর থাকে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ আখিরাতের ব্যাপারে গভীর আগ্রহী হইবার কারণে ইবাদত মুজাহাদায় অবিচল হিম্মতের অধিকারী। কোন কোন মতে ইহার অর্থ যিনি মানুষের দ্বীনী কল্যাণ সাধনের জন্য ধৈর্যের সংগে তাহাদের সহিত উঠাবসা করেন এবং তাহাদের কষ্টদায়ক আচরণ বরদাশ্‌ত করেন। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ যিনি শারীরিক শক্তি এবং সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী। ফলে হজ্জ, রোযা, দাওয়াত, জিহাদ ইত্যাদি দ্বীন যিন্দাকারী আমল যোগ্যতার সহিত আদায় করিতে সক্ষম।

(দুর্বল মুমিন) قوى বা সামর্থ্যবানের বিভিন্ন অর্থ হিসাবে ضعيف বা দুর্বলের অর্থ হইবে উহার বিপরীত।

(উভয়ের মাঝেই কল্যাণ রহিয়াছে) কেননা উভয়ের অন্তরেই মূল ঈমান বিদ্যমান রহিয়াছে।

(কেননা যদি শব্দটি) অর্থাৎ যদি তাকদীরের প্রতি অনাস্থার মনোভাব লইয়া ইহা উচ্চারণ করে তবে এই ছিদ্রপথে শয়তান মানুষের অন্তরে বিভিন্ন ওয়াসওয়াসা প্রবেশ করায় এবং পরিণতিতে তাহার ঈমানের জন্য সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। পক্ষান্তরে কোন কল্যাণকর জিনিস হাতছাড়া হইবার কারণে যদি এইরূপ বলে কিন্তু অন্তরে এই বিশ্বাস অটুট থাকে যে, আল্লাহর ফায়সালা ছাড়া কিছুই হইবার নহে তবে এই ধরণের কথা বলায় কোন অসুবিধা নাই। কেননা হাদীছ শরীফেও এই ধরণের কথার নযীর রহিয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক প্রসংগে বলিয়াছেন—

لو استقبلت فى امرى ما استدبرت

যাহা আমি পরে বুঝিয়াছি তাহা যদি আগে বুঝিতে পারিতাম (তবে ইহা করিতাম না)

(আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর) অর্থাৎ আপন চেষ্টা মেহনতের উপর ভরসা করিও না। বরং আসবাব অবলম্বনের পর এই বিশ্বাস পোষণ করিও যে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই হইবে না। সুতরাং তাঁহার উপর তাওয়াক্কুল করিও এবং তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিও যে, হে আল্লাহ! আমি আমার যথাসাধ্য মেহনত করিয়াছি এবং প্রয়োজনীয় আসবাব ও উপায় অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু আপনার মদদ ও ফায়সালা ছাড়া কিছুই হইবে না। সুতরাং আমার মাকছুদ হাছিল হইবার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন।

(অক্ষম হইও না) অর্থাৎ আসবাবের উপর এবং আপন মেহনতের উপর ভরসা যেমন করিবে না তেমনি উপায় অবলম্বন ও প্রচেষ্টা গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্রুটি বা শিথিলতাও করিবে না। কেননা তখন শরীয়তের দৃষ্টিতে এবং সাধারণ দৃষ্টিতে তুমি অবহেলা ও ক্রুটিকারী রূপে তিরস্কৃত হইবে। এইভাবে আলোচ্য হাদীছে তকদীর ও তদবীরের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কের ইংগিত প্রদান করা হইয়াছে। অর্থাৎ তকদীর নিশ্চেষ্টতার নাম নহে। তদ্রূপ চেষ্টা-তদবীরও তকদীরের প্রতি অবজ্ঞা প্রর্দশনের নাম নহে। অথাৎ আসবাব অবলম্বনের অর্থ হইল আল্লাহর হুকুম পালন যাহা বান্দার অবশ্যকর্তব্য। অতঃপর যাহা ঘটিবে তাহা আল্লাহর ফায়সালা।

১০৩। জান্নাত-জাহান্নামের আসল ও বাহ্যরূপ

اَلسَّابِعُ: عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «حُفَّتْ» بَدَلَ «حُجِبَتْ» وَهُوَ بِمَعْنَاهُ؛ أَيْ: بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا هٰذَا الْحِجَابُ؛ فَإِذَا فَعَلَهُ دَخَلَهَا.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জান্নাতকে বিভিন্ন কষ্টদায়ক জিনিস দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছে এবং জাহান্নামকে বিভিন্ন খাহেশাত দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

ইমাম নববী (রহঃ) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালনের কষ্ট ভোগ এবং খাহেশাত বর্জনের সংযম ছাড়া জান্নাত লাভ করা এবং জাহান্নাম হইতে নাজাত পাওয়া সম্ভব নহে।

আল্লামা মুহম্মদ বিন আল্লান (রহঃ) বলেন, খাহেশাত দ্বারা হারাম খাহেশাত বুঝানো হইয়াছে। সুতরাং জায়েয খাহেশাত উপভোগ করিতে কোন বাধা নাই। তবে ইহাও অধিক মাত্রায় করা উচিত নহে। কেননা তাহাতে কলব মুর্দা ও কঠিন হইয়া যায় এবং ইবাদতের তাওফিক কমিয়া যায়।

এই প্রসংগে নিম্নবর্ণিত হাদীছটি অতিঅবশ্যই প্রনিধানযোগ্য।

عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لما خلق الله الجنة ارسل جبريل عليه السلام الى الجنة، فقال انظر اليها و الى ما اعددت لاهلها فيها، فنظر اليها فقال: و عزتك لا يسمع بها احد الا دخلها، فامر بها فحفت بالمكاره، فقال اذهب اليها فانظر اليها و الى ما اعددت لاهلها فيها، فنظر اليها فاذا هى قد حفت بالمكاره فقال: و عزتك لقد خشيت ان لا يدخلها احد، قال اذهب الى النار و الى ما اعددت لاهلها فيها فنظر اليها فاذا هى يركب بعضها بعضا، فرجع فقال: و عزتك لا يدخلها احد فامر بها فحفت بالشهوات فقال: ارجع فانظر اليها فنظر اليها فاذا هى قد حفت بالشهوات فرجع و قال: و عزتك لقد خشيت ان لا ينجو منها احد الا دخلها *

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ যখন জান্নাত পয়দা করিলেন, তখন হযরত জিবরীল (আঃ)-কে জান্নাতে পাঠাইলেন এবং বলিলেন, জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের জন্য উহাতে যাহা কিছু প্রস্তুত করিয়াছি তাহা পরিদর্শন করিয়া আস। তিনি উহা পরিদর্শন করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনার ইয্যতের কসম! এই জান্নাতের কথা যে শুনিবে সে-ই উহাতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর আল্লাহ পাকের হুকুমে জান্নাতকে বিভিন্ন কষ্টদায়ক বিষয় দ্বারা বেষ্টিত করা হইল। তখন (আল্লাহ তাঁহাকে) বলিলেন, যাও, জান্নাত এবং জান্নাতবাসীদের জন্য উহাতে

যাহা কিছু প্রস্তুত করিয়াছি তাহা দেখিয়া আস। তিনি দেখিলেন যে, উহাকে বিভিন্ন কষ্টদায়ক বস্তু দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, আপনার ইয্যতের কসম! আমার আশংকা হয় যে, উহাতে কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না।

আল্লাহ বলিলেন, যাও, জাহান্নাম এবং জাহান্নামীদের জন্য উহাতে যাহা কিছু প্রস্তুত করিয়াছি তাহা দেখিয়া আস। তিনি গিয়া দেখেন যে, জাহান্নামের একাংশ অপরাংশের উপর ক্ষিপ্ত হইতেছে। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনার ইয্যতের কসম! উহাতে কেহই প্রবেশ করিবে না। অতঃপর আল্লাহর হুকুমে উহাকে বিভিন্ন খাহেশাত দ্বারা বেষ্টিত করা হইল। তখন (আল্লাহ তাহাকে) বলিলেন, পুনরায় যাও এবং উহাকে দেখিয়া আস। তিনি দেখিলেন যে, উহাকে বিভিন্ন খাহেশাত দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছে। তখন তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনার ইযযতের কসম! আমার আশংকা হইতেছে যে, কেহই জাহান্নাম হইতে বাঁচিতে পারিবে না। অবশ্যই উহাতে দাখেল হইবে।

আল্লাহ পাকের হিকমত ও রহস্য বুঝিতে পারা মানুষের সাধ্য নহে। বিশ্ব জগতের সমস্ত কিছুকে এবং জান্নাত জহান্নামকে তিনি এমনভাবে সজ্জিত করিয়াছেন, যাহাতে দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনে মানব জাতির পরীক্ষা হইয়া যায়। আবার মানবের প্রতি তাঁহার দয়া ও মেহেরবানী এই যে, কিতাব ও রাসূল প্রেরণ করিয়া সমস্ত কিছু তিনি খুলিয়া খুলিয়া বলিয়া দিয়াছেন যাহাতে অতি সহজেই বান্দা পরীক্ষায় কামিয়াব হইতে পারে। বস্তুতঃ ইহা পরীক্ষাও নহে। পরীক্ষার ছলনা মাত্র। ইহার পরও যদি বান্দা চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখে এবং অন্ধ সাজিয়া ধ্বংসের পথেই চলিতে থাকে তবে কাহার দোষ?

বস্তুতঃ জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়কে আল্লাহ পাক দুইটি রূপ দান করিয়াছেন ভিতরের রূপ ও বাহিরের রূপ। ভিতরের রূপ হইল আসল এবং বাহিরের রূপ হইল নকল। যাহাদিগকে আল্লাহ পাক ভিতরের রূপ অবলোকনের জন্য অন্তর্চক্ষু খুলিয়া দিবেন হযরত জিবরীল আলাইহিস-সালামের কথামত তাহাদের কেহই জাহান্নামে প্রবেশ করিতে চাহিবে না এবং জান্নাতে প্রবেশ না করিয়া ছাড়িবে না। পক্ষান্তরে যাহাদের অন্তর্চক্ষু বন্ধ থাকিবে তাহারা জান্নাত-জাহান্নামের বাহ্য রূপই শুধু দেখিতে পাইবে। সুতরাং জিবরীল (আঃ)-এর কথামত তাহাদের কেহই জান্নাতে প্রবেশ করিতে চাহিবে না এবং জাহান্নামে না গিয়া থামিবে না।

হে আল্লাহ! তোমার রহম করমের তো কোন সীমা পরিসীমা নাই। সুতরাং তোমার দুর্বল বান্দাদের উপর রহম কর। আমাদের অন্তর্চক্ষু খুলিয়া দাও এবং জান্নাত জাহান্নামের হাকীকত বুঝিবার তাওফিক দান কর। আমীন।

১০৪। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ নামায

اَلثَّامِنُ: عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللهِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى؛ فَقُلْتُ
يُصَلِّيْ بِهَا فِيْ رَكْعَةٍ، فَمَضَى؛ فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ؛ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ
اٰلِ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا اِذَا مَرَّ بِاٰيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ، وَاِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَاَلَ، وَاِذَا

مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ» فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً قَرِيْبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى» فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيْبًا مِنْ قِيَامِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু আব্দুল্লাহ হোযায়ফা ইবনুল হয়ামান আনছারী (যিনি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভেদের কথা জানিতেন) বলেন, এক রাত্রে আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়িলাম। তিনি বাকারাহ্ পড়া শুরু করিলেন। আমি ভাবিলাম, হয়ত একশত রাকাতের মাথায় তিনি রুকুতে যাইবেন। কিন্তু তিনি আরও পড়িতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম যে, (হয়ত) এক রাক'আতে ইহা পড়িবেন। কিন্তু তিনি আরও পড়িতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, হয়ত এখন রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি সূরা নিসা শুরু করিয়া উহা শেষ করিলেন। অতঃপর আলে ইমরান শুরু করিয়া উহা শেষ করিলেন। তিনি ধীর ও স্পষ্ট উচ্চারণে তিলাওয়াত করিতেছিলেন। যখন তাসবীহ্সংক্রান্ত আয়াত আসিতেছিল তখন তাসবীহ্ পড়িতেছিলেন। যখন প্রার্থনাসংক্রান্ত আয়াত আসিতেছিল তখন প্রার্থনা করিতেছিলেন। যখন (আল্লাহ্র নিকট) আশ্রয় চাওয়াসংক্রান্ত আয়াত আসিতেছিল তখন আশ্রয় চাহিতেছিলেন। অতঃপর তিনি রুকু করিলেন এবং سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ বলিতে লাগিলেন। (দীর্ঘতার ক্ষেত্রে) তাঁহার রুকু ছিল প্রায় কিয়ামের সমান। অতঃপর سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ربنا لك الحمد বলিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার (রুকু ও সিজদার মধ্যবর্তী) কিয়ামও রুকুর মতই দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তিনি সিজদা করিলেন এবং سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলিলেন। তাঁহার সিজদাও কিয়ামের কাছাকাছি ছিল। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(আমি ভাবিলাম যে, হয়ত এক রাক'আতে ইহা পড়িবেন) এখানে এক রাক'আত দ্বারা পুরা নামায উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দুই রাকাত উদ্দেশ্য। আর রাক'আত দ্বারা পুরা নামায উদ্দেশ্য করিবার নযির রহিয়াছে। এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতেছে পরবর্তী বক্তব্যকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য। অর্থাৎ 'যখন একশত আয়াতের মাথায় তিনি রুকুতে গেলেন না তখন আমার ধারণা হইল যে, তিনি ইহা দ্বারা পুরা নামায পড়িবেন অর্থাৎ সূরাকে দুইভাগ করিয়া দুই রাক'আতে পড়িবেন।

(কিন্তু তিনি আরও পড়িতে লাগিলেন) অর্থাৎ সূরার অধিকাংশ পড়িয়া ফেলিলেন। ফলে আমার প্রবল ধারনা হইল যে, এই সূরা দ্বারা তিনি পুরা নামায পড়িবেন না। বরং সূরা শেষে রুকুতে যাইবেন।

(সূরা নিসা শুরু করিয়া উহা শেষ করিলেন) বর্তমান মাছহাফে উছমানীতে সূরার তারতীবে প্রথমে সূরা আলে ইমরান এবং উহার পরে সূরা নিছা রহিয়াছে। অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে নিসা ও পরে আলে ইমরান পড়িয়াছেন। এই হাদীছের আলোকে একদল আলিম বলেন, বর্তমান মাছহাফে উছমানীর যে তারতীব উহা মুসলমানদের ইজতিহাদনির্ভর বিষয়। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে নির্ধারিত নহে। বরং

বিষয়টিকে তিনি পরবর্তী উম্মতের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং কোরআন শরীফের লেখায় বা তিলাওয়াতে (নামাযের বাহিরে ও ভিতরে) তদ্রূপ তালিমের ক্ষেত্রে তারতীব রক্ষা করা আবশ্যক নহে। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে এই প্রসংগে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ নাই যাহা অমান্য করা হারাম হইবে। এই কারণেই হযরত উছমান (রাঃ)-এর তত্ত্বধানে মাছহাফ (বা কোরআনের অনুলিপি) তৈয়ারীর পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন মাছহাফের তারতীব বিভিন্ন ছিল।

কিন্তু আলিমগণের অন্য এক জামা'আতের মতে মাছহাফে উছমানীতে বিদ্যমান তারতীব রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে নির্ধারণ করা হইয়াছিল এবং গোটা উম্মতের ঐক্যমত উহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং লেখায় ও তিলাওয়াতে ঐ তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। পূর্ববর্তী মাছহাফ সমূহের বিভিন্নতার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ অনুমোদন সম্পর্কে তাঁহাদের অবগতি ছিল না। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এইরূপ পড়া সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, ইহা তাঁহার পক্ষ হইতে তারতীব নির্ধারিত করিয়া দিবার আগের ঘটনা। ইহাই হানাফী মাযহাবের মত।

(তাঁহার সিজদাও কিয়ামের কাছাকাছি ছিল) হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে, সম্ভবতঃ এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত্র নামাযের মাধ্যমে জাগরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য রাত্র সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে জানা যায় যে, তিনি রাত্রের এক তৃতীয়াংশ নামায পড়িতেন। সেখানে ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি (বিতরসহ) এগার রাক'আতের বেশী পড়িতেন না। সুতরাং বোঝা গেল যে, ঐ নামায মোটামুটি দীর্ঘ হইত। (আল্লাহই উত্তম জানেন)

(যখন তাসবীহসংক্রান্ত আয়াত) নফল নামাযের মধ্যে ইহা করা যাইতে পারে।

১০৫। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ নামায

التَّاسِعُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوْءٍ! قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এক রাত্রে আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়িলাম। তিনি কিয়াম এত দীর্ঘ করিলেন যে, আমি একটা মন্দ ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়াছিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কি ইচ্ছা করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, বসিয়া পড়িবার এবং (নামায) ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

ফায়দা ঃ

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ হইতে বোঝা গেল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তবিরোধী বা হারাম না হয় ততক্ষণ বড়দের, ওলামা কেরামের ও মাশায়েখগণের কথা বা কাজের বিরুদ্ধাচরণ না করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ ওলামায়ে কেরাম এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, নফলে যদি মুক্তাদীর

দাঁড়াইয়া থাকা কষ্টকর হয় কিংবা ফরযে যদি দাঁড়াইয়া থাকিতে অক্ষম হইয়া পড়ে তবে মুক্তাদীর পক্ষে বসিয়া পড়া জায়েয আছে। অবশ্য ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব রক্ষার্থে বসেন নাই।

তৃতীয়তঃ এই হাদীছ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতি দীর্ঘ নামায পড়া প্রমাণিত হয়। কেননা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) শক্তিশালী মানুষ ছিলেন এবং হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুবহু অনুকরণের প্রতি অতীব যত্নবান ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তাঁহাকে বসিয়া পড়িবার ইচ্ছা করিতে হইয়াছিল।

চতুর্থতঃ ইহাও প্রমাণিত হইল যে, উস্তাদের কোন কথা বুঝে না আসিলে ছাত্রের কর্তব্য হইল জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়া লওয়া। তবে আদব রক্ষার দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখিতে হইবে।

১০৬। আসল সম্পদ নেক আমল

اَلْعَاشِرُ: عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ؛ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقٰى وَاحِدٌ: يَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقٰى عَمَلُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মুর্দারের পিছনে পিছনে তিনটি জিনিস যায়– পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও আমল। তন্মধ্যে দুইটি ফেরত আসে আর একটি সংগে থাকিয়া যায়। পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ফেরত আসে আর আমল সংগে থাকিয়া যায়। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ) পরিবার-পরিজন সর্ব যুগেই জানাযার পিছনে শরীক হইয়া থাকে এবং দাফনপর্ব সমাধা করিবার পরে ঘরে ফিরিয়া আসে। কিন্তু ধন-সম্পদের ব্যাপার এই যে, জাহেলী যুগের রেওয়াজ ছিল, মাইয়েতের মালসামানকেও তাহারা কবর পর্যন্ত লইয়া যাইত। আবার দাফনপর্ব সমাধা করিবার পর নিজেদের সংগে ফেরত লইয়া আসিত এবং নিজেদের মাঝে বন্টন করিত। জাহেলী যুগের এই রেওয়াজের দিকে লক্ষ্য করিয়াই হাদীছে ইহা বলা হইয়াছে।

অবশ্য পূর্ববর্তী কোন কোন জাতির মাঝে আরও হাস্যকর রেওয়াজ ছিল, তাহারা মাইয়েতের সংগে প্রচুর সামানপত্র দাফন করিয়া দিত যাহাতে কবরে মৃত ব্যক্তির কোন অসুবিধা বোধ না হয়।

বস্তুতঃ মানুষ দুনিয়ার জিন্দেগীতে পরিবার পরিজনের আরাম আয়েশের পিছনে এবং তাহাদের সংগসুখ লাভের চেষ্টায় বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়া দেয়। আর এই জন্য হালাল হারাম সকল উপায়ে সম্পদ উপার্জনের মোহে পড়িয়া থাকে। পক্ষান্তরে আমল সম্পর্কে একেবারে গাফেল হইয়া থাকে। অথচ পবিরার-পরিজন ও সম্পদ তাহার কবরের দীর্ঘ জীবনে এবং আখিরাতের অনন্ত জীবনে কোনই কাজে আসিবে না। সেখানে আমলই শুধু কাজে আসিবে। এই জন্য কোরআন শরীফে সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদকে ফিতনা বলা হইয়াছে।

পরিবার পরিজনের অবস্থা তো এই যে, মৃত্যুর গরগরা শুরু হইবার সংগে সংগে তাহাদের চিন্তা শুরু হইয়া যায় যে, এখন আমাদের কি অবস্থা হইবে! কোথায় কি সম্পদ রহিয়াছে? চাবি কোথায়, হিসাবের খাতা কোথায়? কাহাকে বঞ্চিত করিয়া কে বেশী লাভ করিবে! যদিও বা সাময়িক শোকে কাহারও চোখে পানি আসে কিন্তু উহা শুকাইতে বেশী দিন লাগে না। আবার পূর্বের মত হাসি আনন্দের জীবন শুরু হইয়া যায়। কেহ একবারও স্মরণ করে না যে, কবরে আমার কি অবস্থা হইতেছে!

আর মালের অবস্থা তো এই যে, কিয়ামতের দিন (যদি উহার যাকাত আদায় না করা হয়) তবে সাপ হইয়া পেঁচাইয়া ধরিবে আর বলিবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। সুতরাং মুমিনের কর্তব্য হইল এই দুই জিনিসের মোহে না থাকিয়া আমলের প্রতি যত্নবান হওয়া।

অবশ্য আমলের অর্থ ব্যাপক। পরিবারপরিজনের হক আদায় করা এবং আল্লাহর হুকুম হিসাবে তাহাদের ভরণ-পোষণের নিয়তে হালাল উপার্জনের জন্য চেষ্টা মেহনত করা, এই সবই উত্তম আমল ও উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। নিন্দনীয় হইল পরিবারপরিজনের মোহে পড়িয়া আল্লাহর হক ভুলিয়া যাওয়া এবং কৃপণতা ও মালের মুহব্বতের কারণে উহার হক আদায় না করিয়া সঞ্চয় করিতে থাকা।

১০৭। জান্নাত জাহান্নাম মানুষের কত নিকটে

اَلْحَادِيْ عَشَرَ: عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জান্নাত তোমাদের জুতার ফিতার চাইতেও তোমাদের বেশী নিকটবর্তী। জাহান্নামও অনুরূপ (নিকটবর্তী) (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

নিকটবর্তী হইবার অর্থ এই যে, সামান্য ইবাদতও জান্নাতে দাখেল হইবার কারণ হইতে পারে। তদ্রূপ সামান্য নাফরমানিও জাহান্নামে যাইবার কারণ হইতে পারে। সুতরাং মানুষের উচিত ক্ষুদ্র নেক কাজকেও তুচ্ছ মনে না করা। তদ্রূপ সাধারণ গোনাহকেও হালকা মনে না করা। কেননা জানা তো নাই যে, কোন নেক কাজের ওছিলায় আল্লাহ পাক রহম করিবেন কিংবা কোন্ গোনাহের কারণে নারাযির মোহর মারিয়া দিবেন।

যেমন পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈলের এক বদকার মেয়েলোক শুধু এক পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করাইয়া জান্নাতে চলিয়া গেল। পক্ষান্তরে অন্য এক মেয়েলোক বহু ইবাদত করা সত্ত্বেও শুধু বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখিয়া অনাহারে কষ্ট দিবার কারণে কত সহজে জাহান্নামে চলিয়া গেল।

আল্লাহই উত্তম জানেন, হাদীছের এমন অর্থও হইতে পারে যে, পিতা-মাতার খেদমত করিয়া এবং তাহাদের যথাযথ হক আদায় করিয়া অতি সহজেই তুমি জান্নাত হাছিল করিতে পার। আবার তাহাদের অবাধ্য হইয়া এবং তাহাদের মনে কষ্ট দিয়া অতি সহজেই জাহান্নামে

যাইতে পার। আর পিতা-মাতা সম্পর্কের দিক হইতেও নিকটের। আবার বসবাসের দিক হইতেও অতি নিকটের। সুতরাং জান্নাত ও জাহান্নাম যেন মানুষের অতি নিকটেই অবস্থান করিতেছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই হাদীছ শরীফে বলা হইয়াছে هما جنتك و نارك তাহারা দুইজন তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম।

১০৮। অধিক নফল দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভ

اَلثَّانِيْ عَشَرَ: عَنْ اَبِيْ فِرَاسٍ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْاَسْلَمِيِّ خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَمِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَآتِيْهِ بِوَضُوْئِهِ ، وَحَاجَتِهِ فَقَالَ: «سَلْنِيْ»، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ؟»، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: «فَاَعِنِّي عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম এবং আহলে ছুফফার অন্তর্ভুক্ত হযরত আবু ফিরাস রাবীআ বিন কা'আব আসলামী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে (অর্থাৎ তাঁহার ঘরের দরওয়াজায়) রাত্রি যাপন করিতাম এবং তাঁহার অযুর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস আগাইয়া দিতাম। একবার তিনি (আমাকে) বলিলেন, আমার নিকট কিছু প্রার্থনা কর। আমি বলিলাম, আমি জান্নাতে আপনার সাথিত্ব প্রার্থনা করিতেছি। তিনি বলিলেন, অন্য কিছু? আমি বলিলাম, ইহাই (আমার প্রার্থনা। অন্য কিছু নহে।) তিনি বলিলেন, তবে অধিক সিজদা দ্বারা তোমার নিজের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক এমন মর্যাদা দান করিয়াছেন যাহা কোন উম্মত দূরে থাকুক কোন নবী রাসূলও লাভ করিতে পারিবেন না। সুতরাং সাথিত্ব প্রার্থনা করিবার অর্থ হইল, আমি আপনার অতি নিকটে থাকিতে চাই, যাহাতে আপনার বিচ্ছেদকষ্ট আমার না হয় বরং আপনার পবিত্র মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া চক্ষু জুড়াইতে পারি।

(অন্য কিছু?) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা বলিবার অর্থ হইল, তুমি বড় কঠিন জিনিস চাহিয়াছ। ইহার জন্য যেই কঠিন সাধনা ও মুজাহাদা করিতে হইবে এবং নফসকে যেই পরিমাণ কষ্ট দিতে হইবে তাহা তুমি করিতে পারিবে না। সুতরাং আরও সহজ কিছু প্রার্থনা কর। او غير ذلك এর ذلك শব্দটি দ্বারা এই কথা বুঝানো হইয়াছে। কেননা শব্দটি দূরবর্তী বস্তুকে ইংগিত করিবার জন্য ব্যবহৃত। ইহা দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, প্রার্থিত বিষয়টি তোমার নাগাল হইতে অনেক দূরে। পক্ষান্তরে ছাহাবী আবু ফিরাস هو ذاك বলিয়াছেন। ذاك শব্দটি অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তীর জন্য ব্যবহৃত। সুতরাং তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে, ইহা লাভ করিবার জন্য আমাকে যাহা কিছু আদেশ করা হইবে আমি তাহা প্রাণপণ রূপে পালন করিব এবং ইহাকে আমার নাগালের মধ্যে পাইতে অবশ্যই চেষ্টা করিব।

(আমার নিকট প্রার্থনা কর) নিঃশর্তভাবে যে কোন কিছু চাহিতে বলা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় নবীকে তাঁহার খাজানা হইতে যাহা কিছু ইচ্ছা দান করিবার অধিকার ও ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন।

(অধিক সিজদা দ্বারা আমাকে সাহায্য কর।) কেননা অধিক সিজদা বান্দাকে নৈকট্যের স্তরে উপনীত করে এবং নফসকে যাবতীয় খাবাছত ও নাপাকি হইতে পবিত্র করে এবং যাবতীয় খাহেশাত ও মন্দ স্বভাব হইতে মুক্ত করে এবং নফসের উপর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ (বা মুরাকাবা) প্রতিষ্ঠিত করে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে করিতে এক সময় সাথিত্বের স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে।

মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, অধিক সিজদা দ্বারাই এই উচ্চ মর্তবা হাছিল হইতে পারে। কেননা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের অধিক হইতে অধিকতর নৈকট্য অর্জন ছাড়া আখিরাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব নহে। আর দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ হইতে পারে সিজদা দ্বারা وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ (সিজদা কর এবং নৈকট্য লাভ কর) আয়াত দ্বারা এই দিকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রতিটি সিজদাতেই নৈকট্যের একটি বিশেষ স্তর রহিয়াছে। এইভাবে এক সময় সে আল্লাহর পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথিত্বের স্তরে উপনীত হয়। এই বক্তব্য নিম্নোক্ত আয়াতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর। তখন আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।

সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ছাড়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য অর্জন সম্ভব নহে। তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য অর্জন ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জন সম্ভব নহে। অর্থাৎ উভয় সম্পর্ক পরস্পর নির্ভরশীল। একটি হইতে অন্যটি কোনক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই আল্লাহর প্রতি বান্দার মুহব্বত এবং বান্দার প্রতি আল্লাহর মুহব্বত– উভয় মুহব্বতকে তাঁহার প্রিয় রাসূলের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল করা হইয়াছে।

১০৯। অধিক নফল ইবাদতের ফল

اَلثَّالِثَ عَشَرَ: عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ ـ وَيُقَالُ: اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ـ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ؛ فَاِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلَّا رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হযরত ছাওবান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তুমি অধিক সিজদা কর। কেননা যখনই তুমি আল্লাহর জন্য কোন সিজদা করিবে তখনই উহার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার একটি দরজা বুলন্দ করিবেন এবং একটি গোনাহ মাফ করিবেন। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

হাদীছের উদ্দেশ্য হইল নামাযের সিজদা, তিলাওয়াতের সিজদা কিংবা শোকরের সিজদা।

শুধু সিজদার কথা বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। কেননা শুধু সিজদা শরীয়তের ইবাদত হিসাবে গ্রহণযোগ্য নহে।

এই হাদীছ বর্ণনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে মা'দান ইবনে তালহা (রহঃ) বলেন, আমি ছাওবান (রাঃ)-এর খিদমতে হাযির হইয়া বলিলাম, আমাকে এমন কোন আমল বলিয়া দিন যাহার উপর আমল করিলে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন। (এই আবেদন শুনিয়া হযরত ছাওবান) নিরব রহিলেন। তিনি দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করিলেন, হযরত ছাওবান (রাঃ) এইবারও চুপ রহিলেন। তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হযরত ছাওবান (রাঃ) বলিলেন, এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি অধিক সিজদা কর...............

হযরত মা'দান (রহঃ) বলেন, অতঃপর আমি আবু দারদা (রাঃ)-এর খিদমতে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনিও একই কথা বলিলেন।

বস্তুতঃ বান্দার জন্য সিজদাই হইল আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের সর্বোত্তম উপায়। হাদীছ শরীফে আছে– সিজদার মাঝেই বান্দা তাহার প্রতিপালকের সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে। অন্য হাদীছে আছে– কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাঁহার কুদরতি 'ছাক' (বা পায়ের গোছা) প্রকাশ করিবেন। আর প্রত্যেকে তাঁহার কদমে সিজদা করিবে। কিন্তু দুনিয়াতে যাহারা সিজদা করে নাই তাহারা সিজদা করিতে পারিবে না। সোজা দাঁড়াইয়া থাকিবে। কোমর বাঁকা হইবে না। সুতরাং দুনিয়ার জিন্দেগীতে আমাদের কর্তব্য হইল অধিক নামায পড়া, যাহাতে অধিক সিজদা হয়।

১১০। দীর্ঘ জীবন লাভের ফায়দা

اَلرَّابِعَ عَشَرَ: عَنْ اَبِيْ صَفْوَانَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ الْاَسْلَمِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(٧)، وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

হযরত আবু ছাফওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর আসলামী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছেন এবং উত্তম আমল করিয়াছেন। (তিরমিযি শরীফ)

ফায়দা ঃ

অন্য এক হাদীছে বিষয়টি আরও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, দুই ছাহাবীর একজন শহীদ হইলেন অন্যজন আরও এক বৎসর পর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিলেন। কিন্তু কেহ স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, এক বৎসর পর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি শহীদের আগে জান্নাত লাভ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নের বিষয় আরয করা হইলে তিনি বলিলেন, সে কি এক বৎসর, এত ওয়াক্ত নামায বেশী পড়ে নাই? (অর্থাৎ দীর্ঘায়ুর মাধ্যমে অধিক নেক আমলের কারণে তিনি শহীদের চাইতে উত্তম হইয়া গেলেন।)

হাদীছের মর্মবাণী এই যে, মানুষের স্বভাবে দুইটি জিনিস রহিয়াছে। দীর্ঘ জীবনের বাসনা

এবং লোভ। যেমন এক হাদীছে আছে–

يشيب ابن آدم و يشب فيه اثنان الحرص و طول الامل *

আদমের পুত্র বুড়া হয় কিন্তু তাহার মাঝে দুইটি গুণ যুবক (বা শক্তিশালী) হয়, লোভ ও দীর্ঘ আশা।

মানুষ তাহার স্বভাবকে বদলাইতে তো পারিবে না। কিন্তু তাহার উচিত এই স্বভাবকে দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতের দিকে পরিবর্তন করা। অর্থাৎ লোভ তো সে বাদ দিতে পারিবে না। সুতরাং সে বেশী বেশী আমলের লোভ করুক এবং আমলের জন্য আল্লাহর নিকট দীর্ঘ জীবন কামনা করুক।

১১১। ইয়াকীন ও ছবরের একটি উদাহরণ

اَلْخَامِسَ عَشَرَ: عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: غَابَ عَمِّيْ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَن قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غِبْتُ عَنْ اَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ، لَئِنِ اللّٰهُ اَشْهَدَنِيْ قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيُرِيَنَّ اللّٰهُ مَا اَصْنَعُ(৮). فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ - يَعْنِيْ اَصْحَابَهُ - وَاَبْرَاُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ - يَعْنِيْ الْمُشْرِكِيْنَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعَدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ اَلْجَنَّةَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، اِنِّيْ اَجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُوْنِ اُحُدٍ. قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا صَنَعَ! قَالَ اَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهٖ بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، اَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، اَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ فَمَا عَرَفَهُ اَحَدٌ اِلَّا اُخْتُهُ بِبَنَانِهٖ. قَالَ اَنَسٌ: كُنَّا نرى اَوْ نَظُنُّ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ وَفِيْ اَشْبَاهِهٖ: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ﴾ [الاحزاب: ٢٣] اِلٰى اٰخِرِهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

قَوْلُهُ: «لَيُرِيَنَّ اللّٰهُ» رُوِيَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ؛ أَيْ: لَيُظْهِرَنَّ اللّٰهُ ذٰلِكَ لِلنَّاسِ، وَرُوِيَ بِفَتْحِهِمَا، وَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমার চাচা আনাস বিন নাযার (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি (আক্ষেপ করিয়া) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (মুশরিকদের বিরুদ্ধে আপনার) প্রথম লড়াইয়ে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ আমাকে (ভবিষ্যতে) মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে উপস্থিত রাখেন তবে আল্লাহ অবশ্যই আমার কীর্তি দেখিতে পাইবেন। অহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ যখন অরক্ষিত হইয়া পড়িলেন। (এবং ছত্রভংগ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।) তখন হযরত আনাস বিন নাযার (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ! আমার এই সাথীরা যাহা করিয়াছে সেই ব্যাপারে আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আর এই মুশরিকরা যাহা করিয়াছে সেই ব্যাপারে আমি তোমার নিকট আমার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করিতেছি। অতঃপর তিনি (লড়াই করিবার জন্য) অগ্রসর হইলেন এবং সা'আদ বিন মু'আয (রাঃ)-কে দেখিতে

পাইয়া বলিলেন, হে সা'আদ! কা'বার রবের কসম! জান্নাতই আমার কাম্য। অহুদের পিছন হইতে আমি জান্নাতের ঘ্রাণ পাইতেছি। সা'আদ (রাঃ) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আনাস বিন নাযার যাহা করিয়াছে আমি তাহা করিতে পারি নাই। আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, তাহার শরীরে আমরা আশিটিরও বেশী তরবারি, বর্শা ও তীরের আঘাত দেখিতে পাইলাম। আমরা তাহাকে শহীদ অবস্থায় পাইলাম। মুশরিকরা তাহার লাশ এমনভাবে বিকৃত করিয়াছিল যে, শুধু তাহার বোন তাহাকে আংগুলের চিহ্ন দ্বারা চিনিতে পারিয়াছিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমাদের ধারণা ছিল যে, مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ আয়াত তাহার এবং তাহার মত ছাহাবা কেরামের শানেই নাযিল হইয়াছিল। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

ইসলামের ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম গাযওয়াহ্ হইল বদর। আর দ্বিতীয় গাযওয়া হইল উহার এক বৎসর পর তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত অহুদ। অহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঞ্চাশজন তীরন্দাজ ছাহাবীকে অহুদ পাহাড়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই নির্দেশসহ মোতায়েন করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে আমাদের জয় পরাজয় যাহাই হউক তোমরা এই স্থান কিছুতেই ত্যাগ করিবে না। কিন্তু তাঁহারা মুসলমানদের বিজয় দেখিয়া এমনই খুশী হইলেন যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ভুলিয়া উক্ত স্থান ত্যাগ করিলেন এবং নীচে নামিয়া আসিলেন। অহুদ পাহাড় ছিল মুসলিম বাহিনীর পশ্চাতে। ফলে তাঁহাদের পশ্চাৎ দিকটা অরক্ষিত হইয়া গেল এবং পরাজিত কাফিররাও সুযোগ বুঝিয়া সেই পথে মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ফলে মুসলমানগণ দিশাহারা হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এমনকি এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের সামনে অরক্ষিত হইয়া পড়িলেন এবং মুশরিকরা তাঁহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। এই অবস্থার প্রতি ইংগিত করিয়াই হযরত আনাস (রাঃ) নিম্নোক্ত দু'আ করিয়াছিলেন।

(হে আল্লাহ! আমার সাথীরা.......) অর্থাৎ মুসলমানগণ যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফেলিয়া ময়দান ত্যাগ করিল এই জন্য আমাকে এবং তাহাদিগকে ক্ষমা কর। কেননা তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। আর মুশরিকরা যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে ইহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং তাহাদের উপর তোমার যে আযাব গজব নাযিল হইবে তাহা হইতে আমাকে নাজাত দিও। **(من المؤمنين)** অর্থাৎ একদল মুমিন এমন যাহারা আল্লাহর সহিত কৃত ওয়াদা সত্য করিয়া দেখাইয়াছেন।

(আমি জান্নাতের ঘ্রাণ পাইতেছি) আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য এই পথে যাহারা প্রাণপণ করেন এবং তরবারির নীচে মাথা পাতিয়া দেন, তাহাদের সামনে আল্লাহ পাক জান্নাতের এমন সব দৃশ্য উম্মোচিত করেন যে, তখন তাহারা টেরই পান না যে, কখন কিভাবে তাহাদের গলা কাটিয়া গেল আর তাহারা জান্নাতে চলিয়া গেলেন। কেহ জান্নাতের বাগান ও তাহার ফল দেখিতে পান। কেহ হুরের সুমধুর হাসি শুনিতে পান। কেহ জান্নাতের সুঘ্রাণ অনুভব

করেন। আর কাহারও চোখের সামনে সমগ্র জান্নাত উহার যাবতীয় নায নেয়ামতসহ ভাসিয়া উঠে। তাই হাসিমুখে প্রাণ বিলাইয়া দিতে তাহার কোনই কষ্ট হয় না। বরং তরবারির আঘাতকে মনে হয় পিঁপড়ার কামড় সমতুল্য।

১১২। দানের মাপকাঠি পরিমাণ নহে, ইখলাছ

- اَلسَّادِسَ عَشَرَ : عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الْاَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلٰى ظُهُوْرِنَا. فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيْرٍ فَقَالُوْا: مُرَاءٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوْا: إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هٰذَا! فَنَزَلَتْ ﴿ اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ [التوبة: ٧٩]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ].

«وَنُحَامِلُ» بِضَمِّ النُّوْنِ، وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ: اَيْ يَحْمِلُ اَحَدُنَا عَلٰى ظَهْرِهِ بِالْاُجْرَةِ، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا.

হযরত আবু মাসউদ উকবা বিন আমর আল আনছারী আল বদরী (রাঃ) বলেন, যখন ছাদাকার আয়াত নাযিল হইল তখন আমরা (আল্লাহর রাস্তায় দান করিবার জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে (বাজারে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে) বোঝা বহন করিতাম। (একবার) একজন লোক আসিয়া প্রচুর পরিমাণ ছাদাকা করিল। তখন (মুনাফিকরা) বলিতে লাগিল যে, এই লোক রিয়াকার। অন্য একজন আসিয়া এক ছা' পরিমাণ ছাদাকা করিল। তখন তাহারা বলিতে লাগিল, এই লোকের (সামান্য) এক ছা' ছাদাকা গ্রহণের কোন প্রয়োজন আল্লাহর নাই। তখন এই আয়াত নাযিল হইল 'যাহারা নফল ছাদাকাকারীদের প্রতি কটাক্ষ করে এবং (ঐ লোকদের প্রতি কটাক্ষ করে) যাহারা দান করিবার জন্য নিজেদের কষ্টার্জিত সম্পদ ছাড়া আর কিছু পায় না।' (অনন্তর তাহাদিগকে উপহাস করে, আল্লাহ তাহাদিগকে উপহাস করিবেন। আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।) (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

ফাতহুল বারী কিতাবে আল্লামা ইবনুল হাজার (রহঃ) বলেন, সম্ভবতঃ ছাদাকার আয়াত বলিয়া এই আয়াতের দিকে ইংগিত করা হইয়াছে–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ *

তাহাদের সম্পদ হইতে আপনি ছাদাকা গ্রহণ করুন যাহা দ্বারা আপনি তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন।

প্রথম ছাদাকাকারী লোকটি ছিলেন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)। তাঁহার ছাদাকার পরিমাণ ছিল চার হাজার কিংবা আট হাজার দিরহাম। দ্বিতীয়জন ছিলেন আবু আকীল অথবা অন্য কেহ। তিনি দুই ছা' খেজুরের বিনিময়ে কূপ হইতে পানি উত্তোলনের কাজ

করিয়াছিলেন। অতঃপর এক ছা'পরিবার পরিজনের জন্য রাখিয়া দ্বিতীয় ছা' আল্লাহর রাস্তায় ছাদাকা (দান) করিয়াছিলেন।

১১৩। আল্লাহর বড়ত্ব ও বান্দার কর্তব্য

اَلسَّابِعَ عَشَرَ: عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ ، عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِيْ اِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ؛ فَاسْتَهْدُوْنِيْ اَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلاَّ مَنْ اَطْعَمْتُهُ؛ فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ اُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ اِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُوْنِيْ اَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا، فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ اَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضُرِّيْ فَتَضُرُّوْنِيْ، وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِيْ فَتَنْفَعُوْنِيْ ، يَا عِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ، وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا، يَا عِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ، فَسَاَلُوْنِيْ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَسْاَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ اِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ ، يَا عِبَادِيْ اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيْهَا لَكُمْ، ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلاَ يَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهُ». قَالَ سَعِيْدٌ: كَانَ اَبُوْ اِدْرِيْسَ اِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ جَثَا عَلٰى رُكْبَتَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَرَوَيْنَا عَنِ الْاِمَامِ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَيْسَ لِاَهْلِ الشَّامِ حَدِيْثٌ اَشْرَفَ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ.

হযরত সাঈদ বিন আব্দুল আযীয বর্ণনা করেন রাবীয়া বিন ইয়াযীদ হইতে, তিনি আবু ইদরীস খাওলানী হইতে, তিনি হযরত আবু যর (রাঃ) হইতে, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এবং তিনি আল্লাহ তা'আলা হইতে বর্ণনা করেন। আল্লাহ পাক বলেন–

হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার উপর জুলুমকে হারাম করিয়াছি এবং তোমাদের নিজেদের মাঝেও জুলুমকে হারাম করিয়াছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের উপর জুলুম করিও না।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট, তবে যাহাকে আমি হিদায়াত দান করি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট হিদায়াত প্রার্থনা কর; আমি তোমাদিগকে হিদায়াত দান করিব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত; তবে যাহাকে আমি আহার দান করি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট আহার চাহ; আমি তোমাদিগকে আহার দান করিব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন, তবে আমি যাহাকে বস্ত্রদান করি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট বস্ত্র প্রার্থনা কর; আমি তোমাদিগকে বস্ত্রদান করিব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাত্রে ও দিনে গোনাহ্ করিয়া থাক। আর আমি (শিরক ছাড়া) সমস্ত গোনাহ্ মাফ করিয়া থাকি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা কর। আমি তোমাদিগকে মাফ করিব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার ক্ষতি করিতে চাহিলেও ক্ষতি করিতে পারিবে না এবং আমার উপকার করিতে চাহিলেও উপকার করিতে পারিবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ইনসান ও জ্বিন যদি তোমাদের শ্রেষ্ঠতম মুত্তাকী ব্যক্তির হৃদয়ের (তাকওয়ার) অধিকারী হয় তবু উহা আমার রাজত্বে কিছুমাত্র বৃদ্ধি করিতে পারিবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জ্বিন ও ইনসান যদি তোমাদের মাঝে পাপিষ্ঠতম লোকটির হৃদয়ের (পাপাচারের) অধিকারী হয় তবু উহা আমার রাজত্বের কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ইনসান ও জ্বিন এক সমতল ভূমিতে একত্র হয় এবং আমার নিকট প্রার্থনা করে আর আমি প্রত্যেককে তাহার প্রার্থিত বস্তু দান করি তবে উহা আমার ভাণ্ডার কিছুমাত্র কমাইতে পারিবে না। তবে সুঁই সমুদ্রে প্রবেশ করাইলে যে পরিমাণ (পানি) কমে।

হে আমার বান্দাগণ! ইহা তোমাদেরই আমল সমূহ যাহা আমি তোমাদের জন্য হিসাব করিয়া রাখি। অতঃপর উহার বিনিময় তোমাদিগকে পূর্ণরূপে দান করিব। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তম বিনিময় লাভ করে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যদি অন্য কিছু লাভ করে তবে সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাহাকেও দোষারোপ না করে।

সাঈদ (বিন আব্দুল আযীয রহঃ) বলেন, আবু ইদরীস যখন এই হাদীছ বর্ণনা করিতেন তখন (ইহার প্রতি আযমত ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার জন্য) হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া যাইতেন। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

(হে আমার বান্দাগণ) ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, উক্ত সম্বোধনে নারী পুরুষ সকলেই অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। অন্যান্য বর্ণনার সনদে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহ্ তা'আলার উল্লেখ রহিয়াছে।

আল্লাহ্ আপন সত্তার উপর জুলুম হারাম করিয়াছেন ইহার অর্থ, জুলুম করা হইতে তিনি চিরপবিত্র। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বাক্যটিকে শাব্দিক অর্থেই গ্রহণ করিয়া বলেন, মানুষ যদি নিজেকে নিজে আদেশ বা নিষেধ করিতে পারে; যেমন ইরশাদ হইয়াছে إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (নিঃসন্দেহে নফস মন্দ কাজের আদেশ করিয়া থাকে)। আরও ইরশাদ হইয়াছে وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (এবং নফসকে সে মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিল।) অথচ মানুষ তো অন্য

এক সত্তার (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের) অধীন। তবে যে আদেশ নিষেধের মালিকের উপর আর কোন আদেশ নিষেধকারী নাই তাঁহার পক্ষে কেন নিজের উপর কোন কিছু হারাম করা সম্ভব হইবে না?

তবে হারাম করিবার দাবী এই যে, আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে জুলুমের প্রকাশ সম্ভব। কিন্তু নিজেকে তিনি উহা হইতে বিরত রাখিয়াছেন। ন্যায়পরায়ণতার কারণে তিনি উহা করেন না। এই জন্য গরিষ্ঠসংখ্যক ওলামায়ে কেরামের মতে আল্লাহ তা'আলার পাক যাত সম্পর্কে জুলুম কল্পনা করাই সম্ভব নহে। কেননা জুলুম অর্থ অন্যের অধিকার হরণ বা সীমা লংঘন। অথচ আল্লাহর নিকট তো কাহারও কোন অধিকার বা প্রাপ্য নাই, যাহা তিনি হরণ করিবেন। কেননা সকল মালিক ও তাহাদের যাবতীয় মালিকানা তাঁহারই সৃষ্টি। তদ্রূপ আল্লাহ্ পাকের উপরে তো কেহ নাই যে, তাঁহার জন্য সীমা নির্ধারণ করিয়া দিবে আর তিনি উহা লংঘন করিবেন। তাই অনেকে ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, জুলুম হইতে পবিত্র থাকাকেই তিনি নিজের জন্য 'হারাম করা' বলিয়াছেন।

(তোমাদের মাঝেও জুলুমকে হারাম করিয়াছি) অর্থাৎ তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তী সকল উম্মতের শরীয়তেই আমি বিধান নাযিল করিয়াছি যে, একে অপরের উপর জুলুম করা হারাম। সুতরাং তোমরা একে অপরের জানের উপর, মালের উপর, ইয্যতের উপর, নসবের উপর জুলুম করিও না। কেননা জুলুম সচরাচর এই সকল ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। তবে সর্বোচ্চ জুলুম হইল শিরক। যেমন ইরশাদ হইয়াছে إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (নিঃসন্দেহে শিরক বিরাট জুলুম।) ইহার পরবর্তী জুলুম হইল পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন নাফরমানি।

(তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট) আল্লামা নববী (রহঃ) নকল করেন, হাদীছের বাহ্যিক অর্থ হইতে বোঝা যায় যে, মানুষকে ভ্রষ্ট অবস্থায় সৃষ্টি করা হইয়াছে। অথচ প্রসিদ্ধ হাদীছ হইল كل مولود يولد على الفطرة প্রতিটি শিশু ফিতরতের (ঈমানের) উপর জন্মলাভ করে। ইহার ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামে বলিয়াছেন যে, ভ্রষ্টতা দ্বারা এখানে পরবর্তী ভ্রষ্টতা উদ্দেশ্য যাহা জন্মকালীন ফিতরতের উপর প্রবল হইয়াছে। যেমন এক হাদীছে আসিয়াছে–

خلق الله الخلق على معرفته فاغتالهم الشيطان *

আল্লাহ্ পাক মানবসম্প্রদায়কে তাঁহার মা'রিফাত ও পরিচয়সহ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু শয়তান তাহাদিগকে ঘায়েল করিয়াছে।

বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছের আলোকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের সুস্পষ্ট আকীদা এই যে, হিদায়াত সে-ই লাভ করিতে পারে যাহাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ পাক তাঁহার কতিপয় বান্দার হিদায়াত ইচ্ছা করিয়াছেন। ফলে তাহারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হইয়াছে। আর অন্যদের হিদায়াত ইচ্ছা করেন নাই। ফলে তাহারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় নাই। যদি তিনি তাহাদের হিদায়াত ইচ্ছা করিতেন তবে অবশ্যই তাহারা হিদায়াত লাভ করিত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে–

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا *

যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে পৃথিবীর সকলেই ঈমান গ্রহণ করিত।

মুফরাদাত কিতাবে ইমাম রাগিব (রহঃ) হিদায়াত সম্পর্কে বড় সুন্দর একটি ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হিদায়াত-এর মূল অর্থ, আল্লাহকে পাইবার জন্য যে সরল পথ আল্লাহ নির্ধারণ করিয়াছেন ঐ পথ প্রাপ্ত হওয়া। ইহা অতি ব্যাপক বিষয়। ইহার বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভের স্তর যেমন বিভিন্ন ও অনন্ত তদ্রূপ হিদায়াতের স্তরও বিভিন্ন ও অসংখ্য। ইহার অতি প্রাথমিক স্তর হইল কুফর ও শিরক ত্যাগ করা এবং ঈমান গ্রহণ করা। ইহার মাধ্যমে গায়রুল্লাহর পরিবর্তে মানুষের জীবনের গতিধারা আল্লাহমুখী হয়। অতঃপর আল্লাহ ও বান্দার মাঝে যে দূরত্ব রহিয়াছে উহা অতিক্রম করতঃ নৈকট্য অর্জনের প্রতিটি স্তরই মূলতঃ হিদায়াতের একেকটি স্তর। তাই কোন মানুষ এমন কি নবী রাসূলগণ পর্যন্ত হিদায়াত অন্বেষণের দায়িত্ব হইতে মুক্ত নহেন। কেননা আল্লাহর নৈকট্য অনন্ত। ইহার কোন শেষ নাই। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে যেমন اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-এর শিক্ষা দিয়াছেন অদ্রুপ নিজেও জীবনের শেষ পর্যন্ত এই দু'আ করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছে হিদায়াতকে আল্লাহ পাক আপন ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করিয়াছেন। মানুষের স্থূল ও সীমাবদ্ধ জ্ঞান এইখানে প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে পারে যে, হিদায়াত পাওয়া না পাওয়া যদি আল্লাহর ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল হয় তবে বান্দা কেন দায়ী হইবে এবং কেনই বা শাস্তি ভোগ করিবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে ওল্লামায়ে কেরাম যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহার খোলাছা এই যে, ইহা তো স্বীকৃত সত্য যে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও কিছু ঘটিতে পারিলে আল্লাহ পাকের অক্ষম হওয়া জরুরী। আর ইহা বাতিল। সুতরাং অনিবার্য সত্য এই যে, বান্দার হিদায়াত ও গোমরাহী আল্লাহর ইচ্ছায় হইবে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, হিদায়াত লাভের পথ ও পন্থা আল্লাহ সকলের জন্য সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সেই সংগে ইহা গ্রহণ করিবার ও না করিবার ইচ্ছাও আমাদিগকে দান করিয়াছেন। এই শক্তি আল্লাহর পক্ষ হইতে আমাদের মাঝে নিহিত রহিয়াছে যে, ইচ্ছা করিলে আমরা এই হিদায়াত গ্রহণ করিতে পারি আবার ইচ্ছা করিলে গ্রহণ নাও করিতে পারি। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়াই আমরা হিদায়াত গ্রহণ বা বর্জন করিয়া থাকি। তবে আমরা ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিবার পর আল্লাহ পাক হিদায়াত বা গোমরাহী সৃষ্টি করিয়া দেন। আমাদের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিবার পর আল্লাহ যদি উহা সৃষ্টি না করিয়া দেন তবে উহা হইবে না। মোটকথা গ্রহণ বা বর্জন আমাদের কিন্তু সৃষ্টি আল্লাহর আর এই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের উপরই শাস্তি বা পুরস্কার। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ভিত্তিতে আমলের সম্বোধন বান্দার দিকে হয় আবার আমল সমূহ সৃষ্টি করিবার ভিত্তিতে ঐ গুলির সম্বোধন আল্লাহর দিকে হয়।

আর বান্দা তাহার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কখন কি করিবে উহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনাদি জ্ঞান আল্লাহ পাকের রহিয়াছে এবং ঐভাবেই আল্লাহ পাক উহার ফায়সালা করিয়াছেন এবং ঐ ভাবেই উহা ঘটিতেছে। অর্থাৎ আমাদের তাকদীরে শুধু ইহাই নির্ধারিত নহে যে, অমুক লোক হেদায়াত গ্রহণ করিবে আর অমুক করিবে না বরং ইহাও নির্ধারিত রহিয়াছে যে, অমুক তাহার স্ব-ইচ্ছায় এমন করিবে এবং উহার এই ফল হইবে। এককথায় বলা যাইতে পারে যে, আল্লাহর ইলমে যাহা রহিয়াছে তাহা আমরা করি, এমন নহে বরং আমরা যাহা করি তাহা আল্লাহর ইলমে রহিয়াছে। সুতরাং আমরা ইচ্ছারহিত ও মজবুর নই। কিন্তু আমরা হিদায়াতের ইচ্ছা

করিবার পর যদি আল্লাহ পাক উহার যাবতীয় আসবাব অনুগ্রহপূর্বক সৃষ্টি করিয়া না দেন তবে আমাদের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের পরও হিদায়াতের অস্তিত্ব হইবে না।

তদ্রূপ বান্দা গোমরাহি গ্রহণের ইচ্ছা করিবার পর আল্লাহ উহা পয়দা না করিলে গোমরাহীর অস্তিত্ব হইবে না। তাই বলা হইয়াছে-

فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ *

আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা গোমারাহ করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।

যদি এমন হইত যে, মানুষ গোমরাহী গ্রহণ করিতে চাহিল কিন্তু আল্লাহ উহার আসবাব পয়দা করিলেন না, তবে কাহারও সাধ্য হইত না গোমরাহ হইবার। বরং সকলেই বাধ্যতামূলকভাবেই [illegible]ত গ্রহণ করিত। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, আপনার প্রতিপালক যদি ইচ্ছা করিতেন তবে পৃথিবীর সকল মানুষ ঈমান গ্রহণ করিত। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি রহিত করা আল্লাহর ইচ্ছা নহে। [illegible] কেহ আপন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া গোমরাহী অবলম্বন করিতে চাহে আল্লাহ পাক তাহার ইচ্ছার অনুকূলে গোমরাহীর যাবতীয় আসবাব পয়দা করিয়া দেন। তদ্রূপ আল্লাহ পাক অনুগ্রহপূর্বক ওয়াদা করিয়াছেন যে, যে কেহ হিদায়াত প্রার্থনা করিবে এবং হিদায়াত লাভের জন্য আমার বাতলানো তরীকায় চেষ্টা করিবে তাহার জন্য আমি হিদায়াতের পথ খুলিয়া দিব।

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا *

যাহারা আমাকে পাইবার চেষ্টা করিবে তাহাদিগকে আমাকে পাইবার বিভিন্ন পথ প্রদর্শন করিব।

আর আল্লাহ পাক তাঁহার ওয়াদার অন্যথা করেন না। اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

কিন্তু ইহা তাঁহার অনুগ্রহ। বাধ্যতামূলক নহে।

(আমার নিকট হিদায়াত প্রার্থনা কর।) অর্থাৎ হিদায়াত লাভের ইচ্ছা ও চেষ্টা শুরু করিবার পর আমার অনুগ্রহ ছাড়া হিদায়াত হইতে পারে না। এই বিশ্বাসসহ আমার নিকট হিদায়াত প্রার্থনা কর। আমি ওয়াদা করিতেছি যে, আমি তোমাদের অনুকূলে হিদায়াতের অস্তিত্ব দান করিব। অর্থাৎ সত্য পথ প্রদর্শন করিব এবং সত্যে উপনীত করিব।

তবে আল্লাহর অনাদী ইলমে ইহা রহিয়াছে যে, কে হিদায়াত প্রার্থনা করিবে আর কে করিবে না।

হিদায়াত প্রার্থনা করিবার নির্দেশদানের হিকমত হইল বান্দার মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা। কেননা প্রার্থনা ছাড়াই হিদায়াত দান করিলে বান্দার এমন ধারণাও হইতে পারিত যে, আমার নিজস্ব যোগ্যতাবলেই ইহা লাভ হইয়াছে। এইভাবে সে গোমারাহীতে পড়িত। কিন্তু এখন প্রার্থনার মাধ্যমে তাহার পক্ষ হইতে আপন দাসত্ব এবং আল্লাহ পাকের প্রতিপালকত্ব-এর স্বীকৃতি প্রদান হইয়া গেল। সুতরাং এখন হিদায়াতের পথে তাহার উত্তোরন বাধাহীন হইবে।

(তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত।) কেননা মানবসম্প্রদায় আল্লাহর দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। কোন কিছুতেই তাহাদের প্রকৃত মালিকানা নাই এবং রিযিকের যাবতীয় খাজানা একমাত্র তাঁহার

হাতে। সুতরাং যাহাকে তিনি অনুগ্রহবশতঃ রিযিক দান না করিবেন সে আল্লাহর ইনছাফের কারণে ক্ষুধার্ত থাকিয়া যাইবে। কেননা কাহাকেও রিযিক দান করা তাহার দায়িত্ব নহে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, কোরআন শরীফে তো আছে–

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا *

যমীনে এমন প্রাণী নাই যাহার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর।

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, এই দায়িত্ব অনুগ্রহবশতঃ, কর্তব্যবশতঃ নহে।

তদ্রূপ উপার্জন ও উৎপাদনের বিভিন্ন যাহেরী আসবাবের সহিত রিযিকের সম্পৃক্ততার কারণে ধোকায় পড়া উচিত নহে। কেননা আল্লাহ পাকই নিগূঢ় কোন হিকমতের কারণে আপন কুদরতকে প্রচ্ছন্ন করিবার জন্য আসবাবের সহিত উহাকে সম্পৃক্ত করিয়াছেন। অথচ আসবাব গুলিও আপন অনুগ্রহে ও কুদরতে তিনিই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এখন মূর্খ ও অজ্ঞ যাহারা তাহারা মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে যাহিরের পর্দায় আটকা পড়িয়া বাতিন হইতে দূরে সরিয়া যায়। কিন্তু আল্লাহর পূর্ণ মা'রিফাত যাহার হাছিল হইয়াছে তিনি যাহিরের কারণে বাতিন হইতে, আবার বাতিনের কারণে যাহির হইতে বে-খবর থাকেন না। বরং উভয়কে তিনি স্ব-স্ব স্থানে দেখিতে পারেন। তিনি বুঝিতে পারেন যে, কলের মুখ হইতে পানি পড়িলেও উহার উৎস কলের মুখ নহে। উহার উৎস হইল পানির টাংকি।

(সুতরাং আমার নিকট রিযিক প্রার্থনা কর; আমি তোমাদিগকে রিযিক দান করিব।) অর্থাৎ রিযিক হাছিল করিবার যাবতীয় আসবাব ও উপায় সহজ করিয়া দিব। কেননা বিশ্বজগতের জড়, প্রাণী ও উদ্ভিদ সকল বস্তু তাঁহার চিরঅনুগত। একটু চিন্তা করিলেই মানুষ বিশ্বজগতের মাঝে আল্লাহ পাকের অদ্ভুত পরিচালনা অনুভব করিতে পারে। তিনি অমুক স্থানের জন্য অমুক মেঘখণ্ডকে আদেশ করেন (যেমন বনী ইসরাঈলের এক ঘটনায় মেঘখণ্ড হইতে আওয়াজ শোনা গিয়াছিল) তিনি অমুককে দান করিবার জন্য অমুকের অন্তরে আন্দোলন সৃষ্টি করেন। তিনিই অমুকের নিকট অমুকের প্রয়োজন রাখিয়া দেন এবং শ্রম ও পারিশ্রমিকের সিলসিলা জারি করিয়া দেন। সকল কিছুরই পশ্চাতে রহিয়াছে দয়াময় রায্যাকের অদৃশ্য পরিচালনা।

এখানে দরিদ্রদিগকে হুঁশিয়ার করা হইতেছে যে, তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাহারও নিকট নেয়ামত প্রার্থনা করিও না। কেননা যাহার নিকট প্রার্থনা করিবে তাহাকেও আমিই দান করি। সুতরাং আমারই নিকট প্রার্থনা কর। আমিই দান করিব। পক্ষান্তরে অন্যকে দাতা মনে করিয়া তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে তোমাকে বঞ্চিত করা হইবে। কেননা তাহার অন্তরে তোমাকে দান করিবার ইচ্ছা পয়দা করা হইবে না। ফলে সে দান করিবে না।

(তোমরা সকলে বিবস্ত্র) এই সকল বিষয় দ্বারা বান্দার চরম অক্ষমতা এবং আল্লাহর পরম কুদরতের প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আমার কুদরতের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পুরা হইবার কোন উপায় নাই। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ ও প্রয়োজন লাভের জন্য আমাকেই স্মরণ করিও। আমি উহা পূরণ করিব। যেহেতু আখিরাতের প্রয়োজনই আসল প্রয়োজন সেহেতু হিদায়াতের কথা প্রথমে বলা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে দুনিয়ার প্রয়োজনের মাঝে অন্ন বস্ত্রই যেহেতু মৌলিকতম প্রয়োজন সেহেতু এই দুইটির কথা বলা হইয়াছে।

(সুঁই সমুদ্রে প্রবেশ করাইলে যে পরিমাণ কমে।) সুঁই ও সমুদ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে বাহ্যদৃষ্টি হিসাবে; হাকীকত হিসাবে নহে। কেননা হাকীকত এই যে, সমুদ্র যত বিশালই হউক এবং সুঁইয়ের অগ্রভাগে লাগিয়া থাকা পানি যত সামান্যই হউক সমুদ্রের পানি অবশ্যই তাহাতে হ্রাস পাইবে। অথচ আল্লাহর ভাণ্ডার এমন যে, সৃষ্টির আদি হইতে সৃষ্টির বিনাশ পর্যন্ত এবং পুনরুজ্জীবন হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত যত বিপুল পরিমাণেই দান করা হউক তাঁহার ভাণ্ডার বিন্দুমাত্র হ্রাস পাইবে না।

কেননা যাহা অসীম তাহা কখনও হ্রাস পায় না। এমন কি সসীমও কোন কোন ক্ষেত্রে হ্রাস পায় না। যেমন আগুন। উহা হইতে যতই গ্রহণ করা হউক উহা হ্রাস পায় না। বরং কোন কোন সসীম দান করিলে বাড়ে। যেমন জ্ঞান যতই দান করা হয় ততই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আল্লাহ্ পাকের অসীম ভাণ্ডার হ্রাস পাইবার কোন প্রশ্নই আসে না।

এখানে আল্লাহ্ পাক বান্দাকে তাঁহার নিকট প্রাণ ভরিয়া চাহিতে উৎসাহিত করিতেছেন। অর্থাৎ আমার ভাণ্ডার ফুরাইয়া যাইবে বা কমিয়া যাইবে এই ভয়ে তোমার প্রার্থনা বন্ধ করিও না। বরং চাহিতে থাক এবং সর্বক্ষণ চাহিতে থাক। চাহিতে থাক এবং যত ইচ্ছা চাহিতে থাক। যে ভাবে পার এবং যত পার চাহিতে থাক। তোমার চাহিদা শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু আমার দানের ভাণ্ডার ফুরাইবে না। বরং তুমি যত চাহিবে আমি ততই আনন্দিত হইব এবং আমার দানের ভাণ্ডারে ততই জোশ আসিবে।

সুবহানাল্লাহ্! কি অসীম করুণা আমাদের দাতার। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট তোমার শান মুতাবিক চাহিতেছি। সুতরাং তুমি আপন শান মুতাবিক আমাদিগকে দান করিতে থাক।

(সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে) কেননা আল্লাহ্ তাহাকে আপন রহমত ও করুণাগুণে নেক আমলের তাওফীক দান করিয়াছেন।

(আর যদি অন্য কিছু লাভ করে) অর্থাৎ যদি দুষ্কৃতি ও মন্দ পরিণতি লাভ করে। 'মন্দ শব্দটি উল্লেখ না করিয়া শুধু ইংগিতে প্রকাশ করিবার মাধ্যমে এই শিক্ষা দেওয়া হইল যে, খারাপ ও লজ্জাজনক শব্দ পারতপক্ষে মুখেও আনিতে নাই। আরও শিক্ষা এই যে, মন্দ শব্দ পর্যন্ত যেখানে পরিহার্য সেখানে মন্দকর্ম কিরূপ পরিহার করিয়া চলা কর্তব্য হইতে পারে, তাহা সহজেই বোঝা যায়।

(নিজেকে ছাড়া অন্য কাহাকেও যেন দোষারোপ না করে।) কেননা তাহার সম্মুখে উত্তম ও মন্দ উভয় পথ পরিষ্কার রূপে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু যাবতীয় সতর্কবাণী উচ্চারণ করা সত্ত্বেও নফসের খাহেশাতকেই সে অগ্রাধিকার দিয়াছে এবং ক্ষণস্থায়ী লজ্জতের পিছনে পড়িয়া চিরস্থায়ী সুখ শান্তিকে তুচ্ছ করিয়াছে।

জান্নাতীদের সম্পর্কে কোরআন শরীফে আসিয়াছে যে, তাহারা আল্লাহর প্রশংসা করিবে—

وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ

তাহারা বলিবে, প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদিগকে ইহার পথ দেখাইয়াছেন। আল্লাহ্ আমাদিগকে পথ না দেখাইলে আমরা কখনও পথপ্রাপ্ত হইতাম না।

পক্ষান্তরে জাহান্নামীরা নিজেরাই নিজেদিগকে তিরস্কার করিতে থাকিবে।

وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ * وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوا اَنْفُسَكُمْ، مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ *

সকলে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হইবেই। যাহারা অহংকার করিত তাহাদিগকে তখন দুর্বলেরা বলিবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা কি আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে আমাদিগকে কিছু মাত্র রক্ষা করিতে পারিবে? তাহারা বলিবে, আল্লাহ্ আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিলে আমরাও তোমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিতাম। এখন আমাদের জন্য ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা; আমাদের কোন নিষ্কৃতি নাই। যখন সকল কিছুর মীমাংসা হইয়া যাইবে তখন শয়তান বলিবে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি নাই। আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না। আমি কেবল তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করিও না, তোমরা নিজেদের প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহি এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, সিরিয়াবাসীদের নিকট ইহার চাইতে মর্যাদাপূর্ণ কোন হাদীছ নাই।

অধ্যায় – ১২

শেষ জীবনে অধিক নেক আমলের প্রতি উৎসাহ দান

এই দুনিয়া হইল আমলের স্থান। মৃত্যুর সংগে সংগে আমলের দফতর বন্ধ হইয়া যাইবে এবং হিসাবের দফতর খুলিয়া যাইবে। দুনিয়ার জিন্দেগীতে যে যত বেশী নেক আমল করিবে আখিরাতে তাহার অবস্থা ততই উত্তম হইবে। কিন্তু মানুষ নফস ও শয়তানের ধোকায় পড়িয়া বড় গাফলতের জিন্দেগী কাটাইতে থাকে। আর এক সময় মালাকুল মাউত আসিয়া হাযির হয়। ফলে নেক আমলশূন্য ও গোনাহে ভরপুর আমলনামা লইয়াই আখিরাতের প্রথম ঘাঁটি কবরে যাইতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্ রহমানুর রাহীম মানুষের বরবাদি দেখিতে চাহেন না। তাই মানুষকে সতর্ক করিবার জন্য তাহাদের জীবনে তিনি যৌবন-বার্ধক্যের জোয়ার-ভাটা দিয়াছেন

যাহাতে বয়সের প্রতিটি পরিবর্তনের সময় সে বুঝিতে পারে যে, আমার সময় ঘনাইয়া আসিতেছে। প্রতিদিন আমি একটু একটু করিয়া কবরের দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমল করিবার সময় ও সুযোগ একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিতেছে। সুতরাং অবশিষ্ট জীবনের মহামূল্যবান সময় যেন আর গাফলতের মাঝে শেষ না হয়। এই কারণে প্রত্যেক যুগের নেককার বান্দাদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, জীবনের শেষ ভাগে আসিয়া তাহারা আমলের পরিমাণ অনেক বাড়াইয়া দিতেন। موتوا قبل ان تموتوا (মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুবরণ করিয়া লও।) এর উপর আমল হিসাবে দুনিয়ার সহিত যাবতীয় সম্পর্ক তাহারা একেবারেই কমাইয়া দিতেন। তাহাদিগকে দেখিয়া মনে হইত যেন দুনিয়াতেই তাহাদের কবরের জিন্দেগী শুরু হইয়া গিয়াছে। জনৈক বুজুর্গ তাহার সংগে কেহ সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে বলিতেন। ভাই! চুল সাদা করিয়া আমার মাথায় মউতের ঝাণ্ডা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এখন আমাকে নির্জনে থাকিতে দাও। এমন কি নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামও জীবনের শেষ ভাগে আমলের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং শেষ রামযানে পূর্ণমাস ইতিকাফ করিয়াছিলেন।

আল্লাহ আমাদের সকলকে বয়সের 'সতর্কবাণী' অনুধাবন করিবার এবং অধিক হইতে অধিক আমল করিবার তাওফিক দান করুন। আমীন।

আয়াতসমূহ

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ *

আমি কি তোমাদিগকে এতটা বয়স দান করি নাই যে, উপদেশ গ্রহণকারী তাহাতে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে? তাহাছাড়া তোমাদের নিকট সতর্ককারীও আসিয়াছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও মুহাক্কিক আলিমগণ বলেন, ইহার অর্থ– আমি কি তোমাদিগকে ষাট বৎসর বয়স দান করি নাই? সামনে বর্ণিত হাদীছও এই ব্যাখ্যা সমর্থন করিতেছে।

কোন কোন মতে ইহার অর্থ– আঠার বৎসর। পক্ষান্তরে ইমাম হাসানুল বাছরী, আলকালবী ও মাসরূক বলেন, ইহার অর্থ– চল্লিশ বৎসর। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও এই অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। আলিমগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, মদীনাবাসী কোন আলিম চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হইবার পর (মানুষের সংশ্রব পরিহার করিয়া) ইবাদতে আত্মনিয়োগ করিতেন (এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেন)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও গরিষ্ঠসংখ্যক ওলামায়ে কেরামের মতে সতর্ককারী দ্বারা উদ্দেশ্য নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোন কোন মতে ইহার অর্থ বার্ধক্য। হযরত ইকরামা'ইবনে উয়ায়নাহ ও অন্যান্যরা ইহা বলিয়াছেন।

হাদীছসমূহ

১১৪। বৃদ্ধদের প্রতি হুঁশিয়ারি

«اَعْذَرَ اللهُ اِلَى امْرِيءٍ اَخَّرَ اَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّيْنَ سَنَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ: لَمْ يَتْرُكْ لَهُ عُذْرًا اِذْ اَمْهَلَهُ هٰذِهِ الْمُدَّةَ. يُقَالُ: اَعْذَرَ الرَّجُلُ اِذَا بَلَغَ الْغَايَةَ فِيْ الْعُذْرِ.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার মৃত্যুকে আল্লাহ্ বিলম্বিত করিয়াছেন আর সে ষাট বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছে তাহার অজুহাত পেশ করিবার সুযোগ আল্লাহ্ পাক রহিত করিয়াছেন। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

অর্থাৎ এই ধরণের অজুহাত পেশ করিবার সুযোগ তাহার নাই যে, যদি আমাকে দীর্ঘ জীবন দান করা হইত তবে আমি নেক আমল করিতে পারিতাম। কেননা দীর্ঘ ষাট বৎসরের জীবনে নেক আমল করিবার যথেষ্ট সুযোগ তাহার ছিল। সুতরাং এখন ওজর অজুহাত পেশ করিয়া কোন সুফল হইবে না। এখন নাজাত লাভের একমাত্র উপায় হইল ইসতিগফার করা এবং অতীত জীবনের অবহেলা অলসতার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অধিক হইতে অধিক পরিমাণ ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হওয়া।

১১৫। মৃত্যু আসন্ন অবস্থায় অধিক পরিমাণে তাসবীহ ও ইস্তিগফার

الثَّانِي : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُدْخِلُنِيْ مَعَ اَشْيَاخِ بَدْرٍ ، فَكَاَنَّ بَعْضُهُمْ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ فَقَالَ: لِمَ يَدْخُلُ هٰذَا مَعَنَا وَلَنَا اَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟! فَقَالَ عُمَرُ: اِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ! فَدَعَانِيْ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَدْخَلَنِيْ مَعَهُمْ، فَمَا رَاَيْتُ اَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ اِلَّا لِيُرِيَهُمْ قَالَ: مَا تَقُوْلُوْنَ فِيْ قَوْلِ اللهِ تَعَالىٰ: ﴿ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ؟ ﴾ [الفتح : ١]، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اُمِرْنَا نَحْمَدُ اللهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ اِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا. وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. فَقَالَ لِيْ: اَكَذٰلِكَ تَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمَا تَقُوْلُ؟ قُلْتُ: هُوَ اَجَلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، اَعْلَمَهُ لَهُ قَالَ: ﴿ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ وَذٰلِكَ عَلَامَةُ اَجَلِكَ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ [الفتح : ٣]، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا اَعْلَمُ مِنْهَا اِلَّا مَا تَقُوْلُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) (বিভিন্ন পরামর্শে ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে) আমাকে– (প্রবীন ও) বদরীছাহাবা কেরামের সহিত শরীক করিতেন। ফলে তাহাদের কাহারো কাহারো মনে খটকা হইল যে, ইহাকে আমাদের সহিত কেন শরীক করা হয় অথচ সে তো আমাদের পুত্রদের সমবয়সী? হযরত ওমর (রাঃ) (তাহাদিগকে বুঝাইয়া) বলিলেন, তোমরা যেখান হইতে ইলম হাছিল করিয়াছ ইনি সেইখান হইতে জন্মলাভ করিয়াছেন। অতঃপর একদিন তিনি আমাকে ডাকিয়া তাহাদের

সহিত শরীক করিলেন। আমার মনে হইল যে, ঐ দিন তিনি আমাকে তাহাদের সামনে (পরীক্ষা ও) প্রদর্শনের জন্য ডাকিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? কেহ বলিলেন, (এই আয়াতে) আমাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে যেন আমরা (আল্লাহর) সাহায্য ও বিজয় লাভের সময় আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা করি এবং তাঁহার নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা করি। অন্যরা কিছু না বলিয়া নিরব থাকিলেন। তখন হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে বলিলেন, হে ইবনে আব্বাস! তোমারও কি ইহাই ধারণা? আমি বলিলাম, জ্বি না। তিনি বলিলেন, তবে তুমি কি বলিতে চাহ? আমি বলিলাম, ইহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের প্রতি ইংগিত। (ইহার মাধ্যমে) আল্লাহ তাঁহাকে তাঁহার মৃত্যুর (আসন্ন) সময় জানাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ বলিয়াছেন, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ (যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসে) আর উহা আপনার মৃত্যু (আসন্ন হইবার) আলামত। فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (তখন আপনি আপন প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করুন এবং তাঁহার নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা করুন। নিঃসন্দেহে তিনি তাওবা কবুলকারী।) তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ এই সম্পর্কে আমিও শুধু ইহাই জানি।

(বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

(ইনি সেইখান হইতে জন্ম লাভ করিয়াছেন) অর্থাৎ নবী পরিবার ও হাশেমী বংশের সহিত তাঁহার সম্পর্ক। সুতরাং জ্ঞানের উৎসের সহিত নিবিড় সম্পর্কের কারণে তাঁহার ইলম তোমাদের চাইতে বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। বংশীয় মর্যাদার পাশাপাশি তাঁহার ইলম ও প্রজ্ঞাগত মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বও সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার জন্য হযরত ওমর (রাঃ) আলোচ্য আয়াত সম্পর্কিত প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অবস্থা ও পরিবেশ হইতে নিজেও তাহা আঁচ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহাছাড়া হযরত ইবনে সা'আদ (রাঃ)–এর বর্ণনায় অতিরিক্ত এই অংশটুকুও রহিয়াছে।

اما انى ساريكم اليوم منه ما تعرفون به فضله *

তোমাদিগকে আমি আজ তাহার এমন বিষয় দেখাইব যাহাতে তোমরা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পার।

(যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়) আলোচ্য সূরার নাম সূরাতুল ফাতহ। এখানে বিজয় দ্বারা মক্কা বিজয়ের কথা বলা হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতটি এই–

وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا *

(এবং যখন লোকদিগকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করিতে দেখ।)

ইহা দ্বারা মক্কা বিজয়ের পর আরবদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণের প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে।

ইমাম বায়হাকী বলেন, ইহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের সময় আসন্ন হইবার দিকে ইংগিত এইভাবে হয় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হইল দ্বীনের পূর্ণতাবিধান এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে যেহেতু ইহা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে সেহেতু এখন আল্লাহর সান্নিধ্যে তাঁহার ফিরিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। আর যেহেতু এই সূরার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিরবিদায় গ্রহণের ইংগিত করা হইয়াছে সেহেতু ইহার আরেক নাম হইল سورة التوديع (বা বিদায় ঘোষণার সূরা)

অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কেরামের মতে ইহা মক্কা বিজয়ের পূর্বে নাযিল হইয়াছে। ইমাম আবু হাইয়ানের মতে বিদায় হজ্জের সময় মিনাতে আইয়ামে তাশরীক্বের দিনে নাযিল হইয়াছে। ইহার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশি দিন দুনিয়াতে ছিলেন।

(তুমি যাহা বলিতেছ এই সম্পর্কে আমিও শুধু ইহাই জানি।) ইহা দ্বারা তিনি বুঝাইলেন যে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ইলম-ই তাঁহার বিশেষ মর্যাদা লাভের কারণ। বস্তুতঃ তাঁহাকে حبر الامة বা উম্মতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলা হইত। একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া দু'আ করিয়াছিলেন– اللهم اته حكمة (হে আল্লাহ! তাহাকে প্রজ্ঞা দান করুন।)

এই হাদীছের শিক্ষা এই যে, যেহেতু শ্রেষ্ঠ মানব ও শ্রেষ্ঠ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্যন্ত জীবন সায়াহ্নে ইস্তিগফার করিবার উপদেশ দেওয়া হইতেছে সেহেতু আমাদের মত পাপী-তাপী লোকদের অবশ্যকর্তব্য হইল বৃদ্ধ বয়সে ইবাদত বন্দেগী ও তাওবা ইস্তিগফারের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া। অনেক অজ্ঞ লোক আবার এমনও আছে যাহারা মনে করে যে, যুবক বয়স হইল আনন্দ উপভোগের বয়স। বৃদ্ধ বয়সে যখন প্রচুর আবসর পাইব তখন ইবাদত বন্দেগী করিব। দাড়ি রাখিব, নামায পড়িব এবং মসজিদেই পড়িয়া থাকিব। ইহা শয়তানী ধোকা ছাড়া আর কিছুই নহে। কেননা প্রথমতঃ মৃত্যু কখন আসিবে কিছুই জানা নাই। দ্বিতীয়তঃ শেষ জীবনের আমল দ্বারা তো যৌবন বয়সের ইবাদত বন্দেগীর ফযীলত পাওয়া যাইবে না।

আল্লাহ আমাদের সকলকে ছহী বুঝ ও সর্বোচ্চ তাওফীক দান করুন। আমীন।

১১৬। অধীক পরিমাণে তাওবা ইস্তিগফার

اَلثَّالِثُ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ اَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ اِلَّا يَقُوْلُ فِيْهَا: «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْهَا: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ: «سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ» يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ.

مَعْنٰى: «يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ» اَيْ: يَعْمَلُ مَا اُمِرَ بِهِ فِي الْقُرْاٰنِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ: «سُبْحَانَكَ

اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ». قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا هٰذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِيْ اَرَاكَ اَحْدَثْتَهَا تَقُوْلُهَا؟ قَالَ: «جُعِلَتْ لِيْ عَلَامَةٌ فِيْ اُمَّتِيْ اِذَا رَاَيْتُهَا قُلْتُهَا ﴿ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ». قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ؟ فَقَالَ: «اَخْبَرَنِيْ رَبِّيْ اَنِّيْ سَاَرٰى عَلَامَةً فِيْ اُمَّتِيْ فَاِذَا رَاَيْتُهَا اَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ؛ فَقَدْ رَاَيْتُهَا: ﴿ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ فَتْحُ مَكَّةَ، ﴿ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ اَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴾.

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, اذا جاء نصر الله এই সূরা নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযে ইহা বলিতেন–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ॐ

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি এবং আপনার প্রশংসা করিতেছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের আয়াতের উপর আমল করিয়া রুকু সিজদাতে ইহা অধিক পরিমাণে বলিতেন–

سبحانك ....

يتأول القران অর্থ কোরআন শরীফের فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ এই আয়াতে তাঁহাকে হামদ ও ইস্তিগফারের যে হুকুম করা হইয়াছে উহার উপর তিনি আমল করিতেন।

মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে অন্য এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে, মৃত্যুর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা বেশী বেশী বলিতেন–

سبحانك ....

হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। আপনার নিকট মাগফিরাত চাহিতেছি এবং আপনার নিকট তাওবা করিতেছি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কথাগুলি কি, যাহা আপনাকে বলিতে দেখিতেছি? তিনি বলিলেন, আমার উম্মতের ব্যাপারে আমাকে একটি আলামত দান করা হইয়াছে (এবং আদেশ করা হইয়াছে যে,) যখন আমি উহা দেখিব তখন যেন এই দু'আ বলি, (আলামতটি হইল) اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত।

মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম سُبْحَانَ اللّٰهِ..... এই দু'আ বেশী বেশী বলিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি

আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে ....سُبْحَانَكَ এই দু'আ বেশী বেশী পড়িতে দেখিতেছি। তিনি বলিলেন, আমার প্রতিপালক আমাকে অবহিত করিয়াছেন যে, আমি অতিসত্ত্বর আমার উম্মতের ব্যাপারে এক আলামত দেখিতে পাইব। যখন উহা দেখিব তখন যেন, سبحان الله এই দু'আ বেশী বেশী বলি। ঐ আলামত আমি দেখিতে পাইয়াছি। উহা হইল– .... إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ

ফায়দা ঃ

(পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি) পবিত্রতা ঘোষণা করিবার অর্থ, তাঁহার শানের উপযোগী নহে এমন সকল বিষয় হইতে তিনি চিরমুক্ত, চিরপবিত্র এই ঘোষণা দিতেছি। আর প্রশংসা করিবার অর্থ তাঁহার শানের উপযোগী যাবতীয় ছিফাত ও গুণ তাঁহার জন্য সাব্যস্ত করিতেছি।

(আমাকে ক্ষমা করুন) অর্থাৎ তাঁহার সর্বোচ্চ মাকাম ও মর্যাদার উপযোগী বন্দেগী করিতে না পরিবার ত্রুটি সম্পর্কে ক্ষমা চাওয়া হইতেছে, যাহা মূলতঃ ত্রুটি বা গোনাহ নহে। কেননা আম্বিয়া কেরাম যাবতীয় গোনাহ হইতে চির মুক্ত, চিরনিষ্পাপ।

(রুকু ও সিজদায়) ফকীহগণ রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ এবং সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الاعلى বলিবার হুকুম দিয়াছেন। কেননা ইহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারা জীবনের আমল। পক্ষান্তরে যে সকল অংশ কমবেশী করা হইয়াছিল উহার উপর আমল ছিল সাময়িক।

১১৭। ওয়াফাতের পূর্বে অহীর আধিক্য

- الرَّابِعُ: عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْيَ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهٖ، حَتّٰى تُوُفِّيَ اَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর কিছু পূর্বে আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর অনবরত অহী নাযিল করিতেছিলেন। এমনকি অহীর আধিক্যের সময় তাঁহার ওয়াফাত হইল। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

ঐ সময় অহীর আধিক্যের কারণ ছিল এই যে, তাঁহার ওয়াফাতের পূর্বেই যেন দ্বীন ও শরীয়তের যাবতীয় আহকাম ও বিধান নাযিল করা সম্পন্ন হইয়া যায়।

(অহীর আধিক্যের সময় তাঁহার ওয়াফাত হইল।) যখন বিশ্বমানবের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন সংবিধানরূপে শরীয়ত পূর্ণাংগতা লাভ করিল তখন আয়াত নাযিল হইল–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ *

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাংগ করিলাম।

ইহার কয়েক মাস পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াফাত লাভ করিলেন।

১১৮। ঈমানের সহিত মৃত্যুই হইল আসল

اَلْخَامِسُ : عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلٰى مَا مَاتَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক বান্দার হাশর ঐ অবস্থার উপর হইবে যেই অবস্থার উপর তাহার মৃত্যু হইয়াছে। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

এমন কি হাদীছ শরীফে এমনও আছে যে, বাদ্যবাদক তাহার বাদ্যযন্ত্র হাতে লাইয়া হাশরের মাঠে হাযির হইবে। পক্ষান্তরে যাহারা ঈমানের উপর এবং সুন্নতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে তাহাদিগকে সুন্নতের অনুসারী রূপে হাশরের মাঠে উঠানো হইবে। আর যে ব্যক্তি সারা জীবন শরীয়তের পাবন্দী করিয়া সুন্নত মুতাবিক জীবন যাপন করিবে এবং উত্তম আমল ও উত্তম আখলাকের উপর চলিবে এবং জীবনের সর্বাবস্থায় আল্লাহকে রাজিখুশী করিবার জন্য ইখলাছের সহিত আমল করিবে তাহারই মৃত্যু উত্তম অবস্থায় হইবে ইনশাআল্লাহ। তবে ইহাও ঠিক যে, আল্লাহ পাকের করুণা ও রহমতের কোন কুল কিনারা নাই। সারা জীবন শরাবে কাবাবে মজিয়া থাকা পাপী বান্দাকেও তিনি শেষ মুহূর্তে আপন রহমতের সুশীতল ছায়ায় টানিয়া লইতে পারেন।

অধ্যায় – ১৩

নেক আমলের অসংখ্য পথ

ইবাদত ও নেক আমলের প্রকার যদি এক দুইটিতে সীমাবদ্ধ থাকিত তবে বান্দার পক্ষে সর্বক্ষণ ইবাদতে ও নেক আমলে নিমগ্ন থাকা কষ্টকর হইত। কেননা মানুষের রুচি ও ইচ্ছা স্বভাবতঃ পরিবর্তনশীল। তাই আল্লাহ পাক অনুগ্রহবশতঃ বহুমুখী ও বহুসংখ্যক ইবাদত ও নেক আমলের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন যাহাতে একটি আমলের প্রতি নিস্পৃহা বোধ করিলে অন্য আমলে মন বসাইতে সক্ষম হয়। এইভাবে তাহার পূর্ণ সময়টুকু যেন মাওলার সন্তুষ্টি বিধানেই ব্যয় হয়।

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ *

তোমরা যে কোন নেক আমল করিবে আল্লাহ তাহা জানেন।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ *

যে ব্যক্তি কণা পরিমাণ নেক আমল করিবে সে উহা দেখিতে পাইবে।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ *

যে ব্যক্তি যে কোন নেক আমল করিল সে উহা নিজের জন্যই করিল।

ফায়দা ঃ

(দ্বিতীয় আয়াত) এই আয়াতের শিক্ষা এই যে, কোন নেক আমলকেই তুচ্ছ ও সাধারণ মনে করিয়া ছাড়িতে নাই। কেননা উহাও আমলনামায় জমা হইবে। আর কবুলিয়াতের কারণে হয়ত উহাই নাজাতের ওছিলা হইয়া যাইবে। তদ্রূপ ক্ষুদ্র ও হালকা মনে করিয়া কোন গোনাহ-ই করিতে নাই। কেননা উহাও আমলনামায় জমা হইবে। আর হইতে পারে যে, উহাই আল্লাহ পাকের ক্রোধের কারণ হইল আর জাহান্নামের ফয়সালা হইয়া গেল। মোটকথা, আমলের ক্ষুদ্রত্ব ও বড়ত্ব উহার পরিমাণ ও প্রকৃতি দ্বারা বিচার্য নহে। আসল বিষয় হইল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও কবুলিয়াত। আর উহা বড় আমল দ্বারাই হাছিল হইবে, ক্ষুদ্র আমল দ্বারা হইবে না; এমন কথা শরীয়তে বলা হয় নাই।

(তৃতীয় আয়াত) মানুষ যত নেক আমলই করিবে উহার সুফল দুনিয়া ও আখিরাতে সে নিজেই ভোগ করিবে। নেক আমল বান্দার পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌র উপর কোন ইহ্ছান বা অনুগ্রহ নহে। কেননা ইহা দ্বারা আল্লাহ্ পাকের রাজত্বে কোন বৃদ্ধি হইবে না। যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীছে কুদসীতে বলা হইয়াছে–

لو ان اولكم و آخركم و انسكم و جنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئا *

(হে আমার বান্দাগণ!) তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ইনসান ও জ্বিন যদি তোমাদের কোন একজনের সর্বোত্তম তাকওয়াপূর্ণ হৃদয়ের অনুরূপও হইয়া যায় তবে উহা আমার রাজত্বে কোন বৃদ্ধি ঘটাইবে না।

সুতরাং মানুষ নিজের নেক আমল দ্বারা নিজেরই উপকার করিতেছে। তবে বান্দার নেক আমল দ্বারা আল্লাহ্ পাকের খুশী হইবার কারণ হইল বান্দার প্রতি তাঁহার অশেষ রহমত ও করুণা।

এই বিষয়ে বহু আয়াত রহিয়াছে।

হাদীছসমূহ

আর হাদীছও রহিয়াছে অসংখ্য। এখানে কতিপয় মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

১১৯। মানুষকে কষ্ট না দেওয়াও ছাদাকা

ـ اَلْاَوَّلُ: عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: «اَلْاِيْمَانُ بِاللهِ، وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِهِ» قُلْتُ: اَيُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: «اَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا، وَاَكْثَرُهَا ثَمَنًا»، قُلْتُ: فَاِنْ لَمْ اَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِيْنُ صَانِعًا اَوْ تَصْنَعُ لِاَخْرَقَ»، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَاَيْتَ اِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ ؟ قَالَ: تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلٰى نَفْسِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

«اَلصَّانِعُ» بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ هٰذَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ، وَرُوِيَ «ضَائِعًا» بِالْمُعْجَمَةِ: اَيْ ذَا ضَيَاعٍ مِنْ فَقْرٍ اَوْ عِيَالٍ ، وَنَحْوِ ذٰلِكَ، «وَالْاَخْرَقُ»: اَلَّذِيْ لَا يُتْقِنُ مَا يُحَاوِلُ فِعْلَهُ.

হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শ্রেষ্ঠ আমল কোনটি? তিনি বলিলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁহার রাস্তায় জিহাদ করা। আমি বলিলাম, (আজাদ করিবার জন্য) কোন্ ধরনের গোলাম উত্তম? তিনি বলিলেন, যে গোলাম তাহার মালিকের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচাইতে দামী। আমি বলিলাম, যদি তাহা করিতে না পারি। তিনি বলিলেন, (তবে) কারিগরকে (তাহার কাজে) সাহায্য করিবে কিংবা আনাড়ী মানুষের কাজ করিয়া দিবে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি ইহার কোনটি না করিতে পারি তবে কি করিব? তিনি বলিলেন, মানুষকে তোমার অনিষ্ট হইতে দূরে রাখিবে। তাহা হইলে ইহা তোমার পক্ষ হইতে তোমার উপর একটি ছাদাকা হইবে।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা) ঈমান অর্থ আল্লাহকে আল্লাহ বলিয়া স্বীকার করা। তাঁহার যাবতীয় গুণ ও ছিফাত মানিয়া লওয়া। এই স্বীকৃতিই হইতেছে আল্লাহর সহিত বান্দার সম্পর্কের বুনিয়াদ ও সূত্রপাত। ইহার প্রতিফল হইতেছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও চিরস্থায়ী জান্নাত। ইহা ছাড়া কোন আমলই গ্রহণযোগ্য নহে। সুতরাং ইহা শ্রেষ্ঠ আমল হওয়াই স্বাভাবিক। ঈমান হইল কলবের আমল। অতঃপর অংগ প্রত্যংগের আমলের মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকে শ্রেষ্ঠ আমল বলা হইয়াছে। কেননা ইহা দুনিয়াতে আল্লাহর নাম বুলন্দ হইবার এবং সমস্ত আমল জিন্দা হইবার মাধ্যম। তদুপরি জিহাদ সম্পর্কে আল্লাহ পাক যত খোশখবরি দান করিয়াছেন অন্য কোন আমল সম্পর্কে তাহা করেন নাই। জান্নাতেও শহীদের একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা থাকিবে ثم احى ثم اقتل অর্থাৎ বারবার আমাকে জীবন দান করা হউক আর আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিয়া শহীদ হই।

(কোন্ ধরনের গোলাম উত্তম) সেই যুগে মানুষের মালিকানায় দাস-দাসী থাকিত। এই দাস-প্রথা ইসলামের পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। দাস-দাসীকে তখন মানুষ মনে করা হইত না। বরং তাহাদের সহিত পশুর ন্যায় আচরণ করা হইত। ইসলাম দাস-দাসীদের প্রতি সদয় আচরণের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করিয়াছিল এবং দাস-দাসীকে মুক্ত করিবার জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

(যদি না পারি) উপরে তিনটি বিষয় রহিয়াছে, ঈমান, জিহাদ ও গোলাম আজাদ করা, না পারিবার অর্থ জিহাদ বা গোলাম আযাদ করিতে না পারা। কেননা ঈমান তো সর্বাবস্থায়

জরুরী। উহা ছাড়া আখিরাতে কোন নেক আমলই গ্রহণযোগ্য নহে। সুতরাং উহা না পারিবার প্রশ্নই আসে না।

কাহারও কোন কাজে সামান্য পরিমাণ সহযোগিতা করাকেও জিহাদের পরবর্তী স্তরের নেক আমল ধরা হইয়াছে। এমন কি মানুষকে কষ্টদান হইতে বিরত থাকা, যাহা বাহ্যতঃ কোন আমল নহে, উহাকেও নেক আমল রূপে গণ্য করা হইয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, নেক আমল অসংখ্য প্রকার।

(ইহা তোমার পক্ষ হইতে তোমার উপর একটি ছাদাকা হইবে।) কেননা মানুষকে কষ্ট দিবার কারণে যে শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে ভোগ করিতে হইত উহা হইতে তুমি বাঁচিয়া গেলে।

১২০। শরীরের সকল জোড়ার জন্য ছাদাকা করা কর্তব্য

ـ اَلثَّانِيْ : عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ اَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامٰى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ. وَيُجْزِىءُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى» رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

«السُّلَامٰى» بِضَمِّ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيْفِ اللَّامِ وَفَتْحِ الْمِيْمِ: اَلْمِفْصَلُ.

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, (প্রতিদিন সকালে) তোমাদের শরীরের প্রতিটি জোড়ার বিনিময়ে একটি ছাদাকা দান করা কর্তব্য। আর প্রতিটি তাছবীহ একটি ছাদাকা এবং প্রতিটি তাহমীদ একটি ছাদাকা এবং প্রতিটি তাহলীল একটি ছাদাকা এবং প্রতিটি তাকবীর একটি ছাদাকা এবং সৎকাজের আদেশ একটি ছাদাকা এবং অসৎকাজ হইতে নিষেধ একটি ছাদাকা। আর এই সকল আমলের পরিবর্তে চাশতের সময় দুই রাক'আত নামায পড়াই যথেষ্ট। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

সকালে উঠিয়া মানুষ যখন দেখে যে, সারা রাত্র যখন সে ঘুমে বেঘোর ছিল তখন আল্লাহ পাক তাহার শরীরের প্রতিটি জোড়ার হিফাযত করিয়াছেন। ফলে উহা সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম অবস্থায় বহাল রহিয়াছে তখন আল্লাহ পাকের এই বিরাট অনুগ্রহ ও নেয়ামতের শোকর হিসাবে প্রতিটি জোড়ার বিনিময়ে একটি করিয়া ছাদাকা করা কর্তব্য। এই ছাদাকার ওছিলায় আশা করা যায় যে, আল্লাহ পাক তাহার শরীরের প্রতিটি জোড়ার হিফাযত অব্যাহত রাখিবেন।

على শব্দটি যদিও আবশ্যকতা বুঝায় কিন্তু মূলতঃ ইহা মুস্তাহাবকে তাকীদ করিবার জন্য। কেননা এই সমস্ত ছাদাকা কিংবা উহাদের স্থলবর্তী রূপে চাশতের নামায কোনটাই ওয়াজিব নহে এবং উহা তরক করায় গোনাহ হয় না।

আবু দাউদ শরীফে হযরত বোরায়দা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে বিষয়টি আরো বিশদভাবে আসিয়াছে। দেখুন–

হযরত বোরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, মানুষের শরীরে তিনশত ষাটটি জোড়া রহিয়াছে। সুতরাং তাহার কর্তব্য হইল প্রতিটি জোড়ার বিনিময়ে একটি করিয়া ছাদাকা করা। সকলে আরয করিল, হে আল্লাহর নবী! কেই বা উহা করিতে পারিবে? তিনি বলিলেন, মসজিদে পড়িয়া থাকা নাকের ময়লা সাফ করিয়া দেওয়া একটি ছাদাকা। পথ হইতে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো একটি ছাদাকা। তাহাও যদি না পার তবে চাশতের দুই রাক'আত তোমার জন্য যথেষ্ট হইবে।

তাসবীহ অর্থ سبحان الله অথবা سبحانك اللهم و بحمدك বলা।

তাহমীদ অর্থ الحمد لله বলা।

তাহলীল অর্থ لا اله الا الله বলা।

তাকবীর অর্থ الله اكبر বলা।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, উল্লেখিত কাজগুলি করিতে সক্ষম হওয়া অবস্থায়ও যদি কেহ ঐ গুলি না করিয়া শুধু চাশতের দুই রাক'আত নামায পড়ে তবে যথেষ্ট হইবে। কিন্তু আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় বলা হইয়াছে- যদি এইগুলি করিতে না পার তবে চাশতের দুই রাক্'আত যথেষ্ট হইবে।

ইহার ব্যাখ্যা এই যে, এইগুলি করিতে পারিলে এইগুলি দ্বারা তিনশত ষাটটি জোড়ার জন্য তিনশত ষাটটি ছাদাকা করাই উত্তম। তবে শুধু চাশতের নামায দ্বারাও যথেষ্ট হইতে পারে।

মাওলা পাকের রহমত ও করুণার বাহার দেখুন, আমলের এমন এমন সুযোগ তিনি করিয়া দিতেছেন যেন তাঁহার অলসতম বান্দাটিও তাঁহার রহমত ও ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত না হয়। ইহার পরও যদি কেহ দয়াময়ের দয়া হইতে নিজেকে মাহরূম রাখে তবে তো ইহা তাহারই মন্দভাগ্য।

হাদীছ দ্বারা চাশতের নামাযের মহাফযীলত প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং নিয়মিতভাবে উহার উপর আমল করা উচিত।

১২১। উম্মতের উত্তম ও মন্দ আমল

ـ اَلثَّالِثُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ اَعْمَالُ أُمَّتِيْ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِيْ مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا الْاَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ ، وَوَجَدْتُ فِيْ مَسَاوِىءِ اَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِيْ الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার সামনে আমার উম্মতের উত্তম ও মন্দ আমল পেশ করা হইল। আমি তাহাদের উত্তম আমলের মধ্যে পথ হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো দেখিতে পাইলাম এবং তাহাদের মন্দ আমলের মধ্যে মসজিদে পড়িয়া থাকা থুথু-কফ সাফ না করা দেখিতে পাইলাম। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(পথ হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো) কোন কোন মাশায়েখ বলিয়াছেন, ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা হইল لا اله الا الله এই কালিমা। আর সর্বনিম্ন শাখা হইল পথের কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা। সুতরাং পথে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করিবার সময় মুখে কালিমা উচ্চারণ করা উত্তম হইবে, যাহাতে ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখা একত্র হইয়া যায়। তখন আশা করা যায় যে, আল্লাহ পাক মধ্যবর্তী শাখাগুলির ছাওয়াব অনুগ্রহপূর্বক দান করিবেন।

(থুথু কফ সাফ না করা) বাহ্যত ইহাই বুঝা যায় যে, থুথু কফ যে ফেলিয়াছে তাহার যেমন গোনাহ হইবে। তেমনি যে দেখিয়া উহা সাফ না করিবে তাহারও গোনাহ হইবে। অবশ্য প্রথম জনের গোনাহ অধিক হইবে।

১২২। গরীবদের ছাদাকা কী?

- الرَّابِعُ عَنْهُ: اَنَّ نَاسًا قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالْاُجُوْرِ، يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ ، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ اَمْوَالِهِمْ قَالَ: «اَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُوْنَ بِهٖ: اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً، وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ،وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِيْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ »، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ اَيَاْتِيْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهٗ، وَيَكُوْنُ لَهٗ فِيْهَا اَجْرٌ؟! قَالَ: «اَرَاَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِيْ حَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذٰلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهٗ اَجْرٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

«اَلدُّثُوْرُ» بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ: اَلْاَمْوَالُ، وَاحِدُهَا: دَثْرٌ.

হযরত আবু যর (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, একদল (গরীব) লোক আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিত্তশালীরা সমস্ত ছাওয়াব লইয়া গেল। (কেননা) আমরা যেমন নামায পড়ি, তাহারাও পড়ে এবং আমরা যেমন রোযা রাখি, তাহারাও রাখে। তদুপরি তাহারা নিজেদের উদ্বৃত্ত অর্থ ছাদাকা করে (অথচ আমরা তাহা করিতে পারি না) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ কি তোমাদের জন্য ছাদাকা করিবার মত কোন কিছু রাখেন নাই? নিঃসন্দেহে প্রতিটি তাসবীহের বিনিময়ে (তোমাদের জন্য) একটি ছাদাকা (র ছাওয়াব) রহিয়াছে এবং প্রতিটি তাকবীরের বিনিময়ে একটি ছাদাকা (র ছাওয়াব) রহিয়াছে এবং প্রতিটি তাহমীদের বিনিময়ে একটি ছাদাকা (র ছাওয়াব) রহিয়াছে এবং প্রতিটি তাহলীলের বিনিময়ে একটি ছাদাকা (র ছাওয়াব) রহিয়াছে এবং প্রতিটি সৎ কাজের আদেশ একটি ছাদাকা এবং প্রতিটি মন্দ কাজ হইতে নিষেধ একটি ছাদাকা। এমনকি তোমাদের স্ত্রীসহবাসের মাঝেও ছাদাকা (র ছাওয়াব) রহিয়াছে। ছাহাবা কেরাম আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের একজন তাহার শাহওয়াত পুরা করিবে আর তাহাতে তাহার ছাওয়াব হইবে! তিনি বলিলেন, তোমাদের কি মনে হয়, যদি সে উহা হারাম উপায়ে পুরা করিত তবে কি তাহার গোনাহ হইত? (তাহারা আরয করিলেন,

অবশ্যই গোনাহ্ হইত। তিনি বলিলেন) তদ্রূপ যদি সে উহা হালাল উপায়ে পুরা করে তবে তাহার জন্য ছাওয়াব হইবে। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

আলোচ্য হাদীছ হইতে বাহ্যত ইহাই বুঝা যায় যে, স্ত্রীসহবাস দ্বারা সর্বাবস্থায় ছাওয়াব হইবে। কিন্তু ইমাম আহমদ (রহঃ) বর্ণিত হাদীছে নেক নিয়ত করিবার শর্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ যদি সহবাস দ্বারা চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করিবার তদ্রূপ স্ত্রীর (বা স্বামীর) হক আদায় করিবার বা নেক সন্তান লাভের নিয়ত করে তবেই ছাদাকার ছাওয়াব হইবে।

এই হাদীছ দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, যাবতীয় নেক কাজই ছাদাকা রূপে গণ্য হইবে। মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীছও ইহা প্রমাণ করে–

كل معروف صدقة যে কোন সদাচারই ছাদাকা।

১২৩। মুসলমান ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ

: ـ اَلْخَامِسُ : عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ : «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, কোন নেক কাজ (ও সদাচার)-কেই তুচ্ছ মনে করিও না। যদিও তাহা আপন ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাই হয়। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

অর্থাৎ তুচ্ছ মনে করিয়া কোন নেক আমলই তরক করিও না। কেননা তুমি জান না যে, কোন আমল আল্লাহর পছন্দ হইয়া যাইবে এবং উহার ওছিলায় তোমার সমস্ত আমল কবুল করা হইবে এবং তোমার বেড়া পার হইয়া যাইবে। যেমন এক হাদীছে আছে–

ان العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات * (رواه البخارى)

বান্দা (কখনো কখনো) এমন কথা উচ্চারণ করে যাহার প্রতি সে তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করে না। অথচ উহার কারণে আল্লাহ তাহার বহু দরজা বুলন্দ করিয়া দেন।

সামান্য সদাচারের উদাহরণ হিসাবে হাদীছ শরীফে বলা হইয়াছে যে, তুমি যদি তোমার ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে কথা বল তবে ইহাতে তোমার কোন কষ্ট নাই। আর্থিক বা অন্য কোন রকমের ক্ষতিও নাই। খুবই সহজ ও সামান্য কাজ ইহা। কিন্তু ছাওয়াবের হিসাবে ইহাকেও তুচ্ছা মনে করা উচিত নহে। কেননা আল্লাহর নিকট ইহা খুবই প্রিয় আমল। ইহার বিনিময়ে বান্দার আমলনামায় তিনি অনেক ছাওয়াব দান করেন। কেননা হাসিমুখে কথা বলিবার দ্বারা মুসলমান ভাইয়ের অন্তর খুশী হয়। পরস্পর মুহব্বত সৃষ্টি হয়। অন্তরে অন্তরে ভাংগনের পরিবর্তে জোড় সৃষ্টি হয়। আর এই হৃদয়ের জোড়কে আল্লাহ তাঁহার পাক কালামে বিশেষ নেয়ামত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا *

তিনি তোমাদের হৃদয়ের মাঝে জোড় সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে তাহার নিয়ামতগুণে তোমরা ভাই ভাই হইয়াছ।

দেখুন, অতি সহজ ও সামান্য একটি আমল কত বড় সুফল ডাকিয়া আনিতে পারে। তবে ইহা আল্লাহর হুকুম হিসাবে আল্লাহকে খুশী করিবার জন্য করিতে হইবে। সদালাপী, মিশুক ও সামাজিক ইত্যাদি সুনাম কুড়াইবার উদ্দেশ্যে করিলে কোন ছাওয়াব পাওয়া যাইবে না। বরং রিয়ার কারণে উল্টা গোনাহ্ হইবে।

১২৪। ছাদাকা শুধু মালের নহে আমলেরও হইতে পারে।

- اَلسَّادِسُ: عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «كُلُّ سُلَامٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِيْ دَابَّتِهِ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيْهَا اِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ اَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ عَلٰى سِتِّيْنَ وَثَلَاثِمِائَةِ مِفْصَلٍ ، فَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ، وَحَمِدَ اللّٰهَ، وَهَلَّلَ اللّٰهَ، وَسَبَّحَ اللّٰهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ شَوْكَةً اَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ ، اَوْ اَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهٰى عَنْ مُنْكَرٍ، عَدَدَ السِّتِّيْنَ وَالثَّلَاثِمِائَةِ، فَاِنَّهُ يُمْسِيْ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ».

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষের (শরীরের) প্রতিটি জোড়ার বিনিময়ে একটি করিয়া ছাদাকা (করা) কর্তব্য। আর ইহা সূর্য উদিত হয় এমন প্রতিটি দিনের কর্তব্য।

দুই জনের মাঝে ইনছাফ করা একটি ছাদাকা। সাওয়ারিতে উঠিবার ব্যাপারে কিংবা সাওয়ারির উপর সামান উঠাইবার ব্যাপারে কাহাকেও সাহায্য করা একটি ছাদাকা। উত্তম কথাও একটি ছাদাকা। এমন কি নামাযে যাইবার পথে প্রতিটি পদক্ষেপও এক একটি ছাদাকা এবং পথের কষ্টদায়ক জিনিস সরানো একটি ছাদাকা। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রতিটি আদম সন্তানকে তিনশত ষাটটি জোড়া দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করিবে এবং আল্লাহর প্রশংসা করিবে এবং আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করিবে এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিবে এবং আল্লাহর নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা করিবে এবং লোকদের চলাচলের পথ হইতে পাথর কিংবা কাঁটা কিংবা হাড় (কিংবা এই ধরনের কিছু) সরাইবে কিংবা কোন সৎ কাজের আদেশ করিবে

কিংবা কোন অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিবে এবং সমস্ত কাজ (সর্বসাকুল্যে) তিনশত ষাট সংখ্যার সমপরিমাণ করিবে সে ঐ দিন এমন অবস্থায় সন্ধ্যা যাপন করিবে যে, নিজের উপর জাহান্নামের আগুন দূর করিয়া দিয়াছে।

ফায়দা ঃ

(আর ইহা সূর্য উদিত হয় এমন প্রতিটি দিনের কর্তব্য) ধারণা হইতে পারিত যে, শরীরের জোড়া সমূহের নেয়ামতের শোকর হিসাবে হাদীছ শরীফে যে সমস্ত ছাদাকার কথা বলা হইয়াছে তাহা একবার মাত্র আদায় করিলেই বুঝি কর্তব্য পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই ধারণা দূরা করিবার জন্য স্পষ্টভাবে বলা হইল যে, ইহা প্রতিদিন করিতে হইবে।

সূর্য উদিত হয় না এমন কোন দিন ত হইতে পারে না। ইহা সত্ত্বেও সূর্য উদয়ের কথা বলিবার উদ্দেশ্য হইল বিষয়টি তাকিদ করা।

(দুইজনের মাঝে ইনছাফ করা) অর্থাৎ শাসক হইলে শাসনের মাধ্যমে, বিচারক হইলে বিচারের মাধ্যমে, সাধারণ মানুষ হইলে উপদেশ দানের মাধ্যমে এবং প্রভাবশালী মানুষ হইলে প্রভাব প্রয়োগের মাধ্যমে। ইহা ছাদাকা হইবার কারণ এই যে, মজলুম জুলুম হইতে রক্ষা পাইল এবং জালিমও জুলুমের মন্দ পরিণতি হইতে রক্ষা পাইল। যেমন হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

انصر اخاك ظالما او مظلوما *

(তোমার ভাইকে জালিম ও মজলুম উভয় অবস্থায় সাহায্য কর।

ছাহাবা কেরাম আরয করিলেন, মজলুমের অবস্থা তো বুঝিলাম। কিন্তু জালিমের বিষয়টি কেমন? তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, تمنعه من الظلم (তাহাকে জুলুম হইতে বিরত রাখিবে।)

ইহা তাহাকে সাহায্য করিবার নামান্তর। কেননা সে জুলুমের কঠিন পরিণতি হইতে বাঁচিয়া গেল।

(উত্তম কথা) অর্থাৎ এমন কথা যাহাতে নিজের কিংবা অপরের দ্বীন বা দুনিয়ার সামান্যতম ফায়দাও হয়। কিংবা শ্রোতার অন্তরে আনন্দ হয়। যেমন, ছালাম করা, বৈধ প্রশংসা করা, সান্ত্বনা দেওয়া ইত্যাদি।

(নামাযে যাইবার প্রতিটি পদক্ষেপ) হাদীছ শরীফে জামা'আতের সহিত নামায পড়িবার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা হইল জামা'আতের সহিত নামায পড়িবার সর্বনিম্ন ফযীলত। বিভিন্ন হাদীছে জামা'আতের আরও বড় বড় ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। ছাহাবা কেরামের যুগে জামা'আতে শরীক হইবার এমনই গুরুত্ব ছিল যে, কেহ যদি দুইজন মানুষের কাঁধে ভর করিয়াও মসজিদে আসিতে পারিত তবে সে জামা'আতে অনুপস্থিত থাকিত না। বস্তুতঃ কঠিন মাযুর ব্যক্তি এবং প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া অন্য কেহ জামা'আত তরক করিত না।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত সোলায়মান (রহঃ)-কে একবার ফজরের জামা'আতে না দেখিয়া খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) তাঁহার খোঁজ লইতে গেলেন। তাঁহার

আম্মা জানাইলেন যে, সোলায়মান সারা রাত্র নফল পড়িয়াছে। তাই ঘরেই ফজর পড়িয়া শুইয়া পড়িয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সারা রাত্র নফল পড়িবার চাইতে ফজরের জামা'আতে শরীক হওয়া আমার নিকট অধিক উত্তম।

এখন ভাবিয়া দেখা উচিত যে, দুনিয়ার কত সাধারণ হইতে সাধারণ কাজের কারণে আমরা জামা'আত তরক করিয়া থাকি। অথচ যাহারা জামা'আতে শরীক হয় না, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের বাড়ী-ঘর জ্বালাইয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু শিশু ও নারীদের কথা চিন্তা করিয়া উহা করেন নাই।

(পথের কষ্টদায়ক) হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, ঈমানের শাখা হইল সত্তরের উপর। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হইল কালিমা-ই-তাইয়েবা। আর সর্বনিম্ন হইল পথের কষ্টদায়ক জিনিস সরানো। এই কারণে কোন কোন মাশায়েখ বলিয়াছেন যে, পথের কষ্টদায়ক জিনিস সরাইবার সময় لا اله الا الله মুখে উচ্চারণ করা উচিত, যাহাতে ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখার উপর একত্রে আমল হইয়া যায়। ইহার বরকতে আল্লাহ পাক ঈমানের অন্য সকল শাখার উপর আমল করিবার তাওফীক দান করিবেন।

বড়ত্ব বর্ণনার অর্থ الله اكبر বা এই জাতীয় কিছু বলা (এবং অন্তরে তাহা বিশ্বাস করা।)

প্রশংসা করিবার অর্থ الحمد لله বা এই জাতীয় কিছু বলা।

একত্ব ঘোষণা করিবার অর্থ لا اله الا الله বা এই জাতীয় কিছু বলা।

পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ سبحان الله বা এই জাতীয় কিছু বলা।

মানুষ ছাদাকা বলিতে মালের ছাদাকাই শুধু বুঝিয়া থাকে। সুতরাং গরীব লোকেরা মনে করে যে, তাহাদের অন্য সকল আমলের সুযোগ থাকিলেও ছাদাকার আমল করিয়া ছাওয়াব হাছিলের কোন সুযোগ নাই। যেমন পিছনে বর্ণিত হইয়াছে যে, গরীব ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুযোগ করিয়াছিলেন। এই আলোচ্য হাদীছ গুলিতে ছাদাকার হাকীকত বয়ান করা হইয়াছে যে, আমলের মাধ্যমেও বড় বড় ছাদাকার ছাওয়াব হাছিল করা যাইতে পারে।

জনৈক বুযুর্গ বলিতেন আমি প্রতিদিন বড় বড় ছাদাকা করিয়া থাকি।

লোকেরা খুবই আশ্চর্য হইল যে, ইনি তো তেমন বিত্তশালী নহেন। সুতরাং নিশ্চয় তিনি কোন গুপ্তধনের মালিক হইয়াছেন এবং উহা হইতে বড় বড় ছাদাকা করিয়া থাকেন। লোকেরা তাহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, হাঁ, তোমরা ঠিকই ধারণা করিয়াছ। আমি এক গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়াছি। উহা হইতেই প্রতিদিন এই বিরাট পরিমাণ ছাদাকা করিয়া থাকি। তবে তোমরা চাহিলে তোমাদিগকেও ঐ গুপ্তধনের সন্ধান বলিয়া দিতে পারি। সকলে আরয করিল, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন, প্রতিদিন শয়নকালে তাসবীহে ফাতেমী পড়িয়া ঘুমাইও। বড় বড় ছাদাকার ছাওয়াব হইবে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে এই গুপ্তধনের সন্ধান বলিয়াছিলেন।

১২৫। মসজিদে গমনের ফযীলত

- اَلسَّابِعُ: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

«النُّزُلُ»: الْقُوتُ وَالرِّزْقُ وَمَا يُهَيَّأُ لِلضَّيْفِ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় মসজিদে গমন করিবে আল্লাহ্ পাক (আপন অনুগ্রহে তাহার এই আমলের ছাওয়াব রূপে) জান্নাতে তাহার জন্য মেহমানদারি তৈয়ার করিবেন। যখনই সে সকালে বা সন্ধ্যায় গমন করিবে। (তখনই মেহমানদারি তৈয়ার হইতে থাকিবে।) (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(মসজিদে গমন করিবে) জামা'আতে শরীক হইবার জন্য, নামায আদায় করিবার জন্য, ইলম ও তালিমের জন্য বা দাওয়াতের কাজে আল্লাহকে খুশী করিবার জন্য মসজিদে গমন করা সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমানকালে মসজিদ শুধু পাঞ্জেগানা নামায আদায়ের মাঝে সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এমন কি নামাযের সময় ছাড়া অন্য সময় মসজিদ তালাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। অথচ বিগত যুগে মসজিদ এমন নির্জীব ছিল না। বরং সর্বক্ষণ মসজিদে মানুষের যাতায়াত অব্যাহত থাকিত। কেহ নফল নামায পড়িত। কেহ যিকির করিত। কেহ নফল ইতিকাফ করিত। কেহ ইলম চর্চা করিত। তালীমের হালকা জারী হইত। এই ভাবে সকাল হইতে সন্ধ্যা মসজিদ বিভিন্ন আমলে সরগরম থাকিত।

এই ধরনের জীবন্ত মসজিদ উম্মতের কল্যাণ ও বরকতের ওছিলা ছিল। পক্ষান্তরে আমাদের বর্তমান দুর্গতির অন্যতম কারণ হইল মসজিদের এই অনাবাদ পরিবেশ। কেননা বে-আবাদ মসজিদ তাহার পড়শীদের জন্য বদ দু'আ করে। আলহামদু লিল্লাহ! বর্তমানে দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে সকল শ্রেণী ও সকল তবকার মাঝে মসিজদকে জিন্দা ও আবাদ করিবার এক মুবারক মেহনত শুরু হইয়াছে এবং উহার কিছু কিছু সুফল মানুষ দেখিতেও পাইতেছে। যেই মসজিদে জামা'আত অবস্থান করে সারাদিন সেই মসজিদের রূপই থাকে আলাদা।

১২৬। কোন হাদিয়া তুচ্ছ মনে করা উচিত নহে

- اَلثَّامِنُ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: اَلْفِرْسَنُ مِنَ الْبَعِيْرِ: كَالْحَافِرِ مِنَ الدَّابَّةِ، قَالَ: وَرُبَّمَا اسْتُعِيْرَ فِي الشَّاةِ.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হে মুসলিম নারীগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন আপন প্রতিবেশিনীর

জন্য (সামান্য হাদিয়াকে) তুচ্ছ মনে না করে। হউক না তাহা বকরীর (সামান্য) একটি খুর। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

হাদীছের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ কেহ যেন তুচ্ছ মনে করিয়া আপন প্রতিবেশিনীর নিকট ছোটখাটো কোন কিছু হাদিয়া পাঠাইতে সংকোচ বোধ না করে এবং বিরত না হয়। কেননা ইখলাছের সহিত মুহব্বত করিয়া যাহা কিছু দান বা হাদিয়া করা হইবে উহা আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে এবং উহা দ্বারা পরস্পর মুহব্বত পয়দা হইবে। পক্ষান্তরে মুখরক্ষা বা সামাজিকতার খাতিরে যত মূল্যবান ও দামী হাদিয়াই পাঠানো হউক না কেন, উহা আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে না এবং হাদিয়ার যে গুণ অর্থাৎ পরস্পর মুহব্বত পয়দা হওয়া, উহা হইবে না। বরং অধিকতর দূরত্বই পয়াদা হইবে।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিবেশিনীর পক্ষ হইতে যদি সামান্য কিছুও হাদিয়া আসে তবে উহাকে তুচ্ছ মনে করিয়া ফেরত দেওয়া উচিত নহে। বরং মুহব্বতের নিদর্শন ও আল্লাহর নেয়ামত মনে করিয়া উহা গ্রহণ করা উচিত এবং হাদিয়া প্রেরণকারিণীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

নারীদিগকে সম্বোধন করিবার কারণ এই যে, এই বিষয়ে স্ত্রীলোকেরাই সাধারণতঃ বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। কিংবা সাধারণতঃ দুই প্রতিবেশী ঘরে তাহাদের মাধ্যমেই হাদিয়ার আদান প্রদান হইয়া থাকে।

বকরীর খুর দ্বারা সামান্য জিনিস বুঝানো উদ্দেশ্য।

১২৭। ঈমানের শাখা প্রশাখা

- اَلتَّاسِعُ: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ، اَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً: فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

«اَلْبِضْعُ» مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلٰى تِسْعَةٍ، بِكَسْرِ الْبَاءِ وَقَدْ تُفْتَحُ. «وَالشُّعْبَةُ»: اَلْقِطْعَةُ.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ঈমানের শাখা হইল সত্তরের কিংবা ষাটের কিছু বেশী। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হইল لا اله الا الله বলা এবং সর্বনিম্ন হইল পথ হইতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা। আর হায়া বা লজ্জা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

হাদীছের بضع শব্দটি তিন হইতে নয় সংখ্যা জ্ঞাপক.

ফায়দা ঃ

بضع শব্দটি তিন হইতে নয় সংখ্যা জ্ঞাপক। সুতরাং অর্থ হইল ঈমানের শাখা সত্তরের বা ষাটের কিছু বেশী। আর ইহা তেহাত্তর হইতে উনাশি কিংবা তেষট্টি হইতে উনসত্তর পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা হইতে পারে।

সত্তর হইবে না কি ষাট হইবে ইহা বর্ণনাকারীর পক্ষ হইতে সন্দেহ।

কোন কোন ভাষ্যকারের মতে সত্তর বা ষাট এই সংখ্যা দ্বারা আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ঈমানের শাখা প্রশাখা বহু। তবে সকল শাখা প্রশাখার মূল উদ্দেশ্য একটি। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন শরীয়তানুগ করিবার মাধ্যমে আত্মার সংশোধন এবং আখিরাতের সফলতা অর্জন। ইহার উপায় হইল সঠিক আকীদা পোষণ করা এবং আমলের ক্ষেত্রে সরল পথে অবিচল থাকা। এই জন্যই ছাহাবী সুফয়ান ছাকাফী (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করিলেন যে, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলিয়া দিন যাহার সম্পর্কে আপনার পরে আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিব না; তখন তিনি বলিলেন,

قل آمنت بالله ثم استقم

তুমি বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিলাম, অতঃপর অবিচল থাক।

তবে অনেক ভাষ্যকারের মতে প্রকৃত সংখ্যাই উদ্দেশ্য। সম্ভবতঃ প্রথমে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষাট সংখ্যার কথা জানিয়াছিলেন, ফলে উহাই বলিয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে আরও দশটির কথা জানানো হইয়াছে এবং তিনি ছাহাবা কেরামকে উহা জানাইয়াছেন। এই কারণে বর্ণনায় সংখ্যা-পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে।

আল্লামা ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, ঈমানের উল্লেখিত শাখা গণনার ক্ষেত্রে সকলে অভিন্ন পন্থা অনুসরণ করেন নাই। তবে আল্লামা ইবনে হিব্বান (রহঃ)-এর অনুসৃত পন্থা অধিকতর বিশুদ্ধ। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার পাক কালামে এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পবিত্র সুন্নায় যে সমস্ত ইবাদত ও নেক আমল উল্লেখ করিয়াছেন, গণনা করিয়া দেখি যে, উহাদের সংখ্যা উনাশিটি। কমও নহে, বেশীও নহে। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, এই সংখ্যাই আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, আমি ঈমানের কথিত শাখাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, উহাদের সম্পর্ক কলবের সহিত কিংবা জিহ্বার সহিত কিংবা শরীরের অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগের সহিত। কলবের আমল হইল নিয়ত ও আকীদাসংক্রান্ত বিষয়। এইগুলি মোট চব্বিশটি। যথা–

১। আল্লাহর প্রতি ঈমান। আল্লাহর যাত ও ছিফাত তথা সত্তা ও গুণাবলীর উপর ঈমান এবং তাঁহার একত্ব ও লাশরীক হইবার ঈমান এবং কোন কিছু তাঁহার মত নহে এই ঈমান এবং সকল কিছুই তাঁহার সৃষ্ট এই সমস্ত ঈমানও উক্ত ঈমান বিল্লাহ-এর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

২। ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান।

৩। আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান।

৪। সকল নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান।

৫। ভাল ও মন্দ তাকদীরের প্রতি ঈমান।

৬। শেষ দিবসের প্রতি ঈমান। (কবর, পুনরুত্থান, হাশর-নশর, হিসাব, আমলের ওজন, পোলছেরাত ও জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির প্রতি ঈমান ইহার অন্তর্ভুক্ত।)

৭। আল্লাহর প্রতি মুহব্বত।

৮। আল্লাহর জন্য কাহারও প্রতি ভালবাসা বা বিদ্বেষ পোষণ।
৯। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মুহব্বত ও আযমত। (ইহাতে দুরূদ ও সালাম এবং তাঁহার সুন্নত তরীকা অনুসরণ অন্তর্ভুক্ত।)
১০। ইখলাছ, (রিয়া ও মুনাফেকী বর্জন ইহার অন্তর্ভুক্ত।)
১১। তাওবা।
১২। আল্লাহর ভয়।
১৩। আল্লাহর রহমত লাভের আশা।
১৪। শোকর।
১৫। ছবর।
১৬। তাকদীরের ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্টি।
১৭। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা।
১৮। (মাখলূকের প্রতি) দয়া ও করুণা প্রদর্শন।
১৯। বিনয়। (বড়দের প্রতি সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ ইহার অন্তর্ভুক্ত।)
২০। অহংকার বর্জন।
২১। আত্মতুষ্টি বর্জন।
২২। হিংসা বর্জন।
২৩। বিদ্বেষ বর্জন।
২৪। ক্রোধ বর্জন।

জিহ্বার আমল হইল সাতটি। যথা–
১। তাওহীদের কালিমা উচ্চারণ।
২। কোরআন শরীফ তিলাওয়াত।
৩। ইলম শিক্ষা করা।
৪। ইলম শিক্ষা দান।
৫। যাবতীয় দু'আ।
৬। যিকির। (ইস্তিগফার ইহার অন্তর্ভুক্ত।)
৭। বেহুদা কথা পরিহার করা।

শরীরের অন্যান্য অংগের সহিত সম্পর্কিত আমলগুলির সংখ্যা আটত্রিশ। পনেরটির সম্পর্ক নিজের ব্যক্তিসত্তার সহিত যথা।–
১। নাপাকি হইতে পবিত্রতা লাভ করা। (শরীরে বা কাপড়ে লাগিয়া থাকা নাজাসাত ধোয়ার মাধ্যমে এবং অযু গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা এবং ছতর ঢাকা ইহার অন্তর্ভুক্ত।)
২। নফল ও ফরয নামায আদায় করা।
৩। নফল দান ছাদাকা ও ফরয যাকাত।
৪। গোলাম আযাদ করা।
৫। দানশীলতা। (অভাবীকে আহার ও মেহমানের ইকরাম করা ইহার অন্তর্ভুক্ত।)
৬। নফল ও ফরয রোযা।
৭। নফল ও ফরয হজ্জ।

৮। ওমরাহ্।

৯। তাওয়াফ।

১০। ইতিকাফ।

১১। লাইলাতুল কদর তালাশ করা।

১২। দ্বীন রক্ষার জন্য পলায়ন করা। (দারুল কুফর হইতে হিজরত করা ইহার অন্তর্ভুক্ত।)

১৩। নযর ও মান্নত পূর্ণ করা।

১৪। কসম রক্ষা করা।

১৫। কাফ্ফারা আদায় করা।

ছয়টির সম্পর্ক হইল অধীনস্থদের সহিত। যথা—

১। বিবাহের মাধ্যমে চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জন।

২। পরিবার-পরিজনের হক আদায় করা।

৩। পিতা-মাতার প্রতি অনুগত থাকা এবং সদাচরণ করা।

৪। সন্তানদের তারবিয়াত ও লালন পালন।

৫। আত্মীয়তার হক আদায় করা (ছিলাতুর-রিহ্ম)

৬। নেতার আনুগত্য এবং অধীনস্থদের প্রতি সদয়তা।

সতেরটির সম্পর্ক জনসাধারণের সহিত। যথা—

১। ইনসাফের সহিত শাসন।

২। মুসলমানদের জামা'আতের সংগে থাকা।

৩। শাসকবর্গের অনুগত থাকা।

৪। লোকদের মাঝে সম্প্রীতি ও শান্তি শৃংখলা স্থাপন করা (বিদ্রোহীদের শাস্তি বিধান ইহার অন্তর্ভুক্ত।)

৫। নেক কাজে পরস্পর সহযোগিতা করা। সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ।

৬। হদ ও ইসলামী শাস্তি কায়েম করা।

৭। জিহাদ করা (সীমান্ত প্রহরা ইহার অন্তর্ভুক্ত।)

৮। আমানত আদায় করা।

৯। প্রতিবেশীর হক আদায় করা।

১০। মানুষের সহিত সদাচরণ করা।

১১। হালাল উপায়ে সম্পদ অর্জন করা।

১২। হালাল পথে খরচ করা (অপচয় ও অপব্যয় পরিহার করা ইহার অন্তর্ভুক্ত।)

১৩। সালামের উত্তর দেওয়া।

১৪। হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া।

১৫। লোকদিগকে কষ্টদান হইতে বিরত থাকা।

১৬। বেহুদা কাজ ও খেলাধুলা পরিহার করা।

১৭। পথ হইতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা।

এইগুলি মোট উনসত্তরটি হইল। তবে কতিপয় আমলকে বিভক্ত করিয়া সংখ্যা উনাশিতে উন্নীত করা যায়।

আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তের আমলকে ঈমান বলা যায়। অর্থাৎ আকীদা ও বিশ্বাসের পাশাপাশি আমলও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আর তাহা হাদীছে উল্লেখিত সংখ্যার মাঝে সীমাবদ্ধ। তবে শরীয়ত সংখ্যা নির্ধারণ করে নাই এবং আমল সমূহের বিশদ বিবরণও প্রদান করে নাই।

পরবর্তী কালের কোন কোন আলিম কষ্টার্জিতভাবে আমল সমূহের বিশদ বিবরণ তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং নিজেদের ধারণা মুতাবিক হাদীছে উল্লেখিত সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাহা সঠিক নহে। কেননা কোন কোনটিকে বিভক্তিকরণের মাধ্যমে এবং কোন কোনটিকে অন্যটির সহিত যুক্ত করিবার মাধ্যমে সংখ্যায় কম বেশী করিবার অবকাশ রহিয়াছে। সুতরাং আবু সোলাইমান খাত্তাবী (রহঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহাই বিশুদ্ধ মত। অর্থাৎ উক্ত সংখ্যার বিশদ বিবরণ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের জানা আছে এবং শরীয়তে ঐ সমস্ত আমলের বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। তবে শরীয়ত আমাদিগকে উহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করিয়া দেয় নাই এবং আমলগুলিকে উক্ত সংখ্যায় বন্টন করিবার পদ্ধতিও জানাইয়া দেয় নাই। তবে শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ বিস্তারিতভাবে জানিয়া উহার উপর আমল করিবার ক্ষেত্রে এই না জানার কোন প্রভাব নাই। অর্থাৎ ঈমানের শাখা-প্রশাখার সঠিক সংখ্যা এবং শরীয়তের যাবতীয় আমলকে উক্ত সংখ্যায় বন্টনের পদ্ধতি না জানা সত্ত্বেও আমরা শরীয়তের প্রতিটি আদেশ পালন করিতে পারি এবং নিষেধগুলি বর্জন করিতে পারি।

তবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের সর্বোত্তম, সর্বনিম্ন ও মধ্যবর্তী শাখা বলিয়া দিয়াছেন।

লজ্জা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। হায়া বা লজ্জা মানুষের মনের সেই অবস্থা যাহা মানুষকে 'সু-কর্ম' করিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং কু-কর্ম হইতে বিরত রাখে। কেননা যে লজ্জাশীল সে দুনিয়াতে বা আখিরাতে অপদস্থ হওয়াকে ভয় করে। ফলে সে যাবতীয় নাফরমানি হইতে বিরত থাকে এবং যাবতীয় ইবাদত পালন করে। তবে সর্বোচ্চ হায়া বা লজ্জা হইল আল্লাহকে লজ্জা করা। অর্থাৎ এই চেষ্টা করা যে, আল্লাহ যাহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন তাহাকে যেন উহাতে তিনি লিপ্ত দেখিতে না পান। এই লজ্জা সৃষ্টি হইবে যদি বান্দা সর্বদা চিন্তা করে যে, আল্লাহ তাহাকে দেখিতেছেন এবং একদিন তাহাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াইতে হইবে। এই অনুভূতিকেই হাদীছ শরীফে ইহসান বলা হইয়াছে।

বস্তুতঃ উম্মতের মাঝে আজ লজ্জাহীনতা ও বেহায়াপনার কারণেই যাবতীয় নাফরমানি ও পাপাচারের এমন প্রকোপ দেখা দিয়াছে এবং মুসলিম উম্মতের শত্রুরাও বিভিন্ন উপায়ে এই হায়া শরম ও লাজলজ্জাকে বিদায় করিবার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হইল নিজেদের ব্যক্তি জীবনে, ঘরে, সমাজে ও সর্বত্র হায়া শরম ও পর্দাপুশিদা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করা। আল্লাহ আমাদের সকলকে হিফাযত করুন ও তাওফীক দান করুন। আমীন।

১২৮। পশুর সেবা করিবার ছাওয়াব

- الْعَاشِرُ: عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ

الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ»، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَر لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا: «بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».

«اَلْمُوْقُ»: اَلْخُفُّ. «وَيُطِيْفُ»: يَدُوْرُ حَوْلَ «رَكِيَّة» وَهِيَ الْبِئْرُ.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এক লোক কোন এক পথে চলিতেছিল। এমন সময় তাহার ভীষণ পিপাসা হইল। (কিছুদূর গিয়া) সে একটি কুয়া দেখিতে পাইল এবং উহাতে নামিয়া পানি পান করিল। অতঃপর কুয়া হইতে উঠিয়া আসিল। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল যে, একটি কুকুর হাঁপাইতেছে এবং প্রচণ্ড পিপাসার কারণে কাদামাটি লেহন করিতেছে। লোকটি তখন (মনে মনে) বলিল, আমার যেমন পিপাসা পাইয়াছিল এই কুকুরটিরও তেমনই পিপাসা পাইয়াছে। তখন সে (আবার) কুয়ায় নামিয়া (চামড়ার) মোজায় পানি ভরিল এবং উহাকে মুখে কামড়াইয়া ধরিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। অতঃপর কুকুরকে পানি পান করাইল। আল্লাহ পাক তাহার এই আমল কবুল করিলেন এবং তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন।

ছাহাবা কেরাম আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশুদের (সেবা যত্নের) ক্ষেত্রেও কি আমাদের জন্য ছাওয়াব রহিয়াছে? তিনি বলিলেন, প্রত্যেক তাজা কলিজার ক্ষেত্রে[১] ছাওয়াব রহিয়াছে।' (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্ তা'আলা (এই আমলের জন্য) তাহার শোকর করিলেন এবং তাহাকে মাফ করিয়া জান্নাতে দাখিল করিলেন।

বুখারী, মুসলিম উভয়ের অন্য এক বর্ণনায় আছে, একটি কুকুর যখন এক কুয়ার চারিপার্শ্বে ঘুরিতেছিল এবং পিপাসায় তাহার মারা যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। তখন বনী ইসরাঈলের এক দুশ্চরিত্রা নারী কুকুরটিকে দেখিতে পাইয়া তাহার (পায়ের) মোজা খুলিয়া ফেলিল এবং (উহা দ্বারা পানি তুলিয়া) কুকুরটিকে পান করাইল। আর এই আমলের উছিলায় তাহাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইল।

ফায়দা ঃ

ইহা বনী ইসরাঈলের এক লোকের ঘটনা। উক্ত কুয়ার দেওয়ালে ইটের মাথা এমনভাবে বাড়তি রাখা হইয়াছিল যাহার উপর পা রাখিয়া মানুষ নীচে নামিতে পারে এবং প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করিতে পারে।

১। অর্থাৎ প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর ক্ষেত্রেই। তাজা কলিজা দ্বারা জীবিত প্রাণী উদ্দেশ্য।

কুয়া হইতে উঠিবার সময় যেহেতু হাতেরও সাহায্য নিতে হইত সেহেতু পানি ভর্তি মোজা মুখে কামড়াইয়া ধরিতে হইয়াছিল।

জুতা মুখে কামড়াইয়া ধরা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু আল্লাহর বান্দা (সাধারণ দৃষ্টিতে) অতি নিকৃষ্ট একটি মাখলূকের জন্য তাহাই করিয়াছিল। এই জন্য আল্লাহর নিকট এই আমল এত প্রিয় হইয়াছিল।

এই ধরণের একটি ঘটনা এক জালিম ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে।

বুখারায় খুব অত্যাচারী এক শাসক ছিল। একদিন সে তাহার বাহনে আরোহণ করিয়া কোথাও যাইতেছিল। পথে সে খুজলিতে আক্রান্ত একটি কুকুর দেখিতে পাইল, যাহা শীতে খুব কষ্ট পাইতেছিল। কুকুরটি দেখিবামাত্র ঐ জালিমের চোখে পানি আসিয়া গেল। সে তাহার এক চাকরকে বলিল, এই কুকুরকে বাড়ীতে লইয়া যাও। আমার ফিরিয়া আসা পর্যন্ত ইহার যত্ন করিবে। এই বলিয়া সে যেখানে যাইতেছিল সেইখানে চলিয়া গেল। পরে বাড়ীতে ফিরিয়া কুকুরটিকে আনাইল এবং যত্ন করিয়া নিজের কাছে রাখিল।

এই ঘটনার দুই দিন পরেই জালিম লোকটির মৃত্যু হইল। তখন একজন বুজুর্গ তাহাকে স্বপ্নে দেখিলেন, যিনি তাহার জুলুম নির্যাতনের কথা জানিতেন। তিনি তাহাকে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, আল্লাহ পাক আমাকে তাঁহার সামনে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, তুই নিজে কুকুর ছিলি (অর্থাৎ তোর আচরণ কুকুরের মত ছিল। মানুষের মত ছিল না।) সুতরাং এক কুকুরের ওছিলায় তোকে ক্ষমা করা হইল।

আর আমার জিম্মায় মানুষের যে সমস্ত হক ছিল আল্লাহ পাক নিজেই উহা আদায় করিয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

আল্লাহ পাক বড় দয়াবান। সকল দয়াবানের তিনি মালিক ও বাদশাহ। তাহার দয়ার সীমা কে ছুঁইতে পারে? কাহারও ক্ষুদ্র কোন জিনিসও যদি তাঁহার পছন্দ হইয়া যায় তবে তাহার কাজ উদ্ধার হইয়া গেল। সুতরাং মানুষের উচিত তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় লাগিয়া থাকা। জানা তো নাই যে, কাহার কোন আমল কখন মহান মালিকের পছন্দ হইয়া যাইবে।

(তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন) হাদীছ শরীফে আছে–

ان افضل القرب الخير المتعدى *

অর্থাৎ সেই ইবাদতই শ্রেষ্ঠ যাহা অপরের জন্য কল্যাণবাহী।

দুই রাকাত নফল নামায পড়িলে নিজের আমলনামায় ছাওয়াব জমা হইল এবং নিজেরই শুধু লাভ হইল। অপরের কোন কল্যাণ হইল না। কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে ইলম শিক্ষা দিলে কিংবা একটি কূপ খনন করিয়া দিলে এই আমল দ্বারা বহু লোকের উপকার হইবে। প্রথমটি হইল আত্মমুখী ইবাদত আর দ্বিতীয়টি হইল কল্যাণমুখী ইবাদত। এই কল্যাণমুখী ইবাদতকেই হাদীছ শরীফে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। আলোচ্য লোকটির আমলও ছিল কল্যাণমুখী। এখানে চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় এই যে, বিশেষ অবস্থায় যে কুকুরকে হত্যা করিবার আদেশ শরীয়তে রহিয়াছে, সেই কুকুরকে পিপাসায় পানিদানের যদি এই ছাওয়াব হয় তবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট

করিবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের কোন সেবা করিলে উহার ছাওয়াব ও ফযীলত কি পরিমাণ হইতে পারে!

ক্ষুধার্তকে আহার দান করিলে, পিপাসার্ত মানুষের পানির ইন্তিজাম করিয়া দিলে, অসুস্থ মানুষের পাশে বসিয়া রাত্রি জাগরণ করিলে, অন্ধকে হাত ধরিয়া আগাইয়া দিলে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে সাহায্য করিলে, এই ধরনের বিভিন্ন আমল করিলে আল্লাহ্ কত খুশী হইবেন এবং কত বড় জাযা দিবেন!

এই হাদীছের শিক্ষা ঃ

১। সাধারণ আমলকেও তুচ্ছ মনে করিতে নাই। কেননা জানা নাই যে, কোন আমলের সহিত আল্লাহ্ পাক তোমার মহাসৌভাগ্য যুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

২। ইখলাছই হইল ছাওয়াব লাভের কারণ। লোকটি নির্জন মরুভূমিতে এই আমল করিয়াছিল যখন তাহাকে দেখিবার কেহ ছিল না। সুতরাং এই আমলের ক্ষেত্রে সে পূর্ণ মাত্রায় মুখলিছ ছিল।

৩। কোন নেক কাজের জন্য প্রয়োজনে কোন জিনিস নষ্ট করা যাইতে পারে। যেমন লোকটি পানিতে মোজা ভিজাইয়াছিল যাহাতে সাধারণতঃ মোজা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যেহেতু ইহাতে তাহার আখিরাতের কল্যাণ ছিল সেহেতু ইহাকে নষ্ট করা বলা যায় না।

৪। প্রয়োজনে বড়ও ছোটর খেদমত করিতে পারে এবং করা কর্তব্য। যেমন লোকটি মানুষ হিসাবে কুকুর হইতে উত্তম হইয়াও কুকুরের সেবা করিয়াছে।

পশু পাখীর সেবা-যত্ন করা যেমন ছাওয়াবের কাজ তেমনি পশু পাখীকে কষ্ট দেওয়াও শাস্তি লাভের কারণ। যেমন বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের এক ইবাদতগুযার স্ত্রীলোক শুধু একটি বিড়ালকে খাবার না দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার কারণে জাহান্নামী হইয়াছিল। সুতরাং আশরাফুল মাখলূকাত মানুষকে কষ্ট দিবার শাস্তি কত ভীষণ হইতে পারে তাহা বলাই বাহুল্য।

এক বর্ণনায় পুরুষের এবং অন্য বর্ণনায় দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের উল্লেখে কোন স্ববিরোধিতা নাই। কেননা হইতে পারে যে, দুইটি আলাদা ঘটনা ছিল।

১২৯। পথের কষ্টদায়ক জিনিস সরাইবার ছাওয়াব

اَلْحَادِيْ عَشَرَ: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِيْ الْجَنَّةِ فِيْ شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِيْ الْمُسْلِمِيْنَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلٰى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ: وَاللهِ لَأُنَحِّيَنَّ هٰذَا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ لَا يُؤْذِيْهِمْ، فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلٰى الطَّرِيْقِ، فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ».

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলিয়াছেন, এক লোককে আমি জান্নাতে আনন্দভোগ করিতে দেখিয়াছি। কেননা সে রাস্তা হইতে একটি গাছ কাটিয়া ফেলিয়াছিল যাহা (পথ চলাচলকারী) মুসলমানদিগকে কষ্ট দিতেছিল। (মুসলিম শরীফ)

মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি পথের উপর (ঝুলিয়া থাকা) একটি বৃক্ষ-শাখার পাশ দিয়া যাইতেছিল। তখন সে বলিল, আল্লাহর কসম! ইহাকে অবশ্যই আমি মুসলমানদের পথ হইতে সরাইয়া ফেলিব, যাহাতে তাহাদের কষ্ট না হয়। ফলে তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা হইল।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি এক পথে চলিতেছিল। তখন সে রাস্তার উপর একটি কাঁটাদার ডাল দেখিতে পাইল এবং উহাকে সরাইয়া দিল। আল্লাহ তাহার এই আমল কবুল করিলেন এবং তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন।

ফায়দা ঃ

এক বর্ণনায় দেখা যায় লোকটি বৃক্ষ বা বৃক্ষ-শাখা কাটিয়া ফেলিয়াছিল। অন্য বর্ণনায় দেখা যায় যে, লোকটি কাটিবার নিয়ত করিয়াছিল। কিন্তু কাটিয়াছিল কি না সেই কথার উল্লেখ তাহাতে নাই। যদি ইহা ভিন্ন ঘটনা হয় তবে তো কোন আপত্তি নাই। কেননা আমলের যেমন ছাওয়াব রহিয়াছে তেমনি শুধু নিয়তেরও ছাওয়াব রহিয়াছে। হয়ত লোকটির নিকট উহা কাটিবার কোন অস্ত্র ছিল না কিংবা অন্য কোন অসুবিধার কারণে সে কাটিতে পারে নাই; কিন্তু তাহার ইখলাছের কারণে শুধু নিয়তের ওছিলাতেই আল্লাহ পাক তাহাকে জান্নাত দান করিয়াছেন।

اللهم لا مانع لما اعطيت *

আল্লাহ যাহা দান করিবেন তাহাতে বাধা দিবার কে আছে? অবশ্য এমন সম্ভাবনাও আছে যে, হয়ত বৃক্ষ কর্তনও করা হইয়াছিল কিন্তু বর্ণনাকারী উহা উল্লেখ করেন নাই।

১৩০। পূর্ণ আদবের সহিত জুমার নামায আদায়ের ফযীলত

اَلثَّانِي عَشَرَ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অযু করিবে এবং (সুন্নত, মুস্তাহাব ও আদব রক্ষা করিয়া) উত্তমরূপে অযু করিবে। অতঃপর জুমার নামাযে উপস্থিত হইবে এবং নিরবতা অবলম্বন করিয়া মনোযোগের সহিত (খোতবা) শ্রবণ করিবে, তাহাকে তাহার ও (আগামী) জুমার মধ্যবর্তী সময়ের এবং অতিরিক্ত আরও তিন দিনের গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। তবে যে ব্যক্তি (খোতবা চলাকালীন সময়ে) কংকর লইয়া খেলা করিল (কিংবা এই জাতীয় কিছু করিল) সে অনর্থক কাজ করিল। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

এক জুমার খোতবা হইতে আগামী জুমার খোতবা পর্যন্ত সাতদিন হয়। ইহার সহিত তিন দিন যুক্ত হইলে মোট দশদিন হয়। সুতরাং অর্থ এই দাঁড়াইল যে, সে তাহার নেক আমলের দশগুণ ছাওয়াব পাইবে। কোরআন শরীফে ইরশাদ হইয়াছে–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَةُ امْثَالِهَا *

যে ব্যক্তি নেক আমল করিবে সে উহার দশগুণ ছাওয়াব লাভ করিবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি দেহ-মন একত্র করিয়া পূর্ণ আদবের সহিত খোতবা শ্রবণ করিবে না, (এবং অন্যান্য অনর্থক কথা ও কাজ হইতে বিরত থাকিবে না।) সে এই ফযীলত লাভ করিতে প্যারিবে না।

উল্লেখ্য, খোতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং খোতবা চলাকালে কথা বলা কিংবা কংকর বা কাপড়ের প্রান্তভাগ লইয়া অনর্থক খেলা করা মাকরূহ। এমন কি হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, তুমি যদি কাহাকেও 'চুপ কর' এই কথাটি মুখে বল তবে তুমিও অনর্থক কাজ করিলে। সুতরাং কাহাকেও কথা বলিতে শুনিলে মুখে কিছু না বলিয়া শুধু হাতের ইশারায় চুপ করাইতে হইবে।

১৩১। অযুর ফযীলত

الثَّالِثَ عَشَرَ: عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মুসলমান বান্দা কিংবা মুমিন বান্দা [1] যখন অযু করে এবং চেহারা ধোয় তখন চোখের দৃষ্টি দ্বারা কৃত সকল গোনাহ্ তাহার চেহারা হইতে বাহির হইয়া যায়। (মুখমণ্ডলে ব্যবহার করা) পানির সহিত কিংবা [2] পানির শেষ বিন্দুর সহিত।

যখন সে উভয় হাত ধোয় তখন হাত দ্বারা কৃত সকল গোনাহ্ পানির সহিত কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সহিত তাহার উভয় হাত হইতে বাহির হইয়া যায়। তদ্রূপ যখন সে উভয় পা ধোয় তখন পায়ে হাঁটিয়া কৃত সকল গোনাহ্ পানির সহিত কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সহিত বাহির হইয়া যায়। এমন কি সমস্ত গোনাহ্ হইতে সে পবিত্র হইয়া যায়।

(মুসলিম শরীফ)

১/২। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে কোন শব্দটি বলিয়াছেন সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে না পারায় বর্ণনাকারী এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ফায়দা ঃ

প্রশ্ন হইতে পারে যে, মুখমণ্ডল ধুইবার ক্ষেত্রে শুধু চক্ষুর গোনাহের কথা কেন বলা হইল অথচ মুখমণ্ডলে তো নাক ও মুখও রহিয়াছে এবং উহাদের দ্বারাও গোনাহ্ হয়। তবে কি মুখমণ্ডল ধুইবার দ্বারা শুধু চক্ষুর গোনাহ্ মাফ হয়, ঐ গুলির গোনাহ্ মাফ হয় না?

আলিমগণ এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর দিয়াছেন। প্রথমতঃ চক্ষু যেহেতু মুখমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ অংশ এবং হৃদয়ের বহিঃপ্রভাব গ্রহণের প্রধান মাধ্যম, সেহেতু বিশেষভাবে উহার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মুখ ও নাকের জন্য যেহেতু মুখমণ্ডল ধোয়া ছাড়াও আলাদা আমল রহিয়াছে। অর্থাৎ কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সেহেতু মুখের গোনাহ্ কুলি দ্বারা এবং নাকের গোনাহ নাকের পানি দ্বারাই বাহির হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে চক্ষুর জন্য মুখমণ্ডল ধোয়া ছাড়া অন্য কোন আমল নাই, সেহেতু এইখানে শুধু চক্ষুর গোনাহের কথা বলা হইয়াছে।

ছাগীরা কাবীরা সকল গোনাহ্ কি অযু দ্বারা মাফ হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, শরীয়তের বিধান হিসাবে কাবীরা গোনাহ্ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। তদ্রূপ বান্দার হক বান্দা মাফ না করিলে মাফ হয় না। সুতরাং অযু দ্বারা শুধু ছাগীরা গোনাহ্ মাফ হইবে এবং আল্লাহ্র হক মাফ হইবে। বান্দার হক মাফ হইবে না। সামনের হাদীছে এই সংক্রান্ত বিশদ ব্যাখ্যা আসিতেছে।

(গোনাহ বাহির হইয়া যায়) ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, বাহির হইবার অর্থ মাফ হওয়া। কেননা গোনাহ্ শরীরী কিছু নহে যে উহা বাহির হইবার কথা কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, বাহির হওয়া শব্দটিকে হাকীকত ও স্থূল অর্থে গ্রহণ করাই সংগত। কেননা যাহির ও বাতিন উভয় ক্ষেত্রেই গোনাহ্ কালো দাগ সৃষ্টি করে বলিয়া বিভিন্ন হাদীছে প্রমাণিত এবং আহলে কাশফ ও অন্তর্দর্শী বুযুর্গগণের সামনে উহা পরিস্ফুট। তাহাছাড়া হাদীছে ইহাও আছে যে, মুশরিকদের গোনাহের প্রভাবে হাজারে আসওয়াদ কালো হইয়াছে। গোনাহ যদি পাথরে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে তবে গোনাহ্গার ব্যক্তিদের দেহে দাগ সৃষ্টি করা তো আরো স্বাভাবিক। সুতরাং বাহির হইবার অর্থ এই হইবে যে তাহার চেহারা হইতে প্রতিটি গোনাহের কালো দাগ বাহির হইয়া যাইবে। অর্থাৎ যে কালো দাগ গোনাহের দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে। কিংবা এমনও হইতে পারে যে, গোনাহ্ শরীরী রূপ লইয়াই বান্দার দেহের সহিত যুক্ত হয় এবং একেক গোনাহ্ একেক প্রকার রূপ ও আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। অযুর সময় সেইগুলি স্ব-স্ব রূপ ও আকৃতিসহ বাহির হইয়া যায়।

১৩২। গোনাহ্ মোচনকারী আমল

اَلرَّابِعَ عَشَرَ: عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এক জুমা হইতে পরবর্তী জুমা এবং এক

রমযান হইতে পরবর্তী রমযান মধ্যবর্তী সময়ের গোনাহসমূহ মোচন করে যদি কাবীরা গোনাহসমূহ পরিহার করা হয়। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

হাফিয ওয়ালি উদ্দীন আল-ইরাকী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছের কারণেই আলিমগণ বলিয়াছেন যে, নেক আমল দ্বারা শুধু ছাগীরা গোনাহ মাফ হয়। যে সকল হাদীছে নিঃশর্তভাবে গোনাহ মাফের কথা রহিয়াছে সেই সকল হাদীছকে এই হাদীছের আলোকেই ছাগীরা গোনাহ-এর গণ্ডিতে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

তবে আল্লামা কুরতুবী (রহঃ)সহ কোন কোন আলিম বলেন যে, আমলের মাঝে ইখলাছ ও ইহসান–এর পরিমাণ হিসাবে কোন কোন আল্লাহর বান্দার ছাগীরা ও কাবীরা উভয় প্রকার গোনাহ-ই মাফ হইয়া যায়।

ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, পূর্ণাংগ অযুর মাধ্যমে যাহিরী তাহারাত হাছিলের সংগে সংগে যদি বাতিনী তাহারাতও হাছিল হয়; অর্থাৎ যাবতীয় বাতিনী নাজাসাত হইতে কলব পাক হয়, অতঃপর এমন নামায হাছিল হয় যাহাতে হৃদয় ও চিন্তা দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক হইতে মুক্ত হইয়া ইবাদতে নিমগ্ন হয় এবং তাহরীমা হইতে ছালাম পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত থাকে তবে অবশ্যই ইহা দ্বারা কাবীরা গোনাহও মাফ হইবে। আর পূর্ববর্তী আকাবিরগণের নামায এমনই ছিল।

তবে জামহুর (বা গরিষ্ঠসংখ্যক) ওলামায়ে কেরামের মতে নেক আমল কাবীরা গোনাহ মাফ করে না। ইহা শুধু তাওবা দ্বারা কিংবা আল্লাহর রহম ও ফযল দ্বারা মাফ হয়।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, প্রশ্ন হইতে পারে যে, অযু দ্বারা যদি গোনাহ মোচন হইয়া যায় তবে নামায দ্বারা কি মোচন হইবে? তদ্রুপ নামায দ্বারা যদি গোনাহ মোচন হইয়া যায় তবে জুমা দ্বারা দ্বারা কি মাফ হইবে? তদ্রুপ হাদীছে বর্ণিত অন্যান্য আমল দ্বারা কি মোচন হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আলিমগণ বলেন, হাদীছে বর্ণিত প্রতিটি আমলই গোনাহ মোচনের যোগ্যতা রাখে। সুতরাং যদি বান্দার আমলনামায় ছাগীরা থাকে তবে উহা মোচন করিবে। আর যদি ছাগীরা কাবীরা কোন গোনাহ না থাকে তবে উহার বিনিময়ে তাহার বহু মর্তবা বুলন্দ করা হইবে। আর যদি এক বা একাধিক কাবীরা গোনাহ থাকে। কিন্তু ছাগীরা না থাকে তবে আশা করা যায় যে, ঐ আমলের অছীলায় কাবীরা গোনাহ অপেক্ষাকৃত হালকা হইবে।

(যদি কাবীরা গোনাহ পরিহার করা হয়) ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ এই যে, কাবীরা গোনাহ ছাড়া অন্য সকল গোনাহ মাফ করা হইবে। কাবীরা গোনাহ (তাওবা ছাড়া) মাফ হইবে না। তবে ইহার অর্থ ইহা নহে যে, কবীরা গোনাহ পরিহার করা হইলে তখন উল্লেখিত নেক আমলগুলি ছাগীরা গোনাহ মোচন করিবে, কাবীরা গোনাহ পরিহার না করিলে এই সমস্ত নেক আমল দ্বারা ছাগীরা মোচন হইবে না। এমন নহে বরং সর্বাবস্থায় ছাগীরা গোনাহ মাফ হইতে থাকিবে। অবশ্য ইহাও সত্য যে, যে ব্যক্তি এই ধরনের অযু করিবে এবং নামায রোযার পূর্ণ ইহতিমাম করিবে সে কাবীরা গোনাহে লিপ্ত থাকিতে পারে না।

১৩৩। গোনাহ্ মোচনকারী ও দরজা বুলন্দকারী আমল

. اَلْخَامِسُ عَشَرَ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوْ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟»، قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদিগকে কি এমন আমল বাতলাইব না, যাহা দ্বারা আল্লাহ্ পাক গোনাহ্ লিপিবদ্ধকারী ফিরিশতাগণের কিতাব হইতে তোমাদের গোনাহ্ সমূহ মুছিয়া দিবেন এবং উহা দ্বারা (জান্নাতে তোমাদের) দরজা বুলন্দ করিবেন? সকলে আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন, বিভিন্ন কষ্টের মুখেও পূর্ণাংগ রূপে অযু করা এবং মসজিদ অভিমুখে অধিক পদক্ষেপ করা এবং নামাযের পর পরবর্তী নামাযের প্রতিক্ষা করা। ইহাই হইল 'রিবাত' বা (শত্রুর বিরুদ্ধে প্রহরা) (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

এই হাদীছ মসজিদের নিকটবর্তী বাড়ীর উপর মসজিদ হইতে দূরবর্তী বাড়ীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। কেননা নিকটবর্তী বাড়ীর তুলনায় দূরবর্তী বাড়ী হইতে মসজিদে আগমনকালে অধিক পরিমাণে পদক্ষেপ হয়। সামনে বর্ণিত হাদীছ دیارکم تکتب آثارکم (তোমরা দূরবর্তী বাড়ীতেই থাক। কেননা মসজিদ অভিমুখে তোমাদের পদক্ষেপ সমূহ লেখা হইবে) এই হাদীছও ইহা সমর্থন করে।

(নামাযের প্রতিক্ষা করা) এই প্রতিক্ষা একা একা হইতে পারে। আবার জামা'আতের সহিতও হইতে পারে। তদ্রূপ মসজিদে বসিয়াও হইতে পারে। আবার বাড়ীতে, বাজারে বা আপন কাজকর্মে থাকিয়াও হইতে পারে। অর্থাৎ আসল কথা হইল তাহার অন্তরে পরবর্তী নামাযের চিন্তা সর্বক্ষণ জাগরূক থাকিতে হইবে। তবে অন্যান্য হাদীছ হইতে জানা যায় যে, মসজিদে একেবারে আপন নামাযের স্থানে বসিয়া পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করিবার আলাদা ফযীলত রহিয়াছে। যেমন ফিরিশতাগণের পক্ষ হইতে তাহার জন্য ইস্তিগফার করা।

(ইহাই রিবাত) অর্থাৎ এই তিনটি আমলও রিবাত আখ্যা লাভের যোগ্য। আসল রিবাত হইল মুসলমানদের ইজ্জত-আবরু, জান-মাল ও ভূখণ্ড রক্ষা করিবার জন্য সীমান্তে পাহারা দেওয়া। (তদ্রূপ কাফেলার হিফাযতের জন্য পাহারা দেওয়া।) হাদীছ শরীফে ইহার অতি উচ্চ ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে।

এক হাদীছে আছে– যে চক্ষু বিনিদ্র থাকিয়া সীমান্তে পাহারা দিয়াছে জাহান্নামের আগুন উহাকে স্পর্শ করিবে না।

আলোচ্য হাদীছে এই তিনটি আমলকে উক্ত রিবাত হইতেও উচ্চ মর্যাদা দান করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই তিনটি আমলই হইল প্রকৃতপক্ষে রিবাত নামে আখ্যায়িত হইবার উপযুক্ত। কেননা এইগুলির মাধ্যমে মানুষের সবচাইতে বড় শত্রু নফসে আম্মারা ও শয়তানকে দমন করা

হয়। এই তিনটি আমল মানুষের অন্তরে শয়তানের হামলার সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দেয় এবং নফসকে প্রবৃত্তির পিছনে ছুটিয়া চলা হইতে নিবৃত্ত করে। সুতরাং ইহাই হইল বড় 'রিবাত' এবং স্থায়ী রিবাত। তাই অন্য হাদীছে বলা হইয়াছে– رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر (আমরা ছোট জিহাদ হইতে বড় জিহাদে প্রত্যাবর্তন করিলাম।) অর্থাৎ শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ হইতে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

১৩৪। ফজর ও আছরের ফযীলত

- اَلسَّادِسَ عَشَرَ: عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

«اَلْبَرْدَانِ»: اَلصُّبْحُ وَالْعَصْرُ.

হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দিবসের প্রান্তদ্বয়ের নামায পড়িবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

প্রান্তদ্বয় অর্থ ফজর ও আছর। এই দুই ওয়াক্তের নামাযকে বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, ফজর হইল মিষ্টি ঘুমের সময় এবং আছর হইল দিনের শেষ কর্মব্যস্ততার সময়। তাই এই দুই সময় ইহতিমামের সহিত নামায পড়া প্রমাণ করে যে, তাহার অন্তরে ইবাদতের প্রতি মুহব্বত, আল্লাহর হুকুমের প্রতি আযমত এবং নামাযের প্রতি আগ্রহে ভরপুর। সুতরাং এমন ব্যক্তি যে অন্যান্য ওয়াক্তের নামায আরও বেশী ইহতিমামের সহিত পড়িবে ইহা তো বলাই বাহুল্য।

কোন কোন মতে প্রান্তদ্বয়ের নামায দ্বারা ফজর ও এশা উদ্দেশ্য। সেই হিসাবে এশাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, তখন ঘুমের চাপ থাকে এবং কর্মক্লান্তির কারণে শরীর-মন বিশ্রামের প্রতি উন্মুখ থাকে। ফলে তখন নামায পড়া, বিশেষতঃ মসজিদে গিয়া জামা'আতের সহিত নামায পড়া বেশ কষ্টকর মনে হয়।

মোট কথা এই দুই ওয়াক্ত এবং স্বভাবতঃই অন্যান্য ওয়াক্তের নামায যে ব্যক্তি ইহতিমামের সহিত আদায় করিবে সে আযাব ভোগ করা ছাড়াই জান্নাত লাভের উপযুক্ত। কেননা এই ধরণের নামায নামাযীকে অশ্লীলতা ও পাপকার্য হইতে বিরত রাখে। আল কোরআনে ইরশাদ হইয়াছে– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ *

নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও অন্যায় কর্ম হইতে বিরত রাখে।

১৩৫। অসুস্থ অবস্থায় আমলের ছাওয়াব জারি থাকে

- اَلسَّابِعَ عَشَرَ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বান্দা যখন অসুস্থ হয় কিংবা সফর করে তখন সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় সে যে আমল করিত উহার অনুরূপ আমল তাহার জন্য লেখা হয়। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

কেননা সুস্থ অবস্থা বজায় থাকিলে কিংবা সফরে না গেলে পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী ঐ সমস্ত আমল সে অবশ্যই করিত। তাই বান্দা অসুস্থ অবস্থায় বা সফরের অবস্থায় ঐ সমস্ত আমল করিতে না পারিলেও আল্লাহ পাক মেহেরবানী করিয়া ধরিয়া লইবেন যে, সে ঐ সমস্ত আমল করিয়াছে। আর যদি কোন বান্দা ঐ ওযরের অবস্থায়ও পূর্বের আমলগুলি অব্যাহত রাখে তবে আল্লাহ উহার ছাওয়াব কতগুণ বাড়াইয়া দিবেন তাহা আল্লাহ-ই জানেন।

মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা নফল আমলের কথা। ফরয আমল তো অসুস্থতা বা সফরের কারণে মাফ হয় না। অবশ্য বিশেষ বিশেষ অসুস্থতায় বিশেষ বিশেষ ফরয মাফ হইয়া যায়। উহাও নফলের মত লেখা হইতে থাকিবে ইনশাআল্লাহ।

১৩৬। প্রতিটি নেক আমল ছাদাকা

اَلثَّامِنَ عَشَرَ: «عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

হযরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রতিটি নেক আমলই ছাদাকা। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত হোযাইফা (রাঃ) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ফায়দা ঃ

অর্থাৎ যে কোন নেক আমল করা হউক উহার নিজস্ব ছাওয়াব তো আছেই। সেই সংগে একটি নফল ছাদাকা পরিমাণ ছাওয়াবও আল্লাহ পাক অনুগ্রহপূর্বক দান করিবেন। নফল ছাদাকার পরিমাণ তো বিভিন্ন হইতে পারে। সুতরাং আমলের ক্ষেত্রে বান্দার নিয়ত ও ইখলাছের অবস্থা হিসাবে একেক আমলের ছাওয়াব একেক ছাদাকার সমতুল্য হইবে, ইহাই স্বাভাবিক।

১৩৭। বৃক্ষ রোপণের ফযীলত

اَلتَّاسِعَ عَشَرَ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: «فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ» وَرَوَيَاهُ جَمِيعًا مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

قَوْلُهُ: «يَرْزَؤُهُ» أَيْ: يَنْقُصُهُ.

হযরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মুসলমান যদি একটি বৃক্ষ রোপণ করে তবে উহার যে ফল খাওয়া হইবে উহা তাহার জন্য ছাদাকা হইবে এবং উহার যে ফল চুরি হইবে উহা তাহার জন্য ছাদাকা হইবে। এমন কি কেহ যদি উক্ত বৃক্ষের ক্ষতিসাধন করে তবে উহাও তাহার জন্য ছাদাকা হইবে। (মুসলিম শরীফ)

মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে, মুসলমান যদি কোন বৃক্ষ রোপণ করে আর কোন মানুষ বা পশু বা পাখী উহার ফল খায় তবে কিয়ামত পর্যন্ত উহা তাহার জন্য ছাদাকা হইবে।

মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে, কোন মুসলমান যদি কোন বৃক্ষ রোপণ করে কিংবা ফসল বপন করে আর কোন মানুষ বা পশু বা অন্য কিছু উহা হইতে ভক্ষণ করে তবে উহা তাহার জন্য ছাদাকা হইবে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) এই সকল রিওয়ায়াত হযরত আনাস (রাঃ) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন।

ফায়দা ঃ

অর্থাৎ যাহা খাওয়া হইল বা চুরি হইল বা নষ্ট করা হইল (বা নিজে নিজেই নষ্ট হইল) আর সে হায়-হুতাশ না করিয়া ছবর করিল তবে সে ঐ পরিমাণ জিনিস ছাদাকা করিবার ছাওয়াব পাইবে।

(কিয়ামত পর্যন্ত উহা তাহার জন্য ছাদাকা হইবে।) ইহার ছাওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবার ছুরত কি হইবে তাহা আল্লাহ পাকই জানেন।

এমন হইতে পারে যে, ঐ ফলটিতে যত দানা ছিল উহা দ্বারা যত গাছ হইত এবং উহাতে যত ফল ধরিত এবং ফল গুলির দানা হইতে যত ফল ধরিত এইভাবে কেয়ামত পর্যন্ত যত ফল হইত উহার ছাওয়াব তাহার আমলনামায় লেখা হইতে থাকিবে। আসল কথা হইল দানের কারণে আল্লাহর খাজানায় কোন কমি আসে না। সুতরাং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা দান করিতে পারেন।

ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'লার অশেষ করুণার একটি নিদর্শন এই যে, ছয়টি ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক বান্দাকে জীবদ্দশায়ও ছাওয়াব দান করেন। আবার মৃত্যুর পরও তাহার জন্য উহা জারি রাখেন।

১। ছাদকায়ে জারিয়া (অর্থাৎ মানুষের উপকারের জন্য যাহা স্থায়ীভাবে দান করা হয়। যেমন, কূপ খনন করিয়া দেওয়া, মসজিদ মাদরাসা করিয়া দেওয়া, ইত্যাদি।)

২। তাহার যে ইলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হইতে থাকে। যেমন কাহাকেও শিক্ষাদান করিল কিংবা কিতাব লিখিয়া মানুষের ফায়দা পৌঁছাইল।

৩। নেক সন্তান, যে তাহার জন্য দু'আ করে। (দু'আ করা শর্ত নহে বরং সে যত আমল করিতে থাকিবে উহার ছাওয়াব তাহার আমল নামায় জমা হইতে থাকিবে। সন্তান দু'আ না করিলেও আল্লাহ পাক ছাওয়াব বন্ধ করিবেন না। কেননা সন্তান শোকর না করিলেও আল্লাহ পাক বান্দার শোকর করিয়া থাকেন। তবে সন্তান যদি পিতা মাতার জন্য দু'আ করে তবে ইহা তাহার নিজেরই জন্য লাভের হইবে।)

৪। বৃক্ষ, যাহা রোপণ করিয়াছে।

৫। ফসল, যাহা সে বপন করিয়াছে।

৬। রিবাত। (আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলমানদের সীমান্ত পাহারা দেওয়া। পাহারাদানকারী কিয়ামত পর্যন্ত ইহার ছাওয়াব পাইতে থাকিবে।)

ওলামায়ে কেরামের মতে এই ছাওয়াব লাভ করিবার জন্য নিজে সরাসরি রোপণ বা বপন করা জরুরী নহে বরং লোক নিযুক্ত করিয়া করাইলেও ছাওয়াব পাওয়া যাইবে।

অদ্রূপ ফসলের যে অংশ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না উহাও ছাদাকার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। যেমন, ফসলের যে গোড়া ক্ষেতে থাকিয়া যায় কিংবা যে শস্যদানা ক্ষেতে পড়িয়া থাকে আর সেই গুলি কোন প্রাণী ভক্ষণ করে।

আলোচ্য হাদীছ প্রমাণ করে যে, আখিরাতের ছাওয়াব লাভের জন্য ঈমান শর্ত। সুতরাং কোন অমুসলমান এই সমস্ত কাজ করিলে দুনিয়াতেই সে ইহার বদলা পাইয়া যাইবে। আখিরাতে তাহার কোন হিসসা থাকিবে না। এই কারণেই হাদীছে 'মুসলিম' শব্দটির উল্লেখ করা হইয়াছে।

হাদীছের শিক্ষা ঃ মানুষ ও পশুপাখীর উপকারের নিয়তে বৃক্ষ ও ফসল রোপণ করা কর্তব্য। অন্য কেহ যদি উহাতে হস্তক্ষেপ করে তবে ছাওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করা উচিত। অদ্রূপ দুর্যোগে ফসলহানি হইলেও ধৈর্যধারণ করা কর্তব্য। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত ইহার ছাওয়াব জারি থাকিবে।

সর্বোপরি নিয়ত খালিছ রাখিয়া সকল আমল আল্লাহকে খুশী করিবার জন্য করিতে হইবে।

১৩৮। দূর হইতে মসজিদে আগমনের ফযীলত

اَلْعِشْرُوْنَ: عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ؟»، فَقَالُوْا: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ أَرَدْنَا ذٰلِكَ، فَقَالَ: «بَنِيْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ؛ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ؛ تُكْتَبْ آثَارَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِنَّ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا بِمَعْنَاهُ مِنْ

رِوَايَةِ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

وَ «بَنُو سَلِمَةَ» بِكَسْرِ اللَّامِ : قَبِيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ، وَ «آثَارُهُمْ» خُطَاهُمْ .

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, (আনসারী গোত্র) বনু সালিমা একবার মসজিদের নিকটে তাহাদের বসতি স্থাপনের ইচ্ছা করিল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, আমি জানিতে পরিলাম যে, তোমরা মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে স্থানান্তরিত হইতে চাহিতেছ। তাহারা আরয করিলেন, জ্বি-হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, হে বনী সালিমার লোক সকল! আপন বস্তিতেই থাক; তোমাদের পদক্ষেপ সমূহ লেখা হইবে। আপন বস্তিতেই থাক; তোমাদের পদক্ষেপ সমূহ লেখা হইবে।

এক বর্ণনায় আছে, প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে একটি মর্তবা লাভ হইবে।

ইমাম বুখারী (রহঃ)ও একই মর্মে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ফায়দা ঃ

তাঁহাদের বস্তি মসজিদে নববী হইতে বেশ দূরে ছিল। ফলে সব সময় মসজিদে জামা'আতে হাযির হওয়া তাহাদের জন্য কষ্টকর হইত। এদিকে মসজিদের নিকটেই খালি জায়গা ছিল। তাই তাঁহারা ঐ খালি জায়গা খরিদ করিয়া পুরা বস্তি মসজিদের নিকটে আবাদ হইতে চাহিয়াছিলেন, যাহাতে মসজিদে আসা যাওয়া তাঁহাদের জন্য সহজ হয়।

সুবহানাল্লাহ! এমনই সুগভীর ছিল মসজিদের সহিত ছাহাবা কেরামের সম্পর্ক। অথচ বর্তমান যুগে আমাদের অবস্থা তো এই যে, মসজিদের পড়শী হইয়াও জামা'আতে শরীক হইবার ব্যাপারে অলসতা করি। এখন বলুন, দুনিয়াতে মুসলমানদের দুর্গতি হইবে না কেন? আর আখিরাতের দুর্গতির কথা কি বলিব! আল্লাহ আমাদের সকলকে হিফাযত করুন। আমীন।

(পদক্ষেপ লেখা হইবে) অর্থাৎ তোমরা তোমাদের বর্তমান দূরবর্তী বস্তিতেই থাক। মসজিদের নিকটে স্থানান্তরিত হইবার চিন্তা করিও না। কেননা যতদূর হইতে মসজিদে আসিবে, মসজিদ অভিমুখে তোমাদের পদক্ষেপ তত বেশী হইবে। আর ঐ পদক্ষেপসমূহ তোমাদের আমলনামায় লেখা হইবে এবং প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি মর্তবা দান করা হইবে। সুতরাং দুরে থাকিলে মসজিদে আসিবার কষ্ট যেমন বেশী ছাওয়াবও তেমনি বেশী। পক্ষান্তরে নিকটবর্তী স্থান হইতে মসজিদে আসিবার কষ্ট যেমন কম ছাওয়াবও তেমনি কম।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, এক হাদীছে তো আছে, من شؤم الدار بعدها من المسجد (মসজিদ হইতে দূরে হওয়া বাসস্থানের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয়।) ইহার জওয়াব এই যে, যে ব্যক্তি দূরে হইবার কারণে জামা'আত তরক করিবে তাহার জন্য ইহা অবশ্যই দুর্ভাগ্যের কারণ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়াও নিয়মিত জামা'আতে হাযির হয় তাহার জন্য ইহা অধিক ছাওয়াবের কারণ। মোটকথা, দুই হাদীছ দুই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। সুতরাং আপত্তির কিছু নাই।

হাদীছের শিক্ষা ঃ রোদ বৃষ্টি, অন্ধকার, পথের দূরত্ব, চিন্তা-পেরেশানি, কর্মব্যস্ততা, ইত্যাদি যত অসুবিধাই থাকুক মসজিদে গিয়া জামা'আতের সহিত নামায আদায় করিবার প্রতি সচেষ্ট ও যত্নবান হইতে হইবে।

১৩৯। মসজিদে যাওয়া আসা উভয় ক্ষেত্রেই ছাওয়াব

اَلْحَادِيْ وَالْعِشْرُوْنَ: عَنْ اَبِيْ الْمُنْذِرِ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لَا اَعْلَمُ رَجُلًا اَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ فَقِيْلَ لَهُ، اَوْ فَقُلْتُ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِيْ الظَّلْمَاءِ، وَفِيْ الرَّمْضَاءِ؟ فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِيْ اَنَّ مَنْزِلِيْ إِلٰى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، إِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ يُكْتَبَ لِيْ مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوْعِيْ إِذَا رَجَعْتُ إِلٰى اَهْلِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذٰلِكَ كُلَّهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ» . «الرَّمْضَاءُ»: اَلْاَرْضُ الَّتِيْ اَصَابَهَا الْحَرُّ الشَّدِيْدُ.

হযরত আবুল মুনযির উবাই ইবনে কা'আব (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তির বাড়ী মসজিদ হইতে বেশ দূরে ছিল। এতটা দূরে আর কাহারও বাড়ী ছিল বলিয়া আমার জানা নাই। কিন্তু কোন নামাযের জামা'আত তাহার ফওত হইত না। তখন তাহাকে বলা হইল। কিংবা আমি তাহাকে বলিলাম,[১] তুমি যদি একটি গাধা খরিদ করিয়া লইতে যাহাতে (রাত্রের) অন্ধকারে এবং (দিনের) তপ্ত বালুতে উহার উপর আরোহন করিবে। (তবে ভালই হইত) কেননা তোমার মসজিদে আসিবার কষ্ট কম হইত।

লোকটি বলিলেন, ইহা আমার পছন্দ নহে যে, আমার ঘর মসজিদ সংলগ্ন হইবে। বরং আমি চাই যে, মসজিদে আমার আসা এবং ঘরে ফিরিয়া যাওয়া (আমার আমলনামায়) যেন লেখা হয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহা শুনিয়া) বলিলেন, (নিয়তের বিশুদ্ধতা ও ইখলাছের কারণে) আল্লাহ পাক তোমার জন্য ঐ সমস্ত আমল জমা করিয়াছেন। (মুসলিম শরীফ)

অন্য বর্ণনায় আছে, তুমি (আল্লাহর ওয়াস্তে) যে আমল করিয়াছ। (আল্লাহর নিকট) তুমি উহার আজর ও ছাওয়াব পাইবে।

ফায়দা ঃ

এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মসজিদে গমনকালের পদক্ষেপসমূহে যেমন ছাওয়াব হয় তেমনি নিয়ত করিলে নামাযের পর মসজিদ হইতে ফিরিয়া আসিবার পদক্ষেপসমূহেও ছাওয়াব পাওয়া যাইবে। ইনশাআল্লাহ।

১। পরবর্তী বর্ণনাকারীর সন্দেহ যে, হযরত উবাই (রাঃ) এই দুইটির কোন্‌টি বলিয়াছিলেন। কিংবা অনেক আগের ঘটনা হইবার কারণে হযরত উবাই নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, লোকটিকে অন্য কেহ এই কথা বলিয়াছিল নাকি তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন। (দেখুন, হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁহারা কেমন সতর্কতা অবলম্বন করিতেন!)

হাদীছের শিক্ষা ঃ সর্বদা এই চেষ্টায় থাকা চাই যে, কিভাবে আমলের ছাওয়াব অধিক হইতে অধিক লাভ করা যায়। মেহনত বা কষ্টের কারণে কোন আমল হইতে পিছপা হওয়া উচিত নহে।

১৪০। আশা ও একীনের বরকত

اَلثَّانِي وَالْعِشْرُوْنَ: عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً أَعْلَاهَا مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

«اَلْمَنِيْحَةُ»: أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهَا لِيَأْكُلَ لَبَنَهَا ثُمَّ يَرُدَّهَا إِلَيْهِ.

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, চল্লিশটি নেক আমল আছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ হইল (দুধ পানের জন্য সাময়িকভাবে) দানকৃত বকরী। কোন আমলকারী যদি ঐ চল্লিশটি আমলের একটি আমলও করে এবং উহার ছাওয়াব লাভের আশা রাখে এবং ঐ আমলের সহিত আল্লাহর যে ওয়াদা রহিয়াছে উহার বিশ্বাস রাখে তবে উহার কারণে আল্লাহ তাহাকে অবশ্যই জান্নাতে দাখিল করিবেন। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

হাদীছে منيحة শব্দটি আসিয়াছে। ইহার অর্থ, এই নিয়তে কাহাকেও বকরী (বা গরু, মহিষ ইত্যাদি) দান করা যে, সে উহার দুধ খাইতে থাকিবে এবং নির্ধারিত মেয়াদ শেষে উহা ফেরত দিবে। অর্থাৎ বকরীর মালিকানা দাতারই থাকিবে। গ্রহিতা শুধু উহার দুধের মালিক হইবে।

বর্ণনার অবশিষ্টাংশ বুখারী শরীফে এইভাবে আছে, "হাসসান (ইবনে অতিয়্যা) (রহঃ) বলেন, দানকৃত বকরীর চাইতে নিম্নস্তরের আমলগুলি আমরা গণনা করিয়া দেখিলাম, যেমন সালামের উত্তর দেওয়া, হাঁচিদাতার الحمد لله এর জওয়াবে يرحمك الله বলা, পথ হইতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা ইত্যাদি। কিন্তু পনের পর্যন্ত উপনীত হওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব হইল না।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, আল্লামা ইবনে বাত্তাল (রহঃ)—এর মন্তব্য এই যে, হাসসানের কথার অর্থ ইহা নহে যে, কথিত চল্লিশটি আমল তালাশ করিয়া পাওয়া যাইবে না। কেননা বিভিন্ন ছহী হাদীছে বহু আমলের কথা বর্ণিত আছে। যেমন, মুসলমানের দোষ গোপন করা, কোন মুসলমানকে আনন্দ দান করা, মসজিদে নিজে সরিয়া অন্যকে জায়গা করিয়া দেওয়া, সৎ উপদেশ দেওয়া, উত্তম কথা বলা, বৃক্ষ রোপণ করা, কাহারও জন্য সুপারিশ করা, মুছাফাহা করা, অসুস্থকে দেখিতে যাওয়া, নিজের বালতি হইতে পানি ঢালিয়া দেওয়া ইত্যাদি।

আল্লামা ইবনে মুনীর (রহঃ) বলেন, তবে এইভাবে গণনা করিতে চেষ্টা না করাই উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত চল্লিশটি আমলের কথা অবশ্যই জানিতেন। কিন্তু আমাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়াই তিনি ঐ গুলি উল্লেখ করেন নাই। কেননা হয়ত মানুষ তখন নিজেদের স্থূলবুদ্ধি ও ক্ষুদ্র চিন্তার কারণে অন্যান্য আমলের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িত। সুতরাং আন্দাযের উপর ভর করিয়া উহা গণনা না করাই সংগত।

বরং এই হাদীছের শিক্ষা হিসাবে ছাওয়াবের আশা এবং আল্লাহর ওয়াদার উপর একীন রাখিয়া বড় বড় আমলের সংগে ছোট ছোট আমলগুলিকেও কদরের সহিত করিয়া যাওয়াই কর্তব্য।

১৪১। সামান্য পরিমাণ দানেরও ফযীলত

اَلثَّالِثُ وَالْعِشْرُوْنَ: عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ اَشْاَمَ مِنْهُ فَلَا يَرٰى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرٰى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

হযরত আদী বিন হাতিম (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলিতে শুনিয়াছি, তোমরা (জাহান্নামের) আগুন হইতে বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা কর; এমনকি এক টুকরা খেজুর দান করিয়া হইলেও। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

হযরত আদী বিন হাতিম (রাঃ) হইতে বুখারী ও মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সহিত তাহার প্রতিপালক সরাসরি কথা বলিবেন। বান্দা ও তাঁহার মাঝে কোন তারজুমান থাকিবে না।

তখন সে তাহার ডান দিকে তাকাইবে এবং ঐ সমস্ত (নেক আমলই) শুধু দেখিতে পাইবে যাহা সে অগ্রবর্তী করিয়াছে। আর সে তাহার বাম দিকে তাকাইবে এবং ঐ সমস্ত (বদ আমলই) শুধু দেখিতে পাইবে যাহা সে অগ্রবর্তী করিয়াছে। আর সে তাহার সম্মুখে তাকাইবে। কিন্তু সম্মুখে আগুন ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইবে না। সুতরাং তোমরা আগুন হইতে নিজেদিগকে রক্ষা কর; এমন কি এক টুকরা খেজুর দ্বারাও যদি হয়। আর যে ইহাও না পায় সে যেন উত্তম কথা দ্বারা (আগুন হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে।)

ফায়দা ঃ

অর্থাৎ বিভিন্ন নেক আমল বেশী বেশী করিতে থাক যাহা তোমাদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা করিবে এবং আল্লাহর পথে বেশী বেশী দান কর। আর বেশী না পারিলে সামান্য এক টুকরা খেজুর হইলেও দান কর। কেননা আল্লাহ পরিমাণ দেখিবেন না। তোমার কলবের অবস্থা এবং নিয়তের বিশুদ্ধতাই তিনি দেখিবেন এবং অশেষ করুণাবশতঃ ঐ তুচ্ছ দানের বরকতেই জাহান্নাম হইতে নাজাত দিবেন। (ইনশাআল্লাহ)

(তারজুমান) শব্দটির আভিধানিক অর্থ দোভাষী। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হইল দূত বা মাধ্যম। কেননা আল্লাহর নিকট তো কোন কিছুই গোপন নহে এবং কোন ভাষাই তাঁহার অজ্ঞাত নহে। সুতরাং দোভাষীর প্রশ্নই আসে না। তবে দুনিয়াতে বান্দার সহিত আল্লাহর যোগাযোগ হইত রাসূলের মাধ্যমে সুতরাং ধারণা হইতে পারে যে, আখিরাতেও হয়ত কোন মাধ্যমের সাহায্যে যোগাযোগ হইবে। এই ধারণা দূর করিবার জন্যই বলা হইয়াছে যে, আখিরাতে বান্দার সহিত আল্লাহর যোগাযোগ হইবে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যমে। আর উহার ধরন কি হইবে তাহা শুধু আল্লাহ-ই জানেন। আমরা শুধু আল্লাহর রাসূল যাহা খবর দিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করি।

(উত্তম কথা) অর্থাৎ এমন কথা যাহা দ্বারা কোন মুসলমানের অন্তরে সান্ত্বনা বা শান্তি লাভ হয়। কষ্ট দূর হয় কিংবা দুনিয়া বা আখিরাতের কোন কল্যাণ হয়।

হাদীছের শিক্ষা ঃ জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচিবার জন্য সাধ্য মুতাবিক খুশী মনে সর্বদা আল্লাহর রাস্তায় দান করিতে থাকা চাই। পরিমাণ অল্প হইলেও লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই।

১৪২। শোকরে আল্লাহ খুশী হন

اَلرَّابِعُ وَالْعِشْرُوْنَ: عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَاكُلَ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، اَوْيَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَ«الْاَكْلَةُ» بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ: وَهِيَ الْغَدْوَةُ أَوِ الْعَشْوَةُ.

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ বান্দার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হন যদি সে খাবার খাইয়া উহার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে কিংবা পানীয় পান করিয়া উহার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে।

(মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলিলেই মূল সুন্নত আদায় হইয়া যাইবে। তবে পানাহারের পর 'হামদ'–এর সর্বোত্তম তরীকা কি উহা পানাহারের আদাব অধ্যায়ে আসিতেছে।

আলেমগণ বলিয়াছেন, খানা হইতে ফারেগ হইবার পর যদি অন্যান্যরা তখনও ফারেগ না হইয়া থাকে তবে হামদ জোরে না বলা সুন্নত। কেননা তখন তাহারা খাইতে সংকোচ বোধ করিবে। অথচ হইতে পারে যে, তাহাদের তখনও খানার প্রয়োজন রহিয়াছে।

হাদীছের শিক্ষা ঃ 'আলহামদু লিল্লাহ' 'আল্লাহর শোকর' 'আল্লাহর রহমতে' আল্লাহর মেহেরবানী ইত্যাদি কথাগুলি নিজেরাও বেশী বেশী আদায় করা উচিত এবং ছোট ও অধীনস্থদিগকেও তালীম দেওয়া উচিত। ইহাতে দিলের মধ্যে শোকরের জযবা পয়দা হইবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি হাছিল হইবে।

১৪৩। মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকাও ছাদাকা

اَلْخَامِسُ وَالْعِشْرُوْنَ : عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ أَوِ الْخَيْرِ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, (আল্লাহ পাকের অসংখ্য নেয়ামতের শোকর হিসাবে) প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হইল (আল্লাহর ওয়াস্তে) ছাদাকা করা। হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি সে (ছাদাকা করিবার মত মাল) না পায় তবে কি করিবে বলুন? তিনি বলিলেন, তবে নিজের হাতে কাজ করিবে এবং (উহার পারিশ্রমিক, মূল্য বা ফসল দ্বারা) নিজের প্রয়োজন পুরা করিবে এবং ছাদাকা করিবে। হযরত আবু মুসা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি সে (উহা) না পারে তবে কি করিবে বলুন? তিনি বলিলেন, (তবে) প্রয়োজনগ্রস্ত ও অক্ষম মানুষকে সাহায্য করিবে। হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি সে (উহা) না পারে তবে কি করিবে বলুন? তিনি বলিলেন, (তবে) সৎ কাজের আদেশ করিবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি (উহা) না করে তবে কি করিবে বলুন? তিনি বলিলেন, (তবে) নিজেকে মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখিবে। কেননা ইহাও ছাদাকা। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(নিজের হাতে কাজ করিবে।) যেমন, ব্যবসা করা, মজুরি খাটা, কৃষিকাজ করা ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রয়োজনীয় জীবিকা উপার্জন করা, যাহাতে অন্যের নিকট হাত পাতিবার কলংক হইতে নিজেকে রক্ষা করা যায় এবং ছাদাকা করিবার মাধ্যমে আখিরাতের মর্যাদা অর্জন করা যায়, ইহা অতি উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত।

(প্রয়োজনগ্রস্ত) এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাহার মাল নাই, আবার উপার্জনও করিতে পারে না সে কিভাবে প্রয়োজনগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করিবে? ইহার উত্তর এই যে, এমন সাহায্যের কথা বলা হইয়াছে যাহাতে অর্থ ব্যয় করিবার প্রয়োজন হয় না। যেমন, বোঝা উঠাইয়া দেওয়া, বাহনে আরোহণ করিতে সাহায্য করা, কিংবা কাহারও নিকট সুপারিশ করিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া দেওয়া। বস্তুতঃ এই সকল আমলেরও বিরাট ফযীলত রহিয়াছে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

و الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون اخيه *

বান্দা যতক্ষণ তাহার ভাইয়ের সাহায্য করে আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সাহায্য করেন।

(মন্দ কাজ হইতে) ইহা দ্বারা শরীয়তের সমস্ত আদেশ পালন এবং নিষেধ বর্জনের কথা আসিয়া গিয়াছে। ইহাকে ছাদাকা বলিবার কারণ এই যে, এইভাবে নিজেকে সে বরবাদি হইতে

রক্ষা করিল। সুতরাং নিজের উপর ছাদকা হইল। আবার অন্যরাও তাহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইল। সুতরাং অন্যদের উপরও ছাদাকা হইল। অর্থাৎ অর্থ ব্যয় করিয়া মানুষ যেমন নিজের বা অন্যের উপকার করে এইভাবে সে নিজের ও অন্যের উপকার করিল।

হাদীছের শিক্ষা ঃ মুমিনের কর্তব্য হইল সর্বপ্রকারে আল্লাহর বান্দাগণের উপকার করা এবং অন্ততপক্ষে তাহাদিগকে কোনভাবে কষ্ট দেওয়া হইতে বিরত থাকা।

অধ্যায় – ১৪

ইবাদতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন

ইসলাম স্বভাব-ধর্ম। তাই মানব-স্বভাবের কোন দাবীকেই সে অস্বীকার করে নাই বরং বৈধ পন্থায় উহা পূরণের নির্দেশ দিয়াছে। এমন কি আল্লাহর আদেশরূপে উহা পুরা করাকে ইবাদত বলিয়াও ঘোষণা করিয়াছে। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে নামায যেমন ইবাদত তেমনি হালাল উপার্জনও ইবাদত। রাত্রি জাগরণ করিয়া ইবাদত করিলে যেমন ছাওয়াব তেমনি নফসের হক আদায় করিবার নিয়তে ঘুমাইলেও ছাওয়াব। তদ্রূপ রোজা রাখা যেমন আল্লাহর হুকুম তেমনি বিবাহ-শাদী ও স্ত্রীসহবাসও আল্লাহর হুকুম। তবে সর্বক্ষেত্রে শরীয়ত মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছে। ইবাদত ও মুজাহাদার ক্ষেত্রেও একই কথা। নফসের চাহিদা যদি অতিরিক্ত পূরণ করা হয় এবং সংযম শিক্ষা না দেওয়া হয় তবে নফস অবাধ্য হইয়া যাইবার সম্ভাবনা প্রবল। তাই শরীয়ত বিভিন্ন ফরয ইবাদতের পাশাপাশি নফল ইবাদতের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করিয়াছে। রাত্রি জাগরণ ও তাহাজ্জুদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু অন্যদিকে ইবাদতে এত বেশী বাড়াবাড়ি করিতেও নিষেধ করিয়াছে যাহাতে নফস অক্ষম হইয়া পড়ে।

কেননা সফরের ক্ষেত্রে সওয়ারির যে অবস্থা, আধ্যাত্মিক সফরের ক্ষেত্রে নফসেরও সেই অবস্থা। অতিরিক্ত বোঝার কারণে মাঝপথেই উহা নির্জীব হইয়া পড়িতে পারে। তখন মঞ্জিলে মাকসূদে আর পৌঁছা যাইবে না। পথেই হালাক ও বরবাদ হইতে হইবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের নফস হইল তোমাদের সওয়ারি। সুতরাং তোমরা সওয়ারির যত্ন লইও। তবেই সে তোমাদিগকে আপন প্রতিপালক পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারিবে।

মোটকথা, নফসের হক পুরা করা ইবাদত ও ছাওয়াবের কাজ। তাই হযরত মু'আয (রাঃ) বলিয়াছেন,

انى احتسب نومتى كما احتسب قومتى *

আমি আমার ঘুমকেও ইবাদত মনে করি যেমন আমার নামাযকে ইবাদত মনে করি।

আর নফসের হক নষ্ট করা এবং তাহাকে অযথা কষ্ট দেওয়া জুলুম। এই দিকে ইংগিত

করিয়াই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে বলিয়াছিলেন–

انك اذا فعلت ذلك تفهت له النفس و هجمت له العين *

তুমি যদি উহা কর তবে তোমার নফস অক্ষম হইয়া পড়িবে এবং চক্ষু কোটরাগত হইয়া যাইবে।

অন্য এক বেদুঈন ছাহাবী লাগাতার রোজা রাখিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন– و من امـرك ان تعذب نفسك (আপন নফসকে এমন শাস্তি দিতে তোমাকে কে বলিয়াছে?)

সারকথা এই যে, নফসকে সংযত রাখিবার জন্য মুজাহাদা যেমন করিতে হইবে তেমনি অযথা আত্ম-নিপীড়নও পরিহার করিতে হইবে। এইজন্য নিজে মুজাহাদা শুরু করা সমূহ বিপদের কারণ। বরং উপযুক্ত শায়খ ও মুরশিদের হাতে নিজেকে হাওয়ালা করিয়া দিয়া তাঁহার নির্দেশিত পথে রিয়াযত মুজাহাদা করাই সংগত। শায়খ হইলেন আধ্যাত্মিক চিকিৎসক। তিনি যাহার জন্য যেমন মুনাছিব তাহার জন্য তেমন চিকিৎসা নির্ধারণ করিবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেক জনের জন্য একেক প্রকার আমল বলিতেন। উদাহরণ স্বরূপ, হযরত আবু বকর (রাঃ) সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করিলেও তাঁহাকে নিষেধ করা হয় নাই অথচ হযরত সা'আদ (রাঃ)-কে এক তৃতীয়াংশের বেশী দান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

আলোচ্য অধ্যায়ে বর্ণিত প্রতিটি হাদীছে মানুষকে ইবাদতের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রতি বিভিন্নভাবে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাওফিক দান করুন। আমীন।

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

طٰهٰ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى *

তোয়াহা। আমি আপনার উপর কোরআন এই জন্য নাযিল করি নাই যে, আপনি কষ্ট ভোগ করিবেন।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ *

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সহিত সহজতা (করিতে) চাহেন। আর তোমাদের সহিত কঠোরতা (করিতে) চাহেন না।

ফায়দা ঃ

বিভিন্ন সূরার শুরুতে কতগুলি বিচ্ছিন্ন হরফ দ্বারা গঠিত একটি অবোধগম্য শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা الـم - حـم - طـه ইত্যাদি। কোরআনের পরিভাষায় এইগুলিকে 'হরুফে

মুকাত্তাআত' বলা হয়। কোন কোন তাফসীরবিশারদ এইগুলিকে সংশ্লিষ্ট সূরার নাম রূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আবার অন্য কতিপয়ের মতে এইগুলি হইল আল্লাহর নামের তত্ত্ববিশেষ।

তবে অধিকাংশ ছাহাবী, তাবেয়ী ও ওলামায়ে কেরামের মত এই যে, এইগুলি এমনই রহস্যপূর্ণ বর্ণসমষ্টি যাহার মর্ম ও তাৎপর্য একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন। অন্য কাহাকেও এই বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয় নাই। অবশ্য কোন কোন তাফসীর মতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই রহস্য আল্লাহ পাক অবগত করাইয়াছেন এবং তাহা নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখিবার আদেশ করিয়াছেন।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, চারি খলিফা ও হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-সহ বহু ছাহাবা বলিয়াছেন যে, এইগুলি আল্লাহ পাকের ইলমের মাঝে বিদ্যমান নিগূঢ় রহস্য এবং তাঁহার পক্ষ হইতেই অবতীর্ণ– এই বিশ্বাসের সহিত এইগুলি তিলাওয়াত করিয়া যাইতে হইবে। তত্ত্ব ও রহস্য জানিবার চেষ্টা করা উচিত নহে।

তবে যে সকল ওলামায়ে কেরাম এইগুলির তত্ত্ব অনুধাবনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন অর্থ ও মর্ম পেশ করিয়াছেন তাহাদিগকে ভুল মনে করা ঠিক হইবে না। কেননা আল্লাহর কালামের খিদমতের নিয়তেই এবং আল্লাহর কালামকে সহজবোধ্য করিবার নিয়তেই তাহারা এইরূপ করিয়াছেন।

কোরআন নাযিল হইবার প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত্র ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকিতেন। ফলে তাঁহার কদম মুবারক ফুলিয়া যাইত। আবার সারা দিন তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিমগ্ন থাকিতেন। এই চিন্তা তাঁহাকে অস্থির করিয়া রাখিত যে, কাফিররা কিভাবে হিদায়াত লাভ করিবে এবং কোরআনের দাওয়াত কবুল করিবে। আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয় প্রকার কষ্ট দূর করিবার উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, আপনাকে কষ্টে ও পরিশ্রমে ফেলিবার জন্য আমি কোরআন নাযিল করি নাই। সুতরাং সারারাত্র নামাযে দাঁড়াইয়া তিলাওয়াতে মশগুল থাকিবার প্রয়োজন নাই। তদ্রূপ আপনার কর্তব্য শুধু দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়া। কাহারও কবুল করা না করা আপনার চিন্তার বিষয় নহে।

এই আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রের প্রথম ভাগে বিশ্রাম করিতেন এবং শেষভাগে জাগ্রত হইয়া তাহাজ্জুদ পড়িতেন।

(দ্বিতীয় আয়াত) আয়াতটি মূলতঃ রোযা সম্পর্কিত। অর্থাৎ অসুস্থতা কিংবা সফরের অবস্থায় রোযা রাখা কষ্টকর এবং রোযা না রাখা আরামদায়ক। আর আল্লাহ তোমাদের আরাম চাহেন কষ্ট চাহেন না। সুতরাং তোমরা ঐ অবস্থায় রোযা না রাখিয়া পরবর্তীতে কাযা করিতে পার।

তবে শানেনুযূলের প্রেক্ষাপটের পরিবর্তে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের আলোকে আয়াতের অর্থ হইতেছে। দ্বীন ও শরীয়তের সকল বিধানের ক্ষেত্রেই আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি সহজতা প্রদর্শন করিতে চাহেন, কঠোরতা প্রদর্শন করিতে চাহেন না। যেমন অন্য আয়াতে আছে–

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ *

তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– دين الله يسر (আল্লাহর দ্বীন হইল সহজ)

হাদীছসমূহ

১৪৪। সর্বোত্তম আমল উহাই যাহা স্থায়ী হয়

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ: مَنْ هٰذِهِ؟ قَالَتْ: هٰذِهِ فُلَانَةٌ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا، قَالَ: «مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتّٰى تَمَلُّوْا» وَكَانَ أَحَبَّ الدِّيْنِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣).

«وَمَهْ» كَلِمَةُ نَهْيٍ وَزَجْرٍ. وَمَعْنَى «لَا يَمَلُّ اللهُ» أَيْ: لَا يَقْطَعُ ثَوَابَهُ عَنْكُمْ وَجَزَاءَ أَعْمَالِكُمْ، وَيُعَامِلُكُمْ مُعَامَلَةَ الْمَالِّ حَتّٰى تَمَلُّوا فَتَتْرُكُوْا، فَيَنْبَغِيْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مَا تُطِيْقُوْنَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ لِيَدُوْمَ ثَوَابُهُ لَكُمْ وَفَضْلُهُ عَلَيْكُمْ.

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) তাঁহার নিকট তাশরীফ আনিলেন। তখন তাঁহার নিকট এক স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। এই স্ত্রীলোকটি কে? হযরত আয়েশা (রাঃ) আরয করিলেন, সে অমুক। তাহার নামাযের খুব চর্চা হয়। তিনি বলিলেন, থাম! তোমরা অতটুকুই করিও যতটুকু (নিয়মিতভাবে) করিতে সক্ষম হইবে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ বিরক্ত হইবেন না যতক্ষণ না তোমরা বিরক্ত হও। তাঁহার নিকট সেই ইবাদতই প্রিয় যাহা ইবাদতকারী নিয়মিতভাবে করে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

আল্লাহ বিরক্ত হইবেন না অর্থ, তিনি তোমাদের প্রতি তাঁহার ছাওয়াব বন্ধ করিবেন না এবং তোমাদের আমলের প্রতিদান দিতে বিরক্ত হইবেন না। বরং তোমরাই এক সময় বিরক্ত হইয়া আমল ছাড়িয়া দিবে। তখন আল্লাহও ছাওয়াব বন্ধ করিবেন। সুতরাং ঐ পরিমাণ ইবাদত গ্রহণ করাই তোমাদের উচিত যাহা নিয়মিতভাবে করিতে পারিবে। তখন তোমাদের উপর আল্লাহ পাকের ছাওয়াব ও অনুগ্রহও স্থায়ী হইবে।

ফায়দা ঃ

(সে অমুক) আল্লামা খতীব (রহঃ) উক্ত স্ত্রী ছাহাবীর নাম বলিয়াছেন হাওলা বিনতে ছোয়াইব বিন হাবীব বিন আসাদ বিন আব্দুল উয্যা।

(তাহার নামাযের চর্চা হয়) অর্থাৎ সে খুব নামাযী বলিয়া পরিচিত।

অন্য বর্ণনায় আছে هذه فلانة اعبد اهل المدينة (সে অমুক। সে মদীনার শ্রেষ্ঠ ইবাদতগুযার স্ত্রীলোক।) মুসনাদে আহমদে এইরূপ আছে– لا تنام تصلى রাত্রে ঘুমায় না। শুধু নামায পড়ে।

(থাম) হাদীছের শব্দ হইল مه ইহা তিরস্কারসূচক শব্দ। তিরস্কার স্ত্রীলোকটির মাত্রারিক্তি ইবাদতের কারণে হইতে পারে। আবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অতিরিক্ত প্রশংসার কারণে হইতে পারে। স্ত্রীলোকটির প্রতি তিরস্কারের কারণ এই যে, তাঁহার আশংকা হইয়াছিল যে, সে এই পরিমাণ ইবাদত অব্যাহত রাখিতে পারিবে না। এক সময় ছাড়িয়া দিবে। আর ইহা মাওলার দরবারে হাযিরা দিয়া সরিয়া পড়িবার শামিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি তিরস্কারের কারণ এই যে, মানুষের মুখের উপর এই ধরণের প্রশংসা তাহার জন্য ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে।

(আল্লাহ্ বিরক্ত হইবেন না যতক্ষণ না তোমরা বিরক্ত হও।) আল্লাহর শানে বিরক্তি শব্দের ব্যবহার অসম্ভব। এই জন্য ব্যাখ্যাকারগণ শব্দটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। একটি ব্যাখ্যা ইমাম নববী (রহঃ) নিজেই কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত অন্য একটি রিওয়ায়াতে ইহার সমর্থনও পাওয়া যায়। যেমন–

اكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل *

আরেকটি ব্যাখ্যা এই যে, তোমরা বিরক্ত হইয়া পড়িলেও আল্লাহ্ পাক বিরক্ত হইবেন না।

ইহাও বলা যাইতে পারে যে, حتى অব্যয়টি এখানে (و) এর সমার্থক। তখন অর্থ হইবে আল্লাহ্ বিরক্ত হইবেন না অথচ তোমরা বিরক্ত হইয়া পড়িবে।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক আপন যাত হইতে 'বিরক্তি' রহিত করিয়া বান্দার যাতের সংগে সম্পৃক্ত করিয়াছেন অর্থাৎ তোমাদিগকে আমল করিতে বলিবার কারণ এই নহে যে, আল্লাহ্ ছাওয়াব দিতে অক্ষম। বরং তোমরাই আমল করিতে করিতে এক সময় বিরক্ত হইয়া যাইবে।

(তাঁহার নিকট সবচাইতে প্রিয়) কেহ কেহ বলেন, তাঁহার দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ্ পাক। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সবচাইতে প্রিয় ইবাদত উহা যাহা ইবাদতকারী নিয়মিত করে।

তবে অধিকাংশের মতে তাঁহার দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অবশ্য উভয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা যাহা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় তাহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটও অধিক প্রিয় হইবে। তদ্রূপ যাহা আল্লাহর রাসূলের অধিক প্রিয় তাহা আল্লাহরও অধিক প্রিয় হইবে।

ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, নিয়মিত আমল অল্প হইলেও উহাই অধিক প্রিয় হইবার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি নিয়মিত কোন আমল করিতে থাকে সে ঐ খাদিমের মত যে প্রতিদিন বাদশাহর খিদমতে একটি নির্দিষ্ট সময় হাযির থাকে এবং নির্দিষ্ট খিদমতের মাধ্যমে বাদশাহর সন্তুষ্টি অর্জন করিতে থাকে। নিঃসন্দেহে সে ঐ খাদিমের তুলনায় বাদশাহর অধিক প্রিয় হইবে যে, একমাস তো দিন-রাত্র বাদশাহর খুব খিদমত করিল। কিন্তু ইহার পর হাল ছাড়িয়া দিল এবং শাহী দরবার হইতে গায়র হাযির থাকিতে লাগিল। এমন কি বাদশাহর পক্ষ হইতে তলব বা ডাক দিয়াও তাহাকে পাওয়া গেল না।

হাদীছের শিক্ষা ঃ নফল আমল ঐ পরিমাণই শুরু করা উচিত যাহা নিয়মিত আমল করা সম্ভব হইবে। চেষ্টা করিবে যেন উহা কখনো নাগা না হয়। তবে অল্প অল্প করিয়া পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করা উত্তম।

১৪৫। সুন্নতের ইত্তেবা না করা উম্মত হইতে খারিজ হইবার কারণ

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا وَقَالُوْا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ: أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟! أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لٰكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের গৃহে আসিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। যখন তাহাদিগকে সেই সম্পর্কে বলা হইল তখন মনে হইল যেন, তাহারা উহাকে অতি অল্প বিবেচনা করিলেন। তাই বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমাদের কি তুলনা? তাঁহার তো পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাহাদের একজন বলিলেন, আমি কিন্তু সর্বদা সারা রাত্র (জাগরণ করিয়া) নামায পড়িব। অন্যজন বলিলেন, আমি সারা বৎসর রোযা রাখিব। কোন দিন রোযা বাদ দিব না। তৃতীয়জন বলিলেন, আমি নারীসংগ বর্জন করিব। কখনো বিবাহ করিব না। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরাই কি এমন এমন কথা বলিয়াছ? শোন, আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চাইতে বেশী ভয় করি এবং তোমাদের চাইতে বেশী তাকওয়া অবলম্বন করি। অথচ আমি রোযা রাখি, আবার রোযা বাদ দেই। (রাত্রে নফল) নামায পড়ি, আবার ঘুমাই এবং বিবাহও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হইতে বিমুখ হইবে সে আমার সহিত সম্পর্কিত নহে।

ফায়দা ঃ

এই তিনজন হইলেন হযরত আলী বিন আবু তালিব, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ ও হযরত ওছমান বিন মায'উন (রাঃ)। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ও আমলের পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হইয়া উহা আকড়াইয়া ধরিবেন এবং নিজেরাও সেইরূপ আমল করিবেন।

(তুলনা কোথায়) অর্থাৎ যেহেতু তিনি নিষ্পাপ এবং তাঁহার ঈমানের সহিত মৃত্যু ও জান্নাত লাভ সুনিশ্চিত সেহেতু তাঁহার পক্ষে অল্প আমল করা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যেহেতু গোনাহের গান্দেগীতে নিমজ্জিত এবং মৃত্যুর সময় আমাদের ঈমানের পরিণতি কি হইবে জানা নাই সেহেতু আমাদের জন্য অল্প আমল বরবাদির কারণ হইবে। নিষ্পাপ রাসূলের সহিত পাপী

উম্মতের তুলনা হইতে পারে না।

(মাফ করিয়া দিয়াছেন) ইহা কোরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি ইংগিত–

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ *

যাহাতে আল্লাহ্ আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত গোনাহ্ মাফ করিয়া দেন।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নিষ্পাপ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবার কি অর্থ? উত্তর এই যে, এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ পাকের নিকট তাঁহার অত্যুচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আপনার যদি কোন প্রকার গোনাহ্ থাকিয়াও থাকিত তবে উহাও মাফ করিয়া দেওয়া হইত। এই প্রশ্নের আরও উত্তর পিছনে মুজাহাদা অধ্যায়ে তৃতীয় হাদীছে আলোচিত হইয়াছে।

(নারীসংগ) বর্জনের কারণ দুইটি হইতে পারে। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা নফসের খাহেশ পুরা হয়। সুতরাং নফসকে উহার খাহেশাত হইতে দূরে রাখিলে নফসের মুজাহাদা হইবে। দ্বিতীয়তঃ সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বিবাহ্ শাদী করিবার পর মানুষ সাংসারিক ঝামেলা ও দায়দায়িত্বে এমনভাবে জড়াইয়া যায় যে, ইবাদত বন্দেগীতে মনোনিবেশ করা দুরূহ হইয়া পড়ে। সুতরাং উহা হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়। তবে যেহেতু এই ধারণা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমর্থন করেন নাই সেহেতু ইহা গ্রহণযোগ্য নহে।

(তাহাদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন) হইতে পারে যে, ঘরওয়ালাদের নিকট হইতে কিংবা অন্য কাহারও নিকট হইতে তিনি তাহাদের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। কিংবা অহীর মাধ্যমে তাঁহাকে জানানো হইয়াছিল।

(বেশী ভয় করি) শায়খ ইযযুদ্দীন বিন আবদুস সালাম বলেন, আলোচ্য হাদীছে এমন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ভয় তো ঐ লোকের হইতে পারে যে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে শাস্তি লাভের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করে। অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অহীর মাধ্যমে অভয়বাণী দেওয়া হইয়াছিল। আর অহীর প্রতি তাঁহার পুর্ণ বিশ্বাসও ছিল। এমতাবস্থায় তাঁহার অন্তরে আল্লাহর ভয় কল্পনা করা যায় কিভাবে? বেশী ভয় তো দূরের কথা। শায়খ (রহঃ) বলেন, এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, সাময়িক বিস্মরণ (ذهول) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে সম্ভব। অর্থাৎ বন্দেগী ও অবদিয়াতের প্রবলতার কারণে আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভয়বাণীর অনুভব মাঝে মধ্যে চাপা পড়িয়া যাইত এবং ভয় প্রবল হইয়া উঠিত। আবার যখন অভয়বাণীর অনুভব জাগ্রত হইত তখন ভয় চলিয়া যাইত। বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাকের আযমত ও বড়ত্ব এবং তাঁহার সর্বময় ক্ষমতা ও নিরংকুশ অধিকার, সেই সংগে আবদিয়াত ও বন্দেগী তাঁহার চিন্তায় এমনভাবে সদা জাগরূক থাকিত যে, অভয়বাণী সত্ত্বেও ভয় তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। সুতরাং এই ভয় আযাব ও শাস্তির নহে বরং আল্লাহ্র আযমতের এবং নিজের আবদিয়াতের। ইহারই প্রতি এক হাদীসে ইংগিত করা হইয়াছে। ছাহাবা কেরাম আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কি আল্লাহর রহমত ছাড়া নাজাত পাইবেন না? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমিও না।

(আমার সহিত সম্পর্কিত নহে) শরহুল মাছাবীহ কিতাবে আছে, হাদীছের অর্থ এই যে,

যে ব্যক্তি দ্বীনের কোন একটি ফরয , সুন্নত বা মুস্তাহাব আমার প্রতি অবজ্ঞাবশতঃ তরক করিবে সে আমার সহিত সম্পর্কিত নহে। কেননা দ্বীনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের কারণে সে কাফির হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে যদি অবজ্ঞাবশতঃ না হয় বরং অলসতা বা অন্য কোন কারণে হয় তবে কাফির হইবে না। কিন্তু সে আমার সুন্নত ও তরীকা হইতে বিচ্যুত হইল এবং সুন্নতের যাবতীয় কল্যাণ ও সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইল।

হাদীছের শিক্ষা ঃ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এমনকি ইবাদত বন্দেগী ও রিয়াযাত মুজাহাদার ক্ষেত্রেও হুবহু সুন্নতে নববী অনুসরণ করিতে হইবে। সুন্নত হইতে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হওয়া চলিবে না। অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য।

১৪৬। অযথা কঠোরতা ধ্বংসের কারণ

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ» قَالَهَا ثَلَاثًا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

«اَلْمُتَنَطِّعُوْنَ»: اَلْمُتَعَمِّقُوْنَ الْمُشَدِّدُوْنَ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشْدِيْدِ.

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, অযথা কঠোরতাকারীরা হালাক হইয়া গিয়াছে। ইহা তিনি তিনবার বলিয়াছেন। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দাঃ

মূল আরবী শব্দ (متنطعون) ইহার অর্থ ইমাম নববী (রহঃ) লিখিয়াছেন, কঠোরতার ক্ষেত্র নহে এমন স্থানে কঠোরতাকারী। খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ ঐ সমস্ত লোক যাহারা মানুষের আকল ও বুদ্ধিতে বোঝা সম্ভব নহে এমন বিষয়ে মাথা ঘামায় এবং অর্থহীন ও জটিল আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়।

সুতরাং আলোচ্য হাদীছের শিক্ষা হইল ১। যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ বান্দার জন্য সহজতা ও অবকাশ রাখিয়াছেন ঐ সকল ক্ষেত্রে নিজের উপর কঠোরতা না করা। যেমন রমযান মাসে খুব কষ্টদায়ক সফরের সময় রোযা না রাখিবার অবকাশ থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখা। তদ্রূপ অসুস্থতার সময় পানি ব্যবহার করা কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর হইলে তায়াম্মুমের অবকাশ রহিয়াছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তায়াম্মুম না করিয়া অযু করা, ইত্যাদি।

২। আল্লাহ্ পাকের যাত ও ছিফাত, রূহ, তাকদীর ইত্যাদি জটিল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়া।

১৪৭। দ্বীনের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উত্তম

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنُ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوْا، وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاغْدُوْا وَرُوْحُوْا، وَشَيْءٌ مِّنْ الدُّلْجَةِ، الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا».

قَوْلُهُ: «الدِّيْنُ» هُوَ مَرْفُوْعٌ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ. وَرُوِيَ مَنْصُوْبًا، وَرُوِيَ: «لَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ». وَقَوْلُهُ ﷺ: «إِلَّا غَلَبَهُ»، أَيْ: غَلَبَهُ الدِّيْنُ وَعَجَزَ ذٰلِكَ الْمُشَادُّ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدِّيْنِ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ. «وَالْغَدْوَةُ»: سَيْرُ أَوَّلِ النَّهَارِ. «وَالرَّوْحَةُ»: آخِرُ النَّهَارِ. «وَالدُّلْجَةُ»: آخِرُ اللَّيْلِ. وَهٰذَا اسْتِعَارَةٌ وَتَمْثِيْلٌ، وَمَعْنَاهُ: اسْتَعِيْنُوْا عَلَى طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْأَعْمَالِ فِيْ وَقْتِ نَشَاطِكُمْ، وَفَرَاغِ قُلُوْبِكُمْ بِحَيْثُ تَسْتَلِذُّوْنَ الْعِبَادَةَ وَلَا تَسْأَمُوْنَ، وَتَبْلُغُوْنَ مَقْصُوْدَكُمْ، كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ الْحَاذِقَ يَسِيْرُ فِيْ هٰذِهِ الْأَوْقَاتِ وَيَسْتَرِيْحُ هُوَ وَدَابَّتُهُ فِيْ غَيْرِهَا، فَيَصِلُ الْمَقْصُوْدَ بِغَيْرِ تَعَبٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিঃসন্দেহে দ্বীন হইল সহজ বিষয়। যে ব্যক্তি দ্বীনের সহিত শক্তি প্রদর্শন করিবে উহা তাহাকে পরাস্ত করিয়া ছাড়িবে। সুতরাং তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং সাধ্যমত আমল কর এবং (নিয়মিত আমল অল্প হইলেও উহা দ্বারা ছাওয়াব লাভের) সুসংবাদ গ্রহণ কর। আর (ইবাদত করিবার ব্যাপারে) সকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রের কিছু অংশ হইতে সাহায্য গ্রহণ কর। (বুখারী শরীফ)

বুখারী শরীফের অন্য বর্ণনায় আছে, মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং সাধ্যমত আমল কর। আর সকালে, সন্ধ্যায় ও রাত্রের কিছু অংশে যাত্রা কর। মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর, উদ্দেশ্যে সফল হইবে।

ফায়দা ঃ

(যে ব্যক্তি দ্বীনের সহিত শক্তি প্রদর্শন করিবে উহা তাহাকে পরাস্ত করিবে) অর্থাৎ যে ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শনপূর্বক অতিরিক্ত ইবাদত করিয়া বড়াই দেখাইবে, দ্বীন তাহাকে অক্ষম করিয়া ফেলিবে। কেননা দ্বীনের আমলের রাস্তা অসংখ্য। সুতরাং এক সময় ক্লান্ত হইয়া তাহাকে আমল ছাড়িয়া দিতেই হইবে।

হাদীছে ব্যবহৃত الغدوة -এর অর্থ দিনের প্রারম্ভ অংশের যাত্রা এবং الروحة -এর অর্থ দিনের শেষ ভাগের যাত্রা। আর الدلجة -এর অর্থ রাত্রের শেষভাগের যাত্রা। ইহা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তোমাদের প্রফুল্লতার সময়ে এবং হৃদয়ের চিন্তামুক্ত সময়গুলিতে আমল করা দ্বারা আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর কাজে সাহায্য গ্রহণ কর। কেননা এই সময় তোমরা ইবাদতে স্বাদ অনুভব করিবে। বিরক্তি বোধ হইবে না। ফলতঃ উদ্দেশ্য পর্যন্ত উপনীত হইতে পারিবে। যেমন বিচক্ষণ মুসাফির এই সময়গুলিতে যাত্রা করে। আর অন্য সময় সে ও তাহার বাহন বিশ্রাম গ্রহণ করে। ফলতঃ বিনা কষ্টে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে সক্ষম হয়। আল্লাহই উত্তম জানেন।

(রাস্তা অসংখ্য) অর্থাৎ একই সময়ে দ্বীনের সমস্ত আমল একজনের পক্ষে করা সম্ভব হইবে

না। কেননা একটি সময় দুইটি আমল ধারণ করিবার যোগ্যতা সে রাখে না। আর

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِهِ *

কোন মানুষের অন্তরে আল্লাহ পাক দুইটি হৃদয় স্থাপন করেন নাই।

সুতরাং তাহার পক্ষেও একই সংগে একাধিক আমলে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে।

১৪৮। প্রফুল্লতার সময় ইবাদত, ক্লান্তির সময় বিশ্রাম

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ: «مَا هٰذَا الْحَبْلُ؟»، قَالُوْا: هٰذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حُلُّوْهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করিলেন। আর তখন (মসজিদের) দুই খুঁটির মাঝে একটি রশি টানানো দেখিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রশি কিসের? তাহারা আরয করিলেন, ইহা যায়নাবের রশি। (নামায পড়িতে পড়িতে) তিনি যখন ঝিমাইয়া পড়েন তখন রশির সহিত হেলান দেন। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা খুলিয়া ফেল। তোমাদের প্রত্যেকের উচিত, প্রফুল্ল অবস্থায় নামায পড়া এবং ক্লান্তির সময় শুইয়া পড়া। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(এই রশি কিসের) অর্থাৎ কি কারণে এইভাবে ইহা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

(ইহা যায়নাবের রশি) আল্লামা ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, কয়েকজন স্ত্রীছাহাবীর নাম ছিল যায়নাব। ইনি কোন যায়নাব ইহার স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও পাই নাই। তবে অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারের মতে ইনি হইলেন যায়নাব বিনতে জাহাশ। ইবনে খোযায়মা সংকলিত ছহী কিতাবে রহিয়াছে- فقالوا لميمونة بنت الحارث তাহারা বলিলেন, ইহা মায়মুনা বিনতুল হারিছের রশি। ইহা বিরল বর্ণনা। সুতরাং প্রামাণ্য নহে। অন্যরা বলেন, উভয় বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার হইতে পারে।

(ক্লান্তির সময় শুইয়া পড়া) পরবর্তী হাদীছে ইহার হিকমত বয়ান করা হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আল্লাহ পাক প্রফুল্ল চিত্তের আগ্রহপূর্ণ ইবাদত পছন্দ করেন।

আর যেহেতু ইবাদতের মাঝে নব উদ্যম ও সতেজতা লাভের নিয়তে ঘুমানোও ইবাদতরূপে গণ্য সেহেতু ঐ সময় ঘুমাইয়া পড়িলে শরীরের হকও আদায় হইবে। আবার ইবাদতের ছাওয়াবও হইবে।

অবশ্য এই সকল হাদীছ আল্লাহর ঐ বান্দাদের জন্য যাহারা ঘুমকে হারাম করিয়া ইবাদতের নেশায় পাগল হইয়া যাইতেন এবং বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন কলিয়া ঘুম দূর করিতে চাহিতেন। কেননা একটি মাত্র ভাবনাই তাহাদের সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত যে,

জীবনের মূল্যবান সময়গুলি হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। যখন মওত আসিয়া পড়িবে তখন তো আমলের সুযোগ থাকিবে না। তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই এই সকল হাদীছ।

আমাদের মত লোকদের অবস্থা তো এই যে, অলসতা ও গাফলত দিনরাত্র আমাদের উপর ভর করিয়া থাকে। শবে কদরের রাত্রি পর্যন্ত গাফলতের ঘোরে কাটিয়া যায় এবং শরীরের আরাম আয়েশের জন্য বিভিন্ন বাহানা এবং কোরআন হাদীছের ফাঁক ফোকর তালাশ করিয়া বেড়ানো হয়।

আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছে ইবাদতের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। (যেন তাহা নিয়মিত পালন করা সহজ হয়। এবং বিরক্তি ও অনিহা আসিয়া না পড়ে) এবং উদ্যম ও সতেজ অবস্থায় ইবাদতে আত্মনিয়োগ করিতে বলা হইয়াছে (যাহাতে ইবাদত প্রাণবন্ত ও জানদার হয়।) ইহাছাড়া এখানে হাতে ও মুখে অন্যায় কাজে বাধা প্রদানের বৈধতা এবং মসজিদে স্ত্রীলোকদের নফল নামায পড়িবার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

তবে পরবর্তী যুগের ফিতনার প্রতি লক্ষ করিয়া ছাহাবা কেরামের যুগেই স্ত্রীলোকদের মসজিদে উপস্থিত হইবার বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করা হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান যুগের অবস্থা তো বলাই বাহুল্য।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বর্তমান যামানার স্ত্রীলোকদের অবস্থা দেখিতেন তবে অবশ্যই তাহাদিগকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করিতেন। অথচ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর যামানা তো নববী যামানা হইতে তেমন কোন দূরবর্তী যামানা ছিল না।

বস্তুতঃ স্ত্রীলোকদের মসজিদে গমনের বিষয়টি তখন বিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিষ্কার হাদীছ ছিল যে, স্ত্রীলোকদিগকে তোমরা মসজিদে গমনের অনুমতি দিও। বাঁধা দিও না। ছাহাবা কেরামের নিকট আল্লাহর রাসূলের প্রতিটি আদেশই ছিল প্রাণাধিক প্রিয়। অপরদিকে যামানার ফিতনা ফাসাদের প্রেক্ষিতে (যাহার আলামত তখন হইতেই শুরু হইয়া গিয়াছিল।) অনুমতি প্রদানও মুশকিল ছিল। তাই ছাহাবা কেরাম নিষেধ না করিলেও স্ত্রীলোকদিগকে নিরুৎসাহিত করিতেন।

হযরত আতিকা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর স্ত্রী থাকা অবস্থায় মসজিদে গমন করিতেন। হযরত ওমর (রাঃ) ইহা অপছন্দ করিতেন। কিন্তু কিছু বলিতেন না। হযরত আতিকা (রাঃ)কে বলা হইল যে, আপনার স্বামী ওমর ইহা অপছন্দ করেন। তিনি বলিলেন, তাহার অপছন্দ হইলে তো আমাকে নিষেধ করিতে পারেন। তাহা করিতেছেন না কেন?

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইনতিকালের পর হযরত যোবায়র (রাঃ) তাহাকে বিবাহ করিলেন, তিনিও ইহা অপছন্দ করিতেন। কিন্তু হাদীছের কারণে বাধা দানের হিম্মত করিতেন না।

একবার এশার সময় হযরত আতিকা (রাঃ) মসজিদের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। হযরত যোবায়র (রাঃ) পথে (নির্জন ও অন্ধকার স্থানে) ওত পাতিয়া বসিয়া রহিলেন। হযরত আতিকা তাহার নিকটবর্তিনী হইবা মাত্র তাহাকে উত্তক্ত করিতে শুরু করিলেন। ইহার পর হইতে তিনি মসজিদে যাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। হযরত যোবায়র (রাঃ) একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার, এখন মসজিদে যাও না কেন? তিনি বলিলেন, এখন আর সেই যামানা নাই।

১৪৯। তন্দ্রার অবস্থায় নামায না পড়িবার হিকমত

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّيْ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِيْ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যদি নামাযের সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় তবে ঘুম দূর না হওয়া পর্যন্ত তাহার শুইয়া থাকা উচিত। কেননা তোমাদের কেহ যদি ঝিমানো অবস্থায় নামায পড়িতে থাকে এবং (কি বলিতেছে তাহা) বুঝিতে না পারে তবে হয়ত ইস্তিগফার করিতে গিয়া নিজেকেই অভিসম্পাত করিয়া বসিবে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

আর উহা যদি কবুলিয়াতের সময় হইয়া থাকে তবে তো অভিসম্পাত দিয়া নিজেই নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিল।

তন্দ্রার পরিমাণ এই যে, উপস্থিত লোকদের কথা কানে আসিতেছে কিন্তু অর্থ বুঝিতেছে না।

সাধারণ তন্দ্রার কারণে নামায ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না। বরং উহা শেষ করিয়া ছালাম বলিবে। অতঃপর নতুন নামায শুরু না করিয়া শুইয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে যদি তন্দ্রায় এমন কাবু হইয়া পড়ে যে, কি বলিতেছে বা কি তিলাওয়াত করিতেছে বুঝিতেছে না তবে তখন নামায ভংগ করিয়া পরে কাযা করিবে।

১৫০। ইমামের নামায কেমন হওয়া উচিত

وَعَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كُنْتُ أُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

قَوْلُهُ: قَصْدًا: أَيْ بَيْنَ الطُّوْلِ وَالْقِصَرِ.

হযরত জাবির বিন সামুরাহ (রাঃ) বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বহু নামায পড়িয়াছি। তাঁহার নামায ছিল নাতিদীর্ঘ এবং তাঁহার খোতবা ছিল নাতিদীর্ঘ। (মুসলিম শরীফ)

হাদীছে বর্ণিত قصدا শব্দটির অর্থ অতি সংক্ষিপ্তও নহে আবার অতি দীর্ঘও নহে।

ফায়দা ঃ

অন্য এক রিওয়ায়াতে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে দুই হাজারেরও অধিক নামায পড়িয়াছি।

(তাঁহার নামায ছিল নাতিদীর্ঘ) অর্থাৎ নামাযের সুন্নাত, মুস্তাহাব ও আদাব সবই আদায় করিতেন। তবে এত দীর্ঘ করিতেন না যাহাতে পিছনে মাযুর মুক্তাদীদের কষ্ট হয়। ইহা তো

হইল স্বাভাবিক অবস্থার কথা। পক্ষান্তরে যখন তিনি সুনির্দিষ্টভাবে জানিতে পারিতেন যে, তাঁহার পিছনে অসুস্থ কিংবা প্রয়োজনগ্রস্ত মুক্তাদী রহিয়াছে কিংবা যদি বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনিতেন এবং বুঝিতেন যে, বাচ্চার মা জামা'আতে শরীক হইয়াছে তখন খুব তাড়াতাড়ি নামায শেষ করিয়া দিতেন।

হযরত মু'আয (রাঃ) তাঁহার এলাকায় ইমামতি করিতেন। তিনি নামাযের প্রতি মুহব্বত এবং তিলাওয়াতের প্রতি প্রবল অনুরাগবশতঃ এশার নামাযে সূরা বাকারার মত দীর্ঘ সূরা পড়িতেন। ফলে কর্মক্লান্ত মুক্তাদীদের খুব অসুবিধা হইত। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁহার নামে অনুযোগ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—

افتان انت يا معاذ!

হে মু'আয! তুমি ফিতনা সৃষ্টি করিতে চাও?

(তাঁহার খোতবা ছিল নাতিদীর্ঘ) যেহেতু তাঁহাকে সুসংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ কথা বলিবার মুজিযা দান করা হইয়াছিল। সেহেতু অল্প ও সহজ সহজ শব্দে বিরাট ভাব ও মর্ম তিনি বয়ান করিতেন। ফলে তাঁহার খোতবা বেশী দীর্ঘ হইত না। অথচ প্রয়োজনীয় কোন কথা বাদও থাকিত না এবং শ্রোতাদের বুঝিতে কোন অসুবিধা হইত না।

হাদীছের শিক্ষা ঃ ইমামের কর্তব্য হইল মুক্তাদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নামায দীর্ঘ না করা, অবশ্য নামাযের যাবতীয় আদব রক্ষা করিতে হইবে।

১৫১। নিজের ও বিবি বাচ্চার হক আদায় করাও কর্তব্য

وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ لَهُ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ، فَصَلَّيَا جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ سَلْمَانُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আবু জোহায়ফা ওয়াহব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত) সালমান ফারসী ও (হযরত) আবু দারদা (রাঃ)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিলেন। একবার হযরত সালমান (রাঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর সহিত দেখা করিতে আসিয়া উম্মে দারদাকে মলিন কাপড় পরা অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তখন (উম্মে দারদা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এই অবস্থা কেন? উম্মে দারদা বলিলেন, দুনিয়ার কোন কিছুর প্রতি তোমার ভাই আবু দারদার কোন

প্রয়োজন নাই। পরে আবু দারদা আসিলেন এবং হযরত সালমান (রাঃ)-এর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করিলেন। অতঃপর তাহাকে বলিলেন, তুমি খাও; আমি রোযাদার। হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, তুমি না খাওয়া পর্যন্ত আমি খাইব না। তখন তিনি তাহার সংগে খাইলেন। যখন রাত্র হইল তখন আবু দারদা নামাযে দাঁড়াইতে গেলেন। কিন্তু হযরত সালমান (রাঃ) তাহাকে ঘুমাইতে বলিলেন। তখন তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি নামাযে দাঁড়াইতে গেলেন। তখন হযরত সালমান (রাঃ) আবার তাহাকে ঘুমাইতে বলিলেন। শেষ রাত্রে হযরত সালমান (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, এখন উঠ। অতঃপর উভয়ে নামায পড়িলেন। আর হযরত সালমান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, নিঃসন্দেহে তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের হক রহিয়াছে এবং তোমার উপর তোমার নফসের হক রহিয়াছে এবং তোমার উপর তোমার পরিবারের হক রহিয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক হকদারকেই তাহার হক প্রদান কর। পরে (হযরত আবু দারদা) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের খিদমতে হাযির হইয়া তাঁহাকে ঘটনা জানাইলেন। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সালমান সত্য বলিয়াছে। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

(ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিলেন।) কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া মুহাজির মুসলমানগণ যখন আল্লাহর হুকুমে মদীনা শরীফে হিজরত করিলেন, তখন এক অভাবিতপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। মুহাজিরগণ তাঁহাদের যাবতীয় সহায় সম্পদ ত্যাগ করিয়া প্রায় শূন্যহাতে মদীনায় আসিয়াছিলেন। একদিকে তাঁহাদের সম্মানজনক পুনর্বাসনের প্রশ্ন ছিল। অপরদিকে নূতন সমাজ ও নূতন পরিবেশে তাঁহাদের খাপ খাইবার প্রশ্ন ছিল। এই উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকল্পে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন করিয়া মুহাজির ও আনসারী ছাহাবীর মাঝে বিশেষ ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিলেন। ফলে একদিকে মুহাজিরদের পুনর্বাসন সমস্যার যেমন সহজ সুন্দর সমাধান হইল তেমনি অপর দিকে স্থানীয় আনসারীগণের সংগেও অপূর্ব হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ও সখ্যতা গড়িয়া উঠিল। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহীত এই ভ্রাতৃত্ব-ব্যবস্থা ছিল এমনই নববী প্রজ্ঞামণ্ডিত যে, পৃথিবীর আগের বা পরের ইতিহাসে ইহার কোন তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আনসার মুহাজির উভয় পক্ষই উপরোক্ত ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের কেমন সমুন্নত আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার একটি মাত্র নমুনা দেখুন–

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) ছিলেন আনছারী ছাহাবী সা'আদ বিন রাবী (রাঃ)-এর ভাই। একদিন তিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ)-কে বলিলেন, আমার চাইতে সম্পদশালী মানুষ মদীনায় কেহই নাই। আপনি এই সম্পদের অর্ধেক গ্রহণ করুন। আর আমার দুই স্ত্রীর মধ্যে যাহাকে আপনার পছন্দ তাহাকে আমি তালাক দিব। ইদ্দত শেষে তাহাকে আপনি বিবাহ করুন।

কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) বলিলেন, আপনার সম্পদ ও পরিবারের মাঝে আল্লাহ বরকত দান করুন। আপনি আমাকে শুধু বাজারের পথ দেখাইয়া দিন। (আমি

হযরত সালমান (রাঃ) যখন মুসলমান হইয়া মদীনায় আসিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ও আনসারী ছাহাবী হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন।

(উম্মে দারদা) ইনি ছিলেন আবু দারদা (রাঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী। নাম খায়রাহ বিনতে হাদরাদ। হযরত হাদরাদ (রাঃ)ও ছাহাবী ছিলেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর পূর্বেই তাঁহার স্ত্রী খায়রাহ-এর ইনতিকাল হইয়াছিল।

(এই অবস্থা দেখিয়া) সম্ভবতঃ ইহা পর্দার আয়াত নাযিল হইবার আগের ঘটনা ছিল।

(এই অবস্থা কেন) অর্থাৎ স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় সাজিয়া গুজিয়া থাকা তো সুন্নত। তুমি তাহা করিতেছ না কেন?

(প্রয়োজন নাই) কেননা তিনি তো দিনে রোযা ও রাত্রে নামায, এইভাবে দিন-রাত্র ইবাদতেই ডুবিয়া থাকেন। তাহার মনে কোন স্বাদ আহ্লাদ নাই এবং আমার প্রতিও তাহার কোন নজর নাই। তাই আমারও সজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই।

(খাবারের ব্যবস্থা করিলেন) মেহমানের ইকরাম করা সুন্নত। মেহমানের ইকরামের জন্যই তিনি খাবার তৈরী করাইলেন। আবার তাহার অনুরোধ রক্ষার্থে নফল রোযা ভংগ করিলেন। শরীয়তের বিধানও ইহাই। তবে বিনা প্রয়োজনে কিংবা দ্বিপ্রহরের পর ভংগ করা উচিত নহে। মেহমানের মন রক্ষার্থে রোযা ভংগ করিবার মধ্যেই ছাওয়াব। তবে মেহমানের উচিত মেজবানকে রোযা ভংগ করিতে বাধ্য না করা। হযরত সালমান (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া এবং নিজের ও পরিবারের হক সম্পর্কে সতর্ক করা। এই জন্য তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে এই রোযা কাযা করা ওয়াজিব।

এই হাদীছ হইতে বুঝা যায় যে, মুস্তাহাব কাজ করিতে গিয়া কেহ যদি অপরের হক নষ্ট করিতে থাকে কিংবা পরবর্তী ইবাদতের ক্ষেত্রে নিস্তেজ হইয়া পড়িবার আশংকা থাকে তবে মুস্তাহাব ও নফল কাজ হইতে বাধা দেওয়া জায়েয আছে।

(তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের হক রহিয়াছে) সুতরাং যাবতীয় ফরয ও ওয়াজিব আহকাম পূর্ণ আদব রক্ষা করিয়া পালন করিতে হইবে। অতঃপর নফল ইবাদতের মাধ্যমে তাঁহার নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হইতে হইবে।

(তোমার উপর তোমার নফসের হক রহিয়াছে) সুতরাং এই পরিমাণ আরাম ও বিশ্রাম তাহাকে দিতে হইবে যাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় এবং ইবাদত বন্দেগী করিবার মত পর্যাপ্ত শক্তি অর্জিত হয়। তদ্রূপ এই পরিমাণ আনন্দ দান করিতে হইবে যাহাতে মন প্রফুল্ল হয়।

(তোমার উপর আপন পরিবারের হক রহিয়াছে) সুতরাং তাহাকে একটা নির্দিষ্ট সময় দিতে হইবে। তাহার সহিত হাসিমুখে কথা বলিতে হইবে। আদর সোহাগ করিতে হইবে এবং তাহার বৈধ প্রয়োজন পুরা করিতে হইবে।

মোটকথা, ইসলাম এমনই ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম যে, আখিরাতের নামে দুনিয়া কিংবা দুনিয়ার নামে আখিরাত বর্জন করিবার কোন অবকাশ নাই।

তবে মনে রাখিতে হইবে যে, স্ত্রী-পুত্রের হকের দোহাই দিয়া ছাহাবা কেরাম জিহাদ বন্ধ করেন নাই। ইলম চর্চা বন্ধ করেন নাই। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ বন্ধ করেন নাই। তদ্রূপ সেই যুগের স্ত্রীগণও 'হক'-এর কথা বলিয়া আপন স্বামীদিগকে ঘরে বসাইয়া রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। নতুবা আরব উপদ্বীপের বাহিরে এত এত শতাব্দীর পর মানুষ আজ ইসলামের আলো লাভ করিতে পারিত না।

ইহা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, দুনিয়ার কাজে তো দীর্ঘ প্রবাস জীবনেও আমাদের কোন আপত্তি নাই। অপচয়মূলক খরচেও কোন অমত নাই কিন্তু যখনই দ্বীনের কাজে সময় ও অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন আসে তখনই স্ত্রী পুত্রের হক নষ্ট হইবার মামলা দায়ের হইয়া যায়। আল্লাহ আমাদিগকে ছহী বুঝ ও ছহী আমলের তাওফীক দান করুন। আমীন।

(তোমার উপর তোমার পরিবারের) তিরমিযি শরীফের বর্ণনায় অতিরিক্ত এই অংশটুকু রহিয়াছে– ولضيفك عليك حق তোমার উপর তোমার মেহমানেরও হক রহিয়াছে । দারে কুতনীতে আরো আছে–

فصم و افطر و صل و نم و ات اهلك *

সুতরাং রোযা রাখ এবং রোযা ভংগ কর। তদ্রূপ নামায পড় এবং ঘুমাও এবং পরিবারের সংগে মিলিত হও।

(তাঁহাকে ঘটনা জানাইলেন) দারে কুতনীর বর্ণনা এইরূপ–

অতঃপর উভয়ে নামাযের জন্য (মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে) বাহির হইলেন। হযরত আবু দারদা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। উদ্দেশ্য, হযরত সালমান (রাঃ) তাঁহাকে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো। কিন্তু (কিছু বলিবার পূর্বেই) তিনি তাঁহাকে হযরত সালমান (রাঃ)–এর ন্যায় বলিতে লাগিলেন, হে আবু দারদা! নিশ্চয় তোমার উপর তোমার শরীরের হক রহিয়াছে। ....

এই বর্ণনা প্রমাণ করে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহীর মাধ্যমেই তাহাদের কথোপকথন জানিয়াছিলেন।

উভয় বর্ণনার মাঝে সাজুয্য বিধান এইভাবে হইতে পারে যে, প্রথমে তিনি অহীর মাধ্যমে অবগত হইবার বিষয়টি তাহাদের সামনে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত আবু দারদা (রাঃ) তাঁহাকে পূর্ণ সুরতেহাল জানাইয়াছিলেন।

১৫২। মাত্রারিক্তি ইবাদত প্রশংসনীয় নহে

وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّي أَقُوْلُ: وَاللهِ لَأَصُوْمَنَّ النَّهَارَ، وَلَأَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَنْتَ الَّذِي تَقُوْلُ ذٰلِكَ؟» فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: «فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ»، قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ، قَالَ:

«فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ»، قُلْتُ: فَإِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ ﷺ، وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ»، فَقُلْتُ: فَإِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ»، وَلَأَنْ أَكُوْنَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِيْ وَمَالِيْ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ؟»، قُلْتُ: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ: صُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُوْمَ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: «صُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ»، قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ؟ قَالَ: «نِصْفُ الدَّهْرِ» فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُوْلُ بَعْدَمَا كَبِرَ: يَا لَيْتَنِيْ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ الدَّهْرَ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟»، فَقُلْتُ: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلَمْ أُرِدْ بِذٰلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: «فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ»، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِيْ كُلِّ عِشْرِيْنَ»، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِيْ كُلِّ عَشْرٍ»، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِيْ كُلِّ سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ»، فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ، وَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّكَ يَطُوْلُ بِكَ عُمُرٌ»، قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِيْ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّيْ كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»، وَفِيْ رِوَايَةٍ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ» ثَلَاثًا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ تَعَالٰى صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ تَعَالٰى صَلَاةُ دَاوُدَ: كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقٰى».

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: أَنْكَحَنِيْ أَبِيْ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، وَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ - أَيِ: امْرَأَةَ وَلَدِهِ - فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا، فَتَقُوْلُ لَهُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ. فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: «الْقَنِيْ بِهِ» فَلَقِيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ: «كَيْفَ تَصُوْمُ؟»، قُلْتُ: كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: «وَكَيْفَ تَخْتِمُ»، قُلْتُ: كُلَّ لَيْلَةٍ، وَذَكَرَ

نَحْوَ مَا سَبَقَ - وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبُعَ الَّذِي يَقْرَؤُهُ، يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُوْنَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

كُلُّ هٰذِهِ الرِّوَايَاتِ صَحِيْحَةٌ مُعْظَمُهَا فِيْ الصَّحِيْحَيْنِ وَقَلِيْلٌ مِنْهَا فِيْ أَحَدِهِمَا.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হইল যে, আমি (এই কথা) বলিয়া থাকি– আল্লাহর কসম! যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন অবশ্যই আমি দিনে রোযা রাখিব এবং রাত্রে নামায পড়িব। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নাকি এমন কথা বল? আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত। অবশ্যই আমি তাহা বলিয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি উহা পারিবে না। সুতরাং রোযা রাখ, আবার পানাহার কর। তদ্রূপ নিদ্রা যাও, আবার নফল নামাযেও দাঁড়াও। আর মাসে তিনদিন রোযা রাখ। কারণ একটি নেক কাজে দশগুণ ছাওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং (ছাওয়াবের ক্ষেত্রে) ইহা সারা বৎসর রোযা রাখিবার সমতুল্য হইবে। আমি আরয করিলাম, আমি তো ইহার অধিক সামর্থ্য রাখি। তিনি বলিলেন, তবে একদিন রোযা রাখ আর দুইদিন বে-রোযা থাক। আমি আরয করিলাম, আমি তো ইহার অধিক সামর্থ্য রাখি। তিনি বলিলেন, তবে একদিন রোযা রাখ আর একদিন পানাহার কর। ইহা দাউদ (আঃ)-এর রোযা এবং ইহাই সর্বাধিক ভারসাম্যপূর্ণ রোযা। অন্য বর্ণনায় আছে– ইহা সর্বোত্তম রোযা। আমি আরয করিলাম, আমি তো আরও অধিক সামর্থ্য রাখি। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহার চাইতে উত্তম কোন রোযা নাই। (বৃদ্ধ বয়সে) হযরত আব্দুল্লাহ বলিতেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মত তিনদিনের রোযা কবুল করিয়া লওয়া (এখন) আমার নিকট আমার পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদের চাইতে প্রিয় মনে হয়।

অন্য এক বর্ণনায় (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন) আমাকে কি এই খবর দেওয়া হয় নাই যে, তুমি দিনে রোযা রাখ এবং রাত্রে (জাগিয়া) নামায পড়? আমি আরয করিলাম, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, তুমি (এমন) করিও না। বরং রোযা রাখ আবার রোযা ছাড়িয়া দাও। তদ্রূপ নিদ্রা যাও আবার (নিদ্রা হইতে জাগিয়া) নফল নামাযও পড়। কেননা তোমার উপর তোমার শরীরের হক রহিয়াছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক রহিয়াছে এবং তোমার উপর তোমার মেহমানেরও হক রহিয়াছে। আর প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট। কেননা প্রতিটি নেক আমলের পরিবর্তে তোমার জন্য দশগুণ ছাওয়াব রহিয়াছে। সুতরাং উহা সারা বৎসর রোযা রাখিবার সমতুল্য। কিন্তু তখন আমি (নিজের উপর) কঠোরতা করিলাম। ফলে আমার উপর কঠোরতা করা হইল। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (নিজের মাঝে তিনদিনের অধিক রোযা রাখিবার) শক্তি পাইতেছি। তিনি বলিলেন, (তবে) আল্লাহর নবী দাউদ-এর রোযা রাখ। ইহার অধিক করিও না। আমি আরয করিলাম, দাউদ-এর রোযা কেমন ছিল? তিনি বলিলেন, (একদিন রোযা, একদিন পানাহার–

এইভাবে) অর্ধ বৎসর। বৃদ্ধ হইবার পর হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলিতেন, হায়! যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (প্রদত্ত) অবকাশ গ্রহণ করিতাম!

অন্য এক বর্ণনায় (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,) আমাকে কি এই খবর দেওয়া হয় নাই যে, তুমি সারা বৎসর (প্রতিদিন) রোযা রাখ এবং প্রতি রাত্রে (পূর্ণ এক খতম) কোরআন পড়? আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই। তবে ইহা দ্বারা কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছুর নিয়ত করি নাই। তিনি বলিলেন, তবে আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ)-এর (নিয়মে) রোযা রাখ। কারণ তিনি মানুষের মাঝে সর্বাধিক ইবাদতগুযার ছিলেন। তদ্রূপ প্রতি মাসে (এক খতম) কোরআন পড়। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর নবী! আমি আরও বেশী (তিলাওয়াতের) সামর্থ্য রাখি। তিনি বলিলেন, তবে বিশ দিনে উহা তিলাওয়াত কর। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর নবী! আমি আরও বেশী (তিলাওয়াতের) ক্ষমতা রাখি। তিনি বলিলেন, তবে সাতদিনে এক খতম পড়। ইহার বেশী করিও না। এইভাবে আমি (নিজের উপর) কঠোরতা করিলাম। ফলে আমার উপর কঠোরতা করা হইল। আমাকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছিলেন, তুমি জান না, হয়ত তোমার বয়স দীর্ঘ হইবে। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সেই বয়সে উপনীত হইয়াছি। বার্ধক্যে উপনীত হইবার পর আমার আকাঙক্ষা হইল যে, হায়! যদি আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (প্রদত্ত) অবকাশ গ্রহণ করিতাম!

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তোমার উপর তোমার সন্তানেরও হক রহিয়াছে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে সর্বদা রোযা রাখে সে যেন রোযা রাখেই নাই। ইহা তিনি তিনবার বলিয়াছিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় রোযা হইল দাউদ-এর রোযা এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় নামায হইল দাউদ-এর নামায। তিনি অর্ধেক রাত্র ঘুমাইতেন এবং এক তৃতীয়াংশ নামায পড়িতেন এবং এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাইতেন। তদ্রূপ একদিন রোযা রাখিতেন এবং একদিন পানাহার করিতেন, আর (যুদ্ধে) যখন (শত্রুর) মুখামুখি হইতেন তখন পলায়ন করিতেন না।

অন্য এক বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমার আব্বা আমাকে এক সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের সংগে বিবাহ দিলেন। তিনি তাহার পুত্রবধুর খোঁজ খবর লইতেন এবং তাহাকে তাহার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। আমার স্ত্রী (প্রশংসার আকারে অনুযোগ করিয়া) তাহাকে বলিত, তিনি তো খুবই ভাল মানুষ। এমন ভালো যে, আমি তাহার নিকট আসিবার পর হইতে তিনি আমার বিছানায় আসেন নাই এবং আমার পর্দাও সরান নাই। তাহার সামনে এই অভিযোগ যখন বারংবার হইল তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উহা উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, তাহাকে আমার সংগে দেখা করিতে বল। পরে আমি তাঁহার খিদমতে হাযির হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিভাবে রোযা রাখ? আমি আরয করিলাম, প্রতিদিন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিভাবে (কোরআন) খতম কর? আমি আরয করিলাম, প্রতি রাত্রে। অতঃপর তিনি পূর্বের অনুরূপ বিবরণ দিলেন।

(বৃদ্ধ বয়সে) তিনি তাঁহার পরিবারের কাহাকেও এক সপ্তমাংশ কোরআন শুনাইয়া দিতেন, যাহা তিনি (রাত্রে) পড়িবার ইচ্ছা করিতেন, যেন রাত্রে উহা পড়া তাঁহার জন্য সহজ হয়। আর যখন তিনি শক্তি সঞ্চয় করিতে চাহিতেন তখন (লাগাতার) কয়েকদিন রোযা ছাড়িয়া দিতেন এবং (দিনগুলি) গণনা করিয়া রাখিতেন এবং (পরে) ঐ পরিমাণ রোযা ঐভাবে (লাগাতার) রাখিয়া লইতেন। কেননা যেই অবস্থার উপর তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছেদ গ্রহণ করিয়াছিলেন ঐ অবস্থার কোন কিছু বর্জন করা তিনি অপছন্দ করিতেন।

এই বর্ণনাগুলি সমস্তই বিশুদ্ধ। উহার অধিকাংশ বুখারী ও মুসলিম শরীফে এবং সামান্য অংশ উভয়ের একটিতে বর্ণিত হইয়াছে।

ফায়দা ঃ

(দিনে রোযা রাখিব) অর্থাৎ রোযা রাখিবার বৈধ দিনগুলিতে রোযা রাখিব। কেননা ঈদের দিনগুলিতে রোযা রাখা জায়েয নাই।

(তুমি উহা পারিবে না) অর্থাৎ এখন কোনক্রমে পারিলেও পরবর্তীতে বৃদ্ধ বয়সে পারিবে না। তখন খুব কষ্ট হইবে। আর নিজের জন্য এক রকম ইবাদত নির্ধারণ করিবার পর অক্ষম হইয়া উহা ছাড়িয়া দেওয়া নিন্দনীয়। কেননা ইহা মনিবের খিদমতে নিযুক্ত হইয়া পরে খিদমত ছাড়িয়া দিবার সমতুল্য। কিংবা এমনও হইতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্তমানে না পারিবার কথাই বলিয়াছেন। কেননা হয়ত তিনি জানিতেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) ভীষণ কষ্ট করিয়া ইবাদত করিতেছিলেন। ফলে তাঁহার শরীর স্বাস্থ্য এমন পর্যায়ে উপনীত হইতেছিল যাহার কারণে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতেছিল না।

(রোযা রাখ আবার পানাহার কর।) ইহার ব্যাখ্যা হিসাবে পরে বলা হইয়াছে যে, মাসের তিনদিন রোযা রাখ আর অবশিষ্ট সাতাশ বা ছাব্বিশ দিন পানাহার কর।

(সারা বৎসর রোযা রাখিবার) অর্থাৎ প্রতি মাসের তিনদিন রোযার বর্ধিত ছাওয়াব সারা বৎসর রোযা রাখিবার মূল ছাওয়াবের সমান হইবে। এই কথার অর্থ ইহা নহে যে, উহা সারা বৎসরের রোযার বর্ধিত ছাওয়াবেরও সমতুল্য হইবে। কেননা তখন অল্প আমলের ছাওয়াব বেশী আমলের ছাওয়াবের সমতুল্য হওয়া অনিবার্য হয়, যাহা শরীয়তের নিয়মের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে। ফাতহুল বারী কিতাবে বলা হইয়াছে যে, তদুপরি মাসের তিনদিন রোযা পালনকারীকে মূল ছাওয়াব হিসাবে রূপক অর্থে বলা যায় যে, সে সারা বৎসর রোযা রাখিয়াছে।

(ইহার চাইতে বেশী ক্ষমতা রাখি) অর্থাৎ আরও বেশী রোযা রাখিয়া আরও বর্ধিত ছাওয়াব লাভের ক্ষমতা রাখি। কেননা তিনদিনে ত্রিশদিনের ছাওয়াব হইলে দশদিনে তো একশত দিনের ছাওয়াব হইবে। সুতরাং সাধ্য থাকিতে উহা হইতে বঞ্চিত হইব কেন?

(একদিন রোযা রাখ, একদিন পানাহার কর) অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রতি মাসের তিনদিন (রোযা) কি তোমার জন্য যথেষ্ট নহে? আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আরও বাড়াইয়া দিন) তিনি বলিলেন, (মাসে)

পাঁচদিন (রোযা রাখ)। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আরও বাড়াইয়া দিন) তিনি বলিলেন, সাত দিন। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, নয় দিন। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, এগার দিন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলিলেন, দাউদের রোযার উপর কোন রোযা নাই। (আর উহা হইল) সময়ের অর্ধেক (অর্থাৎ) একদিন রোযা, একদিন পানাহার।

এই বর্ণনা প্রমাণ করে যে, রোযার সংখ্যাবৃদ্ধির বিষয়টি ক্রমান্বয়ে হইয়াছে এবং সর্বশেষে হযরত দাউদ (আঃ)-এর রোযায় উপনীত হইয়াছে। সম্ভবতঃ অন্যান্য বর্ণনায় সংক্ষেপণ করা হইয়াছে।

(হযরত দাউদ ('আঃ)-এর রোযা হইল সর্বাধিক ভারসাম্যপূর্ণ রোযা) কেননা একদিন রোযার কারণে যে ক্লান্তি ও দুর্বলতা দেখা দিবে তাহা পরবর্তী দিনের পানাহারে বিদূরিত হইবে এবং পরবর্তী দিন নতুন উদ্যমে রোযা রাখা সম্ভব হইবে। ফলে রোযা রাখিবার এই আমল স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে।

ইহার রহস্য এই যে, প্রতিদিন রোযা রাখিবার কারণে কোন ফরয হক নষ্ট হইতে পারে; তখন উহা হারাম হইবে। কিংবা রোযার চাইতে বড় কোন নফল আমল নষ্ট হইতে পারে; তখন উহা মাকরূহ হইবে। কিংবা কোন আমল নষ্ট নাও হইতে পারে। কেননা অভ্যাসের দ্বারা কঠিন কাজও সহনীয় হইয়া যায়, তখন উহা মুবাহ বা জায়েয হইবে। পক্ষান্তরে একদিন রোযা ও একদিন পানাহারে এই ধরনের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ইহাই উত্তম সূরত।

(ইহার চাইতে উত্তম রোযা নাই।) কাহারও কাহারও মতে ইহা শুধু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-এর বেলায় ছিল। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহীর মাধ্যমে জানিতেন যে, তিনি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হইবেন এবং দুর্বলতাগ্রস্ত হইয়া পড়িবেন। তখন তাঁহার জন্য লাগাতার রোযা কষ্টকর হইবে। তাহাদের দলীল এই যে, হযরত হামযা বিন আমর (রাঃ)-কে লাগাতার রোযা হইতে নিষেধ করা হয় নাই। অথচ ছাওমে দাউদ সকলের জন্য উত্তম হইলে তাঁহাকেও একই উপদেশ দেওয়া হইত।

কিন্তু احب الصيام الى الله صيام داؤد (আল্লাহর নিকট প্রিয়তম রোযা হইল দাউদ (আঃ)-এর রোযা) এই বর্ণনা প্রমাণ করে যে, সার্বিকভাবেই ইহা সর্বোত্তম রোযা।

(বৃদ্ধ বয়সে তিনি বলিতেন,) এই আকাঙ্ক্ষা করা সত্ত্বেও আমল তিনি ত্যাগ করেন নাই। শুধু এতটুকু করিয়াছেন যে, দুর্বলতার কারণে কয়েকদিন রোযা না রাখিতে পারিলে পরে লাগাতার রোযা রাখিয়া উহা পুরা করিয়া লইতেন।

(হক রহিয়াছে) শরীরের হক এই যে, উহাতে এতটা শক্তি অক্ষুণ্ন রাখিতে হইবে যাহাতে নিয়মিতভাবে যাবতীয় আমল ও দায়িত্ব আদায় করিতে পারে।

চোখের হক হইল এই পরিমাণ নিদ্রা যাহাতে অনিদ্রার ক্লান্তি ও আচ্ছন্নতা কাটিয়া যায়।

স্ত্রীর হক এই যে, সহবাসের শক্তি ও সামর্থ্য অক্ষুণ্ন রাখিতে হইবে এবং তাহার প্রতি আদর সোহাগের জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করিতে হইবে।

মেহমানের হক এই যে, তাহার প্রয়োজনীয় খিদমত করিতে হইবে। প্রথম দিন বিশেষ খাবার এবং পরবর্তী দুইদিন সাধারণ খাবারের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং দস্তরখানে তাহাকে সংগ দিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে হইবে।

(সময়ের অর্ধেক) অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক। কেননা ঈদের দিনগুলি পানাহার দিবসের সংগে অতিরিক্ত যুক্ত হইবে।

(কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছুর নিয়ত করি নাই।) অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার পক্ষ হইতে ছাওয়াব লাভ করা এবং আবদিয়াত ও বন্দেগীর চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটানো এবং আল্লাহর রাবুবিয়াতের হক আদায় করা ছাড়া অন্য কিছুর নিয়ত করি নাই।

(সে যেন রোযা রাখেই নাই) ইহা অপ্রসন্নতা প্রকাশের অর্থে হইতে পারে। কিংবা এই অর্থে হইতে পারে যে, সে ছাওয়াব পাইবে না। কেননা শরীয়তের নির্দেশিত তরীকা অনুযায়ী সে রোযা রাখে নাই।

(পুত্র বধুর খোঁজ খবর লইতেন) মা বাবার উচিত হিকমতের সহিত পুত্রবধুর খোঁজ খবর লওয়া (বিশেষতঃ নূতন অবস্থায়) যে, তাহার কোন অসুবিধা হইতেছে কি না। কোন অসুবিধার কথা জানা গেলে পূর্ণ সহানুভূতির সহিত উহা দূর করিতে হইবে। অসুবিধা পুত্রের পক্ষ হইতে হইলে তাহাকে শান্তভাবে বুঝাইয়া স্ত্রীর হক আদায়ে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। যাহাতে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সৃষ্টি না হইতে পারে।

মনে রাখিতে হইবে যে, একটি মেয়ে সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশে একেবারে অপরিচিত লোকদের মাঝে এক নূতন জীবন শুরু করিবার জন্য আসিয়াছে। তাহার সুবিধা অসুবিধার কথা জানাইবার মত কেহ নাই। এই সময় সামান্য সহানুভূতি ও হামদর্দী জখমী হৃদয়ে মলমের মত কাজ করিবে। তাহার অন্তর হইতে দু'আ আসিবে। এই কথা ভাবিতে হইবে যে, আমার কন্যার সহিত তাহার শশুর শাশুড়ী কিরূপ আচরণ করিলে আমি খুশী হইব। আমাকেও আমার পুত্রবধুর সহিত অনুরূপ আচরণ করিতে হইবে।

প্রসংগত পুত্রবধুকেও কিছু বলিতে হয়। তাহাকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, তাহার স্বামী মা বাবার হক ঠিকমত আদায় করিতেছে কি না। নূতন জীবনের মোহে মা-বাবার কথা ভুলিয়া যাইতেছে কি না। যদি এমন হয় তবে শান্তভাবে স্বামীকে মা বাবার হক আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, আমিও একদিন মা হইব। আমার পুত্রও একদিন বিবাহ করিবে এবং অন্য মেয়ের অধিকারে চলিয়া যাইবে। তখন আমি আমার পুত্রের নিকট হইতে কিরূপ আচরণ আশা করি। সেই আচরণ আমাকেও এখন আমার শশুর শাশুড়ীর সহিত করিতে হইবে।

মোটকথা সহানুভূতি ও সহনশীলতা এবং ছবর ও শোকর প্রকাশের দ্বারা আমাদের সমাজের বহু পারিবারিক অশান্তি দূর হইতে পারে। কিন্তু আল্লাহর ভয় ছাড়া এই মনোভাব আসিতে পারে না। সেই ভয় আল্লাহ প্রত্যেক মুমিন নরনারীর অন্তরে পয়দা করিয়া দিন। আমীন।

(পর্দা সরান নাই) অর্থাৎ স্ত্রীসহবাস করেন নাই। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, লজ্জার বিষয়গুলি আকারে ইংগিতে প্রকাশ করাই আদব।

হাদীছের শিক্ষা ঃ আসল ইবাদত হইল প্রত্যেকের হক যথাযথভাবে আদায় করা। আল্লাহর হক যেমন আদায় করিবে তেমনি নফসের হক, স্ত্রী-পুত্রের হক ও অন্যান্যদের হকও আদায় করিতে হইবে।

১। (বিশেষতঃ নূতন অবস্থায়) পুত্র বধুর সুবিধা অসুবিধার খোঁজ খবর লওয়া শ্বশুর শাশুড়ীর নৈতিক কর্তব্য।

২। স্বামীর পক্ষ হইতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইলে হিকমতের সহিত মুরুব্বীদিগকে অবস্থা জানানো যাইতে পারে।

৩। লজ্জার কথা সরাসরি না বলিয়া আকারে ইংগিতে বলা উত্তম।

১৫৩। নিজের ঈমান সম্পর্কে সদা সর্তক থাকিবার নমুনা

وَعَنْ اَبِيْ رِبْعِيٍّ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاُسَيِّدِيِّ الْكَاتِبِ اَحد كُتَّابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: لَقِيَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: كَيْفَ اَنْتَ يَا حَنْظَلَةَ؟ قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ ! قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ مَا تَقُوْلُ؟! قُلْتُ: نَكُوْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ كَاَنَّا رَاْيَ عَيْنٍ ، فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَافَسْنَا الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا. قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَوَاللهِ اِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هٰذَا، فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ نَكُوْنُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَاَنَّا رَاْيَ الْعَيْنِ، فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلٰى مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِيْ وَفِيْ الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى فُرُشِكُمْ وَفِيْ طُرُقِكُمْ، وَلٰكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

قَوْلُهٗ: «رِبْعِيٌّ» بِكَسْرِ الرَّاءِ. «وَالْاُسَيِّدِيُّ» بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ السِّيْنِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ مَكْسُوْرَةٌ مُشَدَّدَةٌ. وَقَوْلُهٗ: «عَافَسْنَا» هُوَ بِالْعَيْنِ وَالسِّيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ، اَيْ: عَالَجْنَا وَلَاعَبْنَا. «وَالضَّيْعَاتُ»: الْمَعَايِشُ.

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম কাতিব হযরত হানযালা বিন রাবী আল উসায়দী (রাঃ) বলেন, (পথে একদিন) আবু বকর (রাঃ)-এর সহিত আমার দেখা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ হে হানযালা! আমি বলিলাম, হানযালা তো মুনাফিক হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! কি বলিতেছ? আমি বলিলাম, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে থাকি আর তিনি আমাদিগকে জান্নাত জাহান্নামের কথা বলেন, তখন মনে হয় যেন উহা আমাদের চোখের সামনে। কিন্তু যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিস হইতে

বাহির হইয়া স্ত্রী, সন্তান ও কাজকারবারের ঝামেলায় লিপ্ত হই তখন অনেক কিছুই ভুলিয়া যাই।

আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমাদের অবস্থাও তো এই রকম। তখন আমি ও আবু বকর রওয়ানা হইয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইলাম। আমি আরয করিলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! হানযালা তো মুনাফিক হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহার কি অর্থ? আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যখন আপনার নিকট থাকি এবং আপনি আমাদিগকে জান্নাত জাহান্নামের কথা বলেন, তখন উহা যেন আমাদের চোখের সামনে থাকে। কিন্তু যখন আপনার নিকট হইতে বাহির হই এবং স্ত্রী-পুত্র ও কাজ কারবারের ঝামেলায় লিপ্ত হই তখন অনেক কিছুই ভুলিয়া যাই। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ সত্তার কসম! যাঁহার হাতে আমার প্রাণ। যদি তোমরা আমার নিকট থাকাকালীন (আধ্যাত্মিক) অবস্থার উপর এবং আল্লাহর যিকির (ও স্মরণের) উপর সর্বদা বহাল থাকিতে তবে ফিরিশতাগণ তোমাদের বিছানায় এবং তোমাদের পথে ঘাটে তোমাদের সংগে মুছাফাহা করিতেন। কিন্তু! হে হানযালা! (এমন অবস্থা) মাঝে মধ্যেই হইয়া থাকে। (সর্বদা হয় না) ইহা তিনবার বলিলেন। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(অন্যতম কাতিব) যে সকল ছাহাবা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অহী লিখিবার এবং প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লিখিবার মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন তাঁহাদের একটি তালিকা হযরত ইবনে সাইয়েদিন্নাস আল ইয়ামুরী (রহঃ) তাঁহার সিরাত গ্রন্থে পেশ করিয়াছেন। যথা–

১। হযরত আবু বকর (রাঃ) ২। হযরত ওমর (রাঃ) ৩। হযরত উছমান (রাঃ) ৪। হযরত আলী (রাঃ) ৫। হযরত 'আমীর বিন ফোহায়রা (রাঃ) ৬। হযরত খালিদ বিন সাঈদ বিন 'আছ (রাঃ) ৭। হযরত আবান বিন সা'ঈদ বিন 'আছ (রাঃ) ৮। হযরত হানযালা বিন রাবী আল উসায়দী (রাঃ) ৯। হযরত উবাই বিন কা'আব (রাঃ) (আনসারীগণের মাঝে তিনিই এই দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রথম ব্যক্তি।) ১০। ছাবিত বিন কায়স বিন শামাস (রাঃ) ১১। হযরত যায়দ বিন ছাবিত (রাঃ) ১২। হযরত শোরাহবীল বিন হাসানাহ (রাঃ) ১৩। হযরত মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) ১৪। হযরত মুগীরাহ বিন শোবা (রাঃ) ১৫। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়দ (রাঃ) ১৬। হযরত জোরায়ম বিন ছালত (রাঃ) ১৬। হযরত যোবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ) ১৮। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) ১৯। হযরত 'আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ) ২০। হযরত 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) ২১। হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) ২২। হযরত মুহম্মদ বিন সালামা (রাঃ) ২৩। হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন উবাই (রাঃ) ২৪। হযরত মু'আইকীব বিন আবী ফাতিমা (রাঃ) ২৫। হযরত আব্দুল্লাহ বিন সা'আদ বিন সাবাহ আল 'আমেরী (রাঃ) (কোরায়শের মাঝে ইনিই অহী লেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রথম ব্যক্তি। এক সময় তিনি ইসলাম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছিল–

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا *

ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালিম কে হইতে পারে, যে আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে?

অতঃপর মক্কা বিজয়ের সময় তিনি পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁহার আর কোন দোষ দেখা যায় নাই। সিজদার অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। (সুবহানাল্লাহ!)

২৬। হযরত তালহা (রাঃ) ২৭। হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) ২৮। হযরত আরকাম বিন আবুল আরকাম (রাঃ) ২৯। হযরত যুহরী (রাঃ) ৩০। হযরত আলা বিন উকবা (রাঃ) ৩১। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) ৩২। হযরত খালিদ বিন যায়দ (রাঃ) ৩৩। হযরত বোরায়দা বিন হাছীব (রাঃ) ৩৪। হযরত হোছায়ন বিন নোমায়র (রাঃ) ৩৫। হযরত আবু সালামা আল মাখযূমী (রাঃ) ৩৬। হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুল আসাদ (রাঃ) ৩৭। হযরত হোয়াইতিব বিন 'আব্দুল উযযা (রাঃ) ৩৮। হযরত আবু সুফয়ান বিন হারব (রাঃ) ৩৯। হযরত হাতিব বিন 'আমর (রাঃ)।

(হানযালা মুনাফিক হইয়া গিয়াছে) বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি মসজিদে নববী হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রী সন্তানদের সংগে খোশগল্পে লিপ্ত হইলেন। হঠাৎ তিনি খেয়াল করিয়া দেখেন যে, একটু পূর্বে মসজিদে নববীতে থাকা অবস্থায় তাঁহার যেমন আখিরাতের চিন্তা ও জান্নাত জাহান্নামের ভাবনা বিদ্যমান ছিল উহা এখন আর নাই। মনের এই অবস্থা-বৈপরীত্য অনুভব করিয়া তিনি পেরেশান হইয়া গেলেন। তাঁহার ভয় হইল যে, অবস্থা- বৈপরীত্য তো মুনাফেকির লক্ষণ।

মনের এই পেরেশান অবস্থা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পেশ করিবার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার পেরেশান ভাব দেখিয়াই কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

সুবহানাল্লাহ! এই ছিল ছাহাবা কেরামের ঈমানী হালত। ঈমানের এমন উচ্চস্তরে সমাসীন হইয়াও সর্বদা তাঁহারা ভয়ে ভয়ে কাটাইতেন যে, কোন্ মুহূর্তে কিভাবে ঈমানের মধ্যে নোকসান আসিয়া পড়ে। অথচ আমাদের অবস্থা তো এই যে, বড় বড় কবীরা গোনাহ করিয়াও নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকি। ঈমানের ফিকির করি না। তাওবার চিন্তাও মনে আসে না। আল্লাহ আমাদের অবস্থার পরিবর্তন করুন এবং ছাহাবা কেরামের ঈমানের চিন্তা ও কলবের নূরাণী হালাতের সামান্য হিসসা আমাদের মত অপদার্থদিগকেও দান করুন। আমীন।

বলাবাহুল্য যে, হযরত হানযালা (রাঃ)-এর মনের অবস্থার ভিন্নতার সহিত মুনাফেকীর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই। কেননা ঈমানের ক্ষেত্রে মুনাফেকী অর্থ অন্তরে কুফুরি পোষণ করিয়া প্রকাশ্যে নিজেকে মুসলমান দাবী করা। আর আমলের ক্ষেত্রে মুনাফেকী অর্থ গোপনে গোপনে পাপাচারে লিপ্ত থাকিয়া বাহিরে সাধুতা প্রকাশ করা। আর তিনি তো এই উভয় অবস্থা হইতেই মুক্ত ছিলেন।

হযরত হানযালা (এবং সকল ছাহাবা কেরাম) তো উভয় অবস্থা হইতেই পবিত্র ছিলেন।

(তবে ফিরিশতাগণ তোমাদের সহিত মুছাফাহা করিতেন।) হযরত আবু বকর (রাঃ) উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও মনের এই অবস্থা-বৈপরীত্য হইতে মুক্ত ছিলেন না। সুতরাং

বোঝা গেল যে, ইহা হইতে মুক্ত থাকা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে। তাই ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এই মানব জাতিকে আল্লাহ পাক ফিরিশতাগণের স্বভাব এবং শয়তানদের স্বভাবের মধ্যবর্তী স্বভাব দান করিয়াছেন। ফিরিশতাগণের মধ্যে মন্দ কাজ করিবার কোন যোগ্যতাই রাখা হয় নাই। তদ্রূপ শয়তানদের স্বভাবে নেক কাজের কোন যোগ্যতাই রাখা হয় নাই। পক্ষান্তরে মানুষকে আল্লাহ পাক ভিন্নমুখী স্বভাব দান করিয়াছেন এবং তাহার আধ্যাত্মিক উচ্চ চিন্তার মাঝে জোয়ার ভাটা দান করিয়াছেন। এই দিকে ইংগিত করিয়াই বলা হইয়াছে– কিন্তু হে হানযালা! এই অবস্থা মাঝে মধ্যেই হইয়া থাকে।

হযরত আবু যর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে বলা হইয়াছে, জ্ঞানী ব্যক্তির সময় কয়েক প্রকার হওয়া উচিত। কিছু সময় সে আপন প্রতিপালকের সহিত মনের কথা বলিবে। কিছু সময় সে আত্মবিচার করিবে। কিছু সময় সে তাহার প্রতি আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের কথা চিন্তা করিবে। আর কিছু সময় পানাহার ও অন্যান্য কাজে ব্যয় করিবে।

বস্তুতঃ ইহাই হইল আবদিয়াতের পূর্ণতা। ইহা ছাড়া আর যাহা কিছু তাহা নিছক গোমরাহি ও ভ্রান্তি।

ফিরিশতাগণের মুছাফাহার কারণ এই যে, হাদীছে উল্লেখিত দুইটি অবস্থা অর্থাৎ জান্নাত জাহান্নামের মোশাহাদা ও আল্লাহর যিকির এবং এতদুভয়ের সার্বক্ষণিকতা ও স্থায়িত্ব যদি কোন মানুযের মাঝে হাছিল হইত তবে ফিরিশতা–স্বভাবের সহিত তাহার অভিন্নতা সম্পন্ন হইত। ফলে ফিরিশতাগণ অন্তরংগতার প্রকাশ স্বরূপ তাহার সহিত মুছাফাহা করিতেন।

হাদীছের শিক্ষা ঃ নিজের ঈমান একীন, ও আমল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকা মুমিনের শান নহে। বরং এই বিষয়ে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং কোরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে যে, উহাতে কোন খুঁত বা দুর্বলতা আসিল কি না। এইরূপ কিছু দেখা গেলে সংগে সংগে সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। তবে অন্তরের আখিরাত-চিন্তার হ্রাস-বৃদ্ধি একান্ত স্বাভাবিক। এই জন্য পেরেশান হইবার প্রয়োজন নাই।

১৫৪। অর্থহীন মুজাহাদা ইবাদত নহে

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا: اَبُوْ إِسْرَائِيْلَ نَذَرَ اَنْ يَّقُوْمَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ ، وَيَصُوْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোতবা দিতেছিলেন। এমন সময় একজন লোককে তিনি দাঁড়াইয়া থাকা অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, তখন তাহার (পরিচয় ও দাঁড়াইয়া থাকিবার কারণ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকেরা আরয করিল, ইনি আবু ইসরাঈল। ইনি মান্নত করিয়াছেন যে, সর্বদা রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। বসিবেন না। ছায়াও গ্রহণ করিবেন না। এমন কি কাহারও সংগে কথাও বলিবেন না। বরং রোযা অবস্থায় থাকিবেন। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে বল, সে যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে এবং বসে আর রোযা পূর্ণ করে। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

(সে যেন কথা বলে) কেননা নিরবতা অবলম্বন করা পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য ইবাদত হইলেও আমাদের শরীয়তে উহা ইবাদত নহে। তদ্রূপ নামায ছাড়া এবং আরাফাতের মাঠে দু'আর সময় ছাড়া অন্য সময় দাঁড়াইয়া থাকা ইবাদত নহে। তদ্রূপ ছায়া আল্লাহর নিয়ামত। সুতরাং বিনা কারণে উহা গ্রহণ না করা ইবাদত তো নহেই বরং নিয়ামতের প্রতি অনাগ্রহের প্রকাশ।

আল্লামা ইবনে রজব (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোন আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে চাহিবে এবং সাধনা ও মুজাহাদায় লিপ্ত হইবে যাহা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল বলেন নাই তাহার আমল বাতিল ও মরদূদ বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থহীন কষ্ট এবং আত্মনিপীড়ন ইসলামে জায়েয নাই। আল্লাহর নৈকট্য হাছিল হইবে একমাত্র সুন্নতের অনুসরণ অনুকরণ দ্বারা। সুতরাং যে কোন আমল করিবার সময় প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, কোরআন সুন্নায় উহার অনুমোদন আছে কি না। কোরআন ও সুন্নাহ বহির্ভূত সকল আমলই বিদ'আত। ছাওয়াবের পরিবর্তে উহা আযাবের কারণ হইবে। হাদীছ শরীফে আছে–

كل بدعة ضلالة و كل ضلالة فى النار *

বিদ'আত মাত্রই গোমরাহী এবং গোমরাহী মাত্রই জাহান্নামের বস্তু।

হাদীছের শিক্ষা ঃ আত্মসংশোধনের জন্য মেহনত মুজাহাদা করা অতীব জরুরী। কিন্তু উহার তরীকা নিজে উদ্ভাবন করা ক্ষতিকর। হক্কানী পীর ও শায়খের তত্ত্বাবধানেই উহা করিতে হইবে, যেন উহা শরীয়তসম্মত হয়। অন্যথায় হিতে বিপরীত হইবে।

অধ্যায় – ১৫

আমলের ইহতিমাম ও অলসতা পরিহার

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে চরম পন্থা অবলম্বন ও অযথা আত্মনিপীড়ন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং প্রতিটি আয়াত ও হাদীছ দ্বারা ইবাদতের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। আলোচ্য অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হইল মধ্যম পন্থা অনুসারে কৃত আমলগুলি যত্ন ও ইহতিমামের সহিত নিয়মিত পালনে উদ্বুদ্ধ করা।

আয়াতসমূহ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لَا يَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ *

যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য এখনও কি সেই সময় আসে নাই যে, তাহাদের কলব আল্লাহর যিকর দ্বারা এবং যে সত্য তাহাদের উপর নাযিল হইয়াছে উহা দ্বারা বিগলিত হইবে এবং তাহারা ঐ লোকদের মত হইবে না যাহাদিগকে ইতিপূর্বে কিতাব দান করা হইয়াছে। অতঃপর তাহাদের উপর একটি দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। ফলে তাহাদের কলব কঠিন হইয়া গিয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَ قَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ وَ جَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّ رَحْمَةً وَ رَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا *

আর আমি মরয়ম-পুত্র ঈসাকে পশ্চাতে প্রেরণ করিলাম এবং তাহাকে ইঞ্জিল দান করিলাম। আর যাহারা তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের অন্তরে দয়া ও করুণা সৃষ্টি করিলাম। আর রাহবানিয়াত (তথা বৈরাগ্যবাদ) তাহারা নিজেরা উদ্ভাবন করিয়াছে। আমি উহা তাহাদের উপর ফরয করি নাই। কিন্তু তাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মানসে (নিজেরাই উহা নিজেদের উপর আরোপ করিয়াছে।) অতঃপর তাহারা উহারও পূর্ণ হক আদায় করে নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا *

আর তোমরা ঐ স্ত্রীলোকের মত হইও না যে শক্তি ব্যয় করিয়া (সুতা কাটিবার পর) কর্তিত সুতা টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়াছে। ৬/৩৯

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ *

আর মৃত্যু তোমার সামনে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি আপন প্রতিপালকের ইবাদত কর।

ফায়দা ঃ

(রাহবানিয়াত) অর্থ নারীসংগ বর্জন ও ইবাদতখানায় নির্জনবাস। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাহারা আল্লাহ নির্দেশিত পথে না চলিয়া নিজেরাই বৈরাগ্যবাদের কঠোর পন্থা উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু পরে উহার উপরও পূর্ণভাবে চলিতে পারে নাই।

(ঐ স্ত্রীলোকের মত) মক্কায় 'রীতাহ' বিনতে সা'আদ নাম্নী এক বোকা স্ত্রীলোক ছিল। সে সারা দিন সুতা কাটিত, কিন্তু সন্ধ্যার সময় ঐগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিত। তাফসীরে খাযিন কিতাবে বলা হইয়াছে, আয়াতের অর্থ এই যে, এই স্ত্রীলোকটি কাজ হইতে বিরত থাকিত না। সারা দিন কাজ করিতেই থাকিত। কিন্তু কাজ করিবার পর সে নিজের হাতে নিজের কাজ নষ্ট করা হইতে বিরত থাকিত না। তদ্রূপ ঐ ব্যক্তির অবস্থা যে প্রতিশ্রুতি ভংগ করে। প্রতিশ্রুতি দান করা হইতে বিরতও থাকে না আবার প্রতিশ্রুতি দান করিবার পর উহা পূর্ণও করে না। বরং নিজেই উহা ভংগ করে। তোমরা তেমন হইও না। বরং যাবতীয় ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া চলিও। বিশেষতঃ রূহের জগতে আমার রাবুবিয়াত স্বীকার করিয়া আবদিয়াত ও বন্দেগীর যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছ উহা পূর্ণরূপে পালন করিও।

হাদীছসমূহ

১৫৫। নিয়মিত আমলের ফযীলত

وَأَمَّا الْأَحَادِيْثُ؛ فَمِنْهَا حَدِيْثُ عَائِشَةَ: وَكَانَ أَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ. وَقَدْ سَبَقَ فِيْ الْبَابِ قَبْلَهُ

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে– আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল উহা যাহার উপর উহার আমলকারী অবিচল থাকে (সর্বদা আমল করে।)

(এই হাদীছ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে)

১৫৬। দিনে তাহাজ্জুদের কাযা আদায় করা

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার রাত্রের অযীফা না পড়িয়া কিংবা আংশিক পড়িয়া ঘুমাইয়া যায়। অতঃপর সে তাহা ফজরের নামায ও যুহরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে

পড়িয়া লয় তাহার জন্য (ঐ পরিমাণ ছাওয়াবই) লেখা হয় যেন সে উহা রাত্রেই পড়িয়াছে। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

হাদীছে حزب শব্দটি আসিয়াছে। ইহার মতলব হইল নামায, রোযা বা যে কোন আমল যাহা মানুষ নিয়মিত পালন করিবে বলিয়া নিজের জন্য নির্ধারণ করিয়া লয়।

সুতরাং তাহাজ্জুদের নামায ছুটিয়া যাইবার পর উক্ত সময়ে উহা কাযা করিলে একই ছাওয়াব পাওয়া যাইবে।

তবে কাহারও কাহারও মতে ইহাতে তাহাজ্জুদের মূল ছাওয়াব শুধু পাওয়া যাইবে। বর্ধিত ছাওয়াব ও ফযীলত হাছিল হইবে না। কেননা ঘুমের আরাম বর্জন করিয়া রাত্রির নির্জন মুহূর্তের ইবাদত অতি উত্তম। কিন্তু হাদীছের স্বাভাবিক দাবী ইহাই যে, তাহার নিয়তের বিশুদ্ধতা এবং আন্তরিক অনুতাপের কারণে বর্ধিত ছাওয়াব ও পূর্ণ ফযীলতই সে লাভ করিবে।

তবে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলিয়াছেন, এই ফযীলত তখনই হাছিল হইবে যখন ঘুমের চাপের কারণে কিংবা অন্য কোন ওযরের কারণে ছুটিয়া যায়; অথচ তাহার নিয়ত ছিল আদায় করিবার।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছে যাবতীয় নির্ধারিত ওযীফা যত্নের সহিত নিয়মিত পালনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে।

হাদীছের শিক্ষা ঃ মুমিনের কর্তব্য হইল নিজের জন্য কিছু নফল আমল ও যিকির নিয়মিত অযীফা রূপে নির্ধারণ করিয়া লওয়া। অতঃপর উহা নিয়মিত পালন করা।

১৫৭। নিয়মিত তাহাজ্জুদের গুরুত্ব

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুকের মত হইও না, সে কিয়ামুল্লাইল করিত (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায পড়িত।) (কিন্তু) পরে কিয়ামুল্লাইল ছাড়িয়া দিয়াছে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(অমুকের মত হইও না।) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, কোন সূত্রেই উক্ত ব্যক্তির নাম আমি জানিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ লোকটির দোষ গোপনের উদ্দেশ্যেই তাহার নাম উহ্য রাখা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, এই ধরনের ক্ষেত্রে নাম তালাশ করিতে যাওয়া উচিতও নহে।

এমনও হইতে পারে যে, নির্দিষ্ট কোন লোক এখানে উদ্দেশ্য নহে। বরং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর সামনে বিষয়টির নিন্দনীয় রূপ তুলিয়া ধরিবার জন্য একটি উদাহরণ কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র।

ইবনে হাজার (রহঃ) আরও বলেন, এই হাদীছ হইতে বুঝা যায় যে, কোন ইবাদত শুরু করিবার পর উহা বন্ধ করা নিন্দনীয়। যদিও উহা ওয়াজিব না হয়। কেননা ইহার অর্থ হইল বাদশাহর দরবারে কয়েকদিন হাযিরা দিবার পর হঠাৎ করিয়া গায়েব হইয়া যাওয়া। তবে কখনো এইরূপ গাফলত দেখা দিলে পুনরায় আমল শুরু করিয়া দিতে হইবে। শয়তান যেন এমন ধোকা না দেয় যে, বার বার ছুটিয়া যাইতেছে; ইহা বড় লজ্জার কথা। আমার দ্বারা যখন নিয়মিত করা সম্ভব হইতেছে না তখন উহা বন্ধ রাখাই উত্তম। না বরং এই বলিয়া মাওলার দরবারে পুনরায় উক্ত আমলসহ হাযির হইবে যে, ওগো দয়াময় মাওলা! নফস ও শয়তানের ধোকায় পড়িয়া, গাফলতের শিকার হইয়া তোমার শাহী দরবার হইতে মাহরূম হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু এই দেখ নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়া আবার তোমার দরবারে ফিরিয়া আসিয়াছি। মেহেরবানী করিয়া পুনরায় আমাকে কবুল করিয়া লও এবং স্থায়িত্বের তাওফিক দান কর।

১৫৮। তাহাজ্জুদের গুরুত্ব

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত 'আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাত্রের নামায যদি ব্যথা বা অন্য কোন কারণে বাদ পড়িয়া যাইত তবে তিনি দিনে (উহার পরিবর্তে) বার রাকআত পড়িয়া লইতেন। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইবনে হাজার (রহঃ) বলিয়াছেন, দিনে বিশ রাকাত পড়িয়া লওয়া রাত্রের তাহাজ্জুদের কাজা হিসাবে ছিল না। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদের রাক'আত সংখ্যা আরও কম ছিল। আর কাযা মূল নামাযের চাইতে সংখ্যায় অধিক হইতে পারে না। বরং ইহা ছিল তাহাজ্জুদের ফযীলতের ক্ষতিপূরণ হিসাবে। নফল বা সুন্নত শুরু করিবার পর ভংগ করিলে তো কাযা করা ওয়াজিব। তবে তরক করিবার পর কাযা করা জরুরী নহে। অবশ্য আবু দাউদ শরীফের নিম্নবর্ণিত হাদীছ দ্বারা নফল ও সুন্নতের কাযা করিবার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

من نام عن وتره او سننه فليصل اذا ذكره *

কেহ যদি বিতির বা সুন্নত না পড়িয়া ঘুমাইয়া যায়। সে যেন যখন স্মরণ হয় তখন উহা পড়িয়া লয়।

হাদীছের শিক্ষা ঃ আলোচ্য হাদীছ দ্বারাও নিয়মিত আমল করিবার এবং নিয়মিতি বজায় রাখিবার গুরুত্ব প্রমাণিত হইতেছে। আমাদের মত অপদার্থরা টুটা-ফাটা আমল যাহাই

করিতেছি তাহা যেন আল্লাহ কবুল করেন এবং আরও অধিক আমল করিবার তাওফীক দান করেন। আমলের হক আদায় করিবার এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে আমল করিয়া যাইবার তাওফীক দান করেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

অধ্যায় – ১৬

সুন্নাত ও তাহার আদবসমূহ নিষ্ঠার সহিত পালন

আরবী سنة শব্দের আভিধানিক অর্থ পথ, পন্থা ও তরীকা, ফিকাহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায় সুন্নাত অর্থ ইসলামী আহকামের স্তরবিশেষ। যথা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও মুবাহ।

পক্ষান্তরে শরীয়তের সামগ্রিক পরিভাষায় সুন্নাত বা সুন্নাহ অর্থ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত তরীকা ও জীবনপদ্ধতি, যাহা তিনি তাঁহার কথা , কাজ ও অবস্থা দ্বারা কিংবা অন্যের কথা, কাজ বা অবস্থা অনুমোদনের মাধ্যমে দুনিয়াতে রাখিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সুন্নাহ বা জীবন-পদ্ধতির উপরই উম্মতের জীবন গড়িয়া উঠিতে হইবে। তবেই দ্বীন ও দুনিয়ার সফলতা নিশ্চিত হইবে। অন্যথায় গোমরাহী ও ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, বর্তমান যুগে পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিম উম্মাহর যত অধঃপতন ও অপদস্থতা, উহার মূল হইল সুন্নাহ বা নবীর তরীকা হইতে বিচ্যুতি। আমাদের ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রীয়জীবনে কোথাও নবীর তরীকা বা সুন্নাত নাই। চলা-ফেরা, বিবাহ-শাদী, লেন-দেন, আচার-বিচার ও শাসন-প্রশাসন সকল কিছু চলিতেছে বিজাতিদের তরীকা অনুসারে। অথচ হাদীছ শরীফের পরিষ্কার ঘোষণা হইল–

من تشبه بقوم فهو منهم *

যে ব্যক্তি কোন কাওমের সহিত সাদৃশ্য গ্রহণ করিবে সে তাহাদের মধ্যেই গণ্য হইবে।

অথচ আমাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা ছিল এই যে, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) যখন পারস্যের অভিজাত লোকদের দস্তরখানে বসিলেন এবং দস্তরখানে পড়িয়া থাকা খাদ্যকণা তুলিয়া খাইতে লাগিলেন তখন কেহ তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, হুজুর! ইহারা এইরূপ করা অপছন্দ করিবে। সংগে সংগে তিনি গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,

أأترك سنة حبيبى لهولاء الحمقاء *

আমি কি আমার হাবীবের সুন্নাত ছাড়িয়া দিব এই নির্বোধদের জন্য?

তখন সারা বিশ্ব ছিল মুসলিম উম্মাহর করতলগত। বিশ্বের জাতিবর্গ মুসলিম উম্মাহকে ভয় করিত, শ্রদ্ধা করিত। কেহ তাহাদের দিকে চক্ষু তুলিয়া তাকাইতেও সাহস করিত না।

সুতরাং আমরা যদি ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রীয়জীবনে আবার শান্তি ফিরিয়া পাইতে চাই এবং বিশ্বের দরবারে হারানো মর্যাদা পুনঃলাভ করিতে চাই তবে অবশ্যই আমাদিগকে নবীর সুন্নাত ও তরীকায় ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং সেই আলোকে নিজেদের গোটা জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। হযরত ইমাম মালিক (রহঃ) তাই বলিয়াছেন–

لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها *

এই উম্মতের পরবর্তীরা ঐ পথেই শুধু সংশোধন লাভ করিতে পারে যেই পথে উহার পূর্ববর্তীরা সংশোধন লাভ করিয়াছে।

আল্লাহর পেয়ারা হাবীবও এই বলিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন–

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما ، كتاب الله و سنتى *

তোমাদের মাঝে আমি দুইটি বিষয় রাখিয়া যাইতেছি। যতদিন তোমরা উহা আকড়াইয়া থাকিবে ততদিন তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হইবে না। আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাত।

হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে তুমি তোমার পেয়ারা হাবীবের প্রিয় সুন্নাত অনুযায়ী জীবন গড়িবা তাওফিক দান কর। আমীন।

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا *

রাসূল তোমাদিগকে যাহা দান করেন তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে বিরত রাখেন তাহা হইতে বিরত থাক।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى *

তিনি আপন ইচ্ছা হইতে কিছু বলেন না। ইহা তো শুধু অহী যাহা (তাঁহার প্রতি) নাযিল করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ *

আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের গোনাহ্ সমূহ মাফ করিয়া দিবেন।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ *

তোমাদের জন্য– যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতের দিনকে ভয় করে তাহাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন–

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا

قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا *

না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তাহারা কিছুতেই ঈমানদার হইতে পারে না, যতক্ষণ না তাহারা নিজেদের ঝগড়া বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক সাব্যস্ত করে। অতঃপর আপনার প্রদত্ত ফায়সালা সম্পর্কে তাহারা নিজেদের অন্তরে কোন অসুবিধা বোধ না করে এবং (বিনা বাক্যব্যয়ে আপনার ফায়সালা) মানিয়া লয়।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন–

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ *

তোমরা যদি কোন বিষয়ে বিবাদ কর তবে ঐ বিবাদপূর্ণ বিষয়টিকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দিকে ফিরাইয়া দাও। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান আনিয়া থাক।

আলিমগণ বলেন, ইহার অর্থ হইল কোরআন ও সুন্নাহর দিকে রুজু করা।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন–

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ *

যাহারা রাসূলের আনুগত্য করিল তাহারা আল্লাহরই আনুগত্য করিল।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَ اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ، صِرَاطِ اللّٰهِ *

আর নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথ তথা আল্লাহর পথ প্রদর্শন করিতেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ *

যাহারা তাঁহার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা যেন কোন পরীক্ষার কিংবা যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সম্মুখীন হইবার ভয় করে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَ الْحِكْمَةِ *

(হে নবীর স্ত্রীগণ।) তোমাদের গৃহে আল্লাহর যে আয়াত ও হিকমত পঠিত হয় তাহা তোমরা স্মরণ কর।

এই বিষয়ে আয়াত প্রচুর।

ফায়দা ঃ

(যাহা দান করিয়াছেন) আয়াতটি মূলতঃ গনীমতের মাল সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। সুতরাং আয়াতের শানেনুযূলগত অর্থ এই যে, আল্লাহ্ পাক মালে গনিমতের হকদারদের শ্রেণী বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন ঠিকই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহাকে কতটুকু দেওয়া হইবে তাহা

সম্পূর্ণতঃ আল্লাহর রাসূলের এখতিয়ার। সুতরাং তিনি যাহাকে যতটুকু দিবেন সে ততটুকুই যেন গ্রহণ করে এবং যাহা না দিবেন তাহা যেন পাইবার চেষ্টা না করে।

তবে ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, আল্লাহর রাসূলের যাবতীয় আদেশ নিষেধও আলোচ্য আয়াতের অর্থব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। الاكليل কিতাবে ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, এই আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় আদেশ নিষেধ অবশ্যপালনীয় হওয়া প্রমাণিত হয়।

এই আয়াতের প্রেক্ষিতেই ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন যে, হাদীছে বর্ণিত যাবতীয় আদেশ নিষেধ সম্পর্কে বলা যায় যে, উহা কোরআনে বিদ্যমান আছে।

(আপনি বলুন যদি তোমরা) অর্থাৎ যে সমস্ত কাফির বলে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ভালবাসার কারণেই দেব ও দেবীমূর্তির উপাসনা করি, যেন তাহারা আমাদিগকে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত করে। আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যে, আল্লাহকে ভালবাসিবার প্রমাণ ও মাপকাঠি ইহা নহে। আল্লাহকে ভালবাসিবার প্রমাণ ও মাপকাঠি হইল তাঁহার রাসূলের অনুসরণ। সুতরাং যে ব্যক্তি সুন্নতের পূর্ণ ইত্তেবা করিবে সে-ই সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভালবাসে। তাহার ভালবাসার দাবী সত্য। অন্যথায় তাহার ভালবাসার দাবী মিথ্যা। এই মিথ্যা দাবী তাহার কোন কাজে আসিবে না।

(আল্লাহর রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে) সুতরাং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে। আর এই জীবনাদর্শের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিয়াছিল ছাহাবা কেরামের জীবনে, তাঁহাদের কথায় ও কাজে। সুতরাং ছাহাবা কেরাম হইলেন নববী জীবনাদর্শ গ্রহণের মাধ্যম। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهديين *

আমার সুন্নত এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত তোমরা গ্রহণ কর।

আরও ইরশাদ হইয়াছে–

اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم *

আমার ছাহাবাগণ নক্ষত্রতুল্য, তাহাদের যে কাহারও অনুসরণ করিবে হেদায়াতপ্রাপ্ত হইবে।

(নিজেদের ঝগড়া বিবাদের ক্ষেত্রে) শুধু বৈষয়িক ঝগড়া বিবাদই এই আয়াতের উদ্দেশ্য নহে। বরং আকীদা ও মতবাদগত বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আকীদা ও মতবাদগত কোন বিষয় আকল ও যুক্তির বিচারে মীমাংসা করা যাইবে না। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকেই উহার মীমাংসা করিতে হইবে। শরীয়তের কোন আকীদা বাহ্যত যদি যুক্তি ও আকলবিরুদ্ধ মনে হয় তবে আকল ও যুক্তিকেই প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। কেননা আমাদের যুক্তি ও আকলের গণ্ডি সীমাবদ্ধ।

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, যাবতীয় বিবাদ মুকদ্দমায় আল্লাহর রাসূলের মীমাংসায় সন্তুষ্ট না হওয়া মুনাফিক হইবার প্রমাণ। এই কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) বিশরকে হত্যা

করিয়াছিলেন। কেননা এক ইহুদীর সহিত তাহার বিবাদ ছিল। উভয়ে ফায়সালার জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইল। ফায়সালা (মুসলমান নামধারী) বিশর-এর বিপক্ষে গেল। তখন সে বিচারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট গেল। তিনি তলোয়ারের এক আঘাতে তাহাকে হত্যা করিয়া বলিলেন, আল্লাহর রাসূলের বিচারে যে রাজি নহে ইহাই তাহার বিচার। বিশরের আত্মীয়স্বজন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিচার দায়ের করিল। তখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর নির্দোষিতা প্রমাণ করিয়া এই আয়াত নাযিল হইল।

(আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকে রুজু কর) রাসূলের জীবদ্দশায় তাঁহার দিকে এবং তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার আনীত শরীয়তের দিকে রুজু করিতে হইবে।

ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, যদি দুইজন মানুষ বিবাদে লিপ্ত হয় আর তাহাদের একজন বলে, চল, শরীয়তের মীমাংসা মানিয়া লই। কিন্তু অপরজন বলে যে, আমি শরীয়তি বিচার মানি না। আমি আদালতে যাইব তবে তাহার ঈমান থাকিবে না।

হাদীছসমূহ

১৫৯। অধিক প্রশ্ন সম্পর্কে নিষেধবাণী

فَالْأَوَّلُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دَعُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ: إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যতক্ষণ আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেই ততক্ষণ তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও। কেননা অধিক প্রশ্ন এবং নবীগণের সহিত বিরোধিতাই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিকে ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং যখন কোন কিছু হইতে তোমাদিগকে আমি নিষেধ করি তখন তোমরা উহা পরিহার কর। আর যখন কোন বিষয়ে আদেশ করি তখন যথাসাধ্য উহা পালন কর। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোতবাদানকালে বলিলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَجُّوْا *

হে লোক সকল! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করিয়াছেন, সুতরাং তোমরা হজ্জ কর।

তখন জনৈক ছাহাবী দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বৎসরই কি হজ্জ করিতে হইবে? তিনি নিরব রহিলেন। ছাহাবী কয়েকবার একই প্রশ্ন করিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

لو قلت نعم لوجبت و لما استطعتم *

আমি যদি বলিতাম, হাঁ, তবে ওয়াজিব হইয়া যাইত। অথচ তোমরা তাহা পারিতে না। অতঃপর তিনি আলোচ্য হাদীছটুকু বলিলেন।

(তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও) অর্থাৎ আমি যেই বিষয়ে তোমাদের সামনে বিশদ বিবরণ দান করা ছাড়িয়া দিয়াছি সেই বিষয়ে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করা ছাড়িয়া দাও।

অর্থাৎ যেই ক্ষেত্রে একটা পরিষ্কার অর্থ বোধগম্য হয় সেই ক্ষেত্রে অন্য অর্থের সম্ভাবনা থাকিলেও সেই বিষয়ে আর প্রশ্নের অবতারণা করিও না। যেমন حجوا (তোমরা হজ্জ কর) শব্দটির স্বাভাবিক অর্থ একবার হজ্জ করা। অবশ্য পুনরাবৃত্তির অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা রহিয়াছে। তখন প্রতি বৎসর হজ্জ ওয়াজিব হইবে। এখানে প্রথম অর্থটি সুনিশ্চিত আর দ্বিতীয় অর্থটি সন্দেহপূর্ণ। সুতরাং এই সম্পর্কে প্রশ্ন পরিহার করিয়া প্রথম অর্থের উপর আমল করাই যথেষ্ট ছিল। আমলের জন্য উপরোক্ত প্রশ্নের প্রয়োজন ছিল না।

অধিক প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিবার কারণ এই যে, তাহাতে অনর্থক কষ্ট ও বিড়ম্বনা নামিয়া আসিতে পারে। যেমন পূর্ববর্তী উম্মত বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রে হইয়াছিল। তাহাদিগকে একটি গাভী যবেহ করিবার আদেশ করা হইল। এই আদেশের উপর আমল করিবার জন্য যে কোন একটি গাভী যবেহ করিলেই চলিত। কিন্তু তাহারা আমল না করিয়া গাভীর বিবরণ সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল। তখন আল্লাহর পক্ষ হইতেও গাভীর বিভিন্ন গুণ বর্ণনা করা হইতে লাগিল। ফলে ঐ ধরনের একটি গাভী খুঁজিয়া বাহির করা তাহাদের জন্য কঠিন হইয়া পড়িল। বলাবাহুল্য যে, অযথা প্রশ্নই তাহাদের জন্য এই বিড়ম্বনা ডাকিয়া আনিয়াছিল।

অবশ্য প্রশ্ন মাত্রই নিন্দনীয় নহে। বরং মূল বিষয় বোধগম্য না হইলে অবশ্যই প্রশ্ন করিয়া বিষয়টি বুঝিয়া লইতে হইবে।

(নবীগণের সহিত বিরোধিতা) যেমন মুসা আলাইহিসসালাম তাঁহার কাওমকে আমালেকাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহারা বিরোধিতা করিয়া বলিল–

اِذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ *

আপনি ও আপনার প্রতিপালক গিয়া যুদ্ধ করুন। আমরা এইখানেই বসিয়া থাকি।

(যথাসাধ্য উহা পালন কর) ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, নিষেধের ক্ষেত্রে নিঃশর্তভাবে পরিহার করিবার কথা বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে আদেশের ক্ষেত্রে সাধ্যের শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। কেননা নিষেধের অর্থ হইল, কাজ না করা। উহার জন্য সাধ্যের প্রশ্ন আসে না। পক্ষান্তরে আদেশের অর্থ হইল, কোন কাজ করা। উহার জন্য সাধ্যের প্রশ্ন আসে। সুতরাং যাহা সাধ্যের বাহিরে তাহা আদেশের অন্তর্ভুক্ত নহে।

১৬০। বিদ'আত পরিহার করা জরুরী

اَلثَّانِي : عَنْ اَبِيْ نَجِيْحٍ اَلْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ، فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَاَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَاَوْصِنَا. قَالَ : «اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ

تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ [حَبَشِيٌّ]، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

«النَّوَاجِذُ» بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ: الْأَنْيَابُ، وَقِيلَ: الْأَضْرَاسُ.

হযরত আবু নাজীহ ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এমন মর্মস্পর্শী ও সারগর্ভ উপদেশ দান করিলেন যে, আমাদের হৃদয় (ভয়ে) বিগলিত হইল এবং চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তখন আমরা আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা তো 'বিদায় উপদেশের' মত মনে হইতেছে। সুতরাং আমাদিগকে (সর্বাংগীন ও পর্যাপ্ত) উপদেশ দান করুন। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অবলম্বনের এবং পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের উপদেশ দিতেছি। যদিও তোমাদের উপর কোন হাবশী গোলাম আমীর (শাসক) রূপে চাপিয়া বসে।

আর তোমাদের মধ্যে যে দীর্ঘায়ু লাভ করিবে সে বহু মতবিরোধ দেখিতে পাইবে, তখন তোমরা আমার সুন্নত এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অনুসরণ করিও এবং উহা মজবুতভাবে আকড়াইয়া ধরিও এবং সকল নব-উদ্ভূত বিষয় (তথা বিদ'আত) হইতে নিজেদিগকে রক্ষা করিও। কেননা প্রতিটি বিদ'আত গোমরাহি (র উৎস)।

আবু দাউদ ও তিরমিযি (রহঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযি (রহঃ) ইহাকে হাসান ও ছহীহ বলিয়াছেন।

ফায়দা ঃ

(উপদেশ দান করিলেন) অন্য বর্ণনায় আছে যে, ইহা ছিল ফজরের নামাযের পরের ঘটনা।

(বিদায় উপদেশ) যেহেতু সেই দিন তিনি সাধারণ সময়ের চাইতে অস্বাভাবিকভাবে বেশী উপদেশ দান করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বিভিন্নভাবে সতর্ক করিতেছিলেন সেহেতু তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, চিরবিদায়ের সময় ঘনাইয়া আসিবার কারণেই সম্ভবতঃ তিনি এমন অস্বাভাবিক উপদেশ দান করিতেছেন।

(হাবশী গোলাম) ইহাকে কল্পিত উদাহরণ রূপে পেশ করা হইয়াছে। কেননা শরীয়তের বিধান মতে কোন দাস বা গোলাম আমীর ও শাসক হইতে পারে না। অর্থাৎ ধরিয়া লওয়া হউক যে, হাবশী গোলাম অবৈধভাবে আমীর হইয়া বসিল। তখন ফিতনা পরিহার করিবার লক্ষ্যে তাহারও আনুগত্য করিবে।

কিংবা ইহা ছিল তাহার ভবিষ্যদ্বাণী। অর্থাৎ এক সময় শরীয়তের নেযাম এমন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে যে, খেলাফত ও ইমারত অনুপযুক্ত ও অবৈধ লোকদের হাতে চলিয়া যাইবে।

শরীয়তের গণ্ডির ভিতরে থাকিয়া অযোগ্য শাসকেরও আনুগত্য করিবার নির্দেশদানের কারণ হইল বৃহৎ ক্ষতি এড়াইবার লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতি বরদাশত করিয়া লওয়া। কেননা (প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবার পর) অবৈধ শাসন মানিয়া লওয়া অন্তহীন ফিতনা ও রক্তারক্তির পথ উন্মুক্ত করিবার চাইতে কম ক্ষতিকর।

এই কারণেই কাররালা প্রান্তরে অবরুদ্ধ ইমাম হোসায়ন (রাঃ) ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণের প্রস্তাব দিয়াছিলেন। কেননা তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, ইয়াযীদের শাসন অবৈধ পন্থায় হইলেও উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

বস্তুতঃ শরীয়তের প্রধান লক্ষ্য হইল এই যে, কোন অবস্থাতেই যেন মুসলমানদের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল না হয়। কেননা এই শক্তি একবার দুর্বল হইলে মুসলমানদের শত্রুরা রাখালবিহীন মেষপালের উপর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িবে এবং গোটা মুসলিম সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা করিয়া গ্রাস্ করিয়া ফেলিবে। তাই হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছিলেন–

ان الناس لا يصلحهم الا امام عادل او فاجر *

ন্যায়পরায়ণ হউক কিংবা পাপাচারী, একজন ইমাম ও শাসক ছাড়া মুসলমানদের (জাতীয় জীবন) সুষ্ঠু হইতে পারে না।

ইংরেজ ও তাহার মিত্রদের কূট চক্রান্তের ফলে অভিশপ্ত কামাল আতাতুর্কের হাতে যখন ওছমানী খেলাফতের বিলুপ্তি ঘটে তখন মুসলিম বিশ্বের আলিম সমাজ এই কারণেই খিলাফত রক্ষায় মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। কেননা আলোচ্য নববী নির্দেশের আলোকে তাহারা জানিতেন যে, তুর্কী খিলাফতের অন্তহীন দুর্বলতা এবং শেষ তুর্কী খলীফা সুলতান আব্দুল হামীদ খানের শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও তুর্কী খিলাফত ও তুর্কী খলীফাই ছিলেন মুসলমানদের কেন্দ্রীয় শক্তির সর্বশেষ প্রতীক।

আরব বিশ্ব আজ পর্যন্ত তুর্কী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেরই শাস্তি ভোগ করিতেছে। ধূর্ত ইংরেজ জাতি তাহাদিগকে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার খাব দেখাইয়াছিল এবং আরব জাতীয়তাবাদের সবক পড়াইয়াছিল। ফলে নবীয়ে আরাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অমোঘ বাণী তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল।–

و ان تأمر عليكم عبد حبشي *

যদিও তোমাদের উপর কোন হাবশী গোলাম আমীর (শাসক) রূপে চাপিয়া বসে।

(বহু মতভেদ দেখিতে পাইবে)' ইহা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা। মুসলিম উম্মাহর পরবর্তীকালে যে সকল দ্বীনী ফেতনা এবং রাজনৈতিক, চিন্তানৈতিক ও অন্যান্য মতানৈক্য দেখা দিবে এবং অনাচার ও পাপাচারের যে সর্বনাশা ঢল নামিবে সেই সম্পর্কে তিনি সামগ্রিক ও বিশদভাবে অবগত ছিলেন এবং বিভিন্ন হাদীছে বহু ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। এই হাদীছেও সেই বিষয়ে ইংগিত করা হইয়াছে। ছহী হাদীছে প্রমাণিত আছে যে, জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীগণ জাহান্নামে যাওয়া পর্যন্ত যতকিছু হইবে সকল কিছু তাঁহার সামনে উদ্ভাসিত করা হইয়াছিল। তবে সকলের সামনে তিনি উহা প্রকাশ করিতেন না। সাধারণভাবে শুধু সতর্ক করিতেন। হযরত আবু হোযায়ফা ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর ন্যায় দুই

একজন খাছ ছাহাবীর নিকট কিছু কিছু বিশদ বর্ণনাও করিতেন।

(আমার সুন্নত) অর্থাৎ সহজ সরল তরীকা যাহা আমি তোমাদের সামনে আকীদা, আমল ও আখলাকসংক্রান্ত বিস্তারিত আহকাম ও বিধান রূপে রাখিয়া যাইতেছি।

(খোলাফায়ে রাশেদীন) তাঁহারা হইলেন, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উছমান, হযরত আলী ও হযরত হাসান (রাঃ)

ছাহাবা কেরামের মাঝে কোন মাসআলায় মতভেদ হইলে অন্যান্য ছাহাবা কেরামের তুলনায় খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণই উত্তম। পক্ষান্তরে মতভেদ না হইলে যে কোন ছাহাবীর অনুসরণই উত্তম। কেননা সকল ছাহাবীর প্রতি আল্লাহ পাক সন্তুষ্টি ঘোষণা করিয়াছেন।

(প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী) কেননা হক ও সত্য উহাই যাহা শরীয়তে বিদ্যমান রহিয়াছে। শরীয়তে যাহার কোন অস্তিত্ব নাই তাহা গোমরাহী হইবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। فماذا بعد الحق الا الضلال (হক–এর বিপরীতে গোমরাহী ছাড়া আর কি থাকিতে পারে?) তবে গোমরাহী দ্বারা ঐ সকল নব-উদ্ভাবিত বিষয়ই উদ্দেশ্য যাহার কোন মূল বা সূত্র শরীয়তে নাই। বরং নফসের প্রবৃত্তি ও খাহেশই শুধু উহা প্রবর্তনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। পক্ষান্তরে যে নব-উদ্ভাবিত বিষয়ের কোন মূল বা সূত্র শরীয়তে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উলামায়ে হক উহা সমর্থন করিয়াছেন উহা এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা উহা খোলাফায়ে রাশেদীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন–এর সুন্নত বা তরীকা, যাহা অনুসরণ করিবার আদেশ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করিয়াছেন।

সুতরাং নিছক নূতনত্বে দোষের কিছু নাই। দোষের হইল শরীয়তের সহিত সম্পর্কহীন এবং সুন্নাতের সহিত বিরোধপূর্ণ হওয়া। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিদ'আত নামে অভিহিত বিষয়গুলিকে শরীয়তের উছূল ও বিধানের সামনে পেশ করা হইলে নিম্নোক্ত পাঁচ হালাত হইতে পারে।

১। এমন বিদ'আত যাহা ওয়াজিবে কিফায়া। যেমন, ঐ সমস্ত ইলম শিক্ষা করা যাহার উপর কোরআন ও সুন্নাহ বুঝা নির্ভরশীল। কিংবা শরীয়তের হিফাযত উহা শিক্ষা করিবার মাঝে নিহিত। কোরআন ও সুন্নাহ বুঝা এবং শরীয়তের হিফাযত করা যেহেতু ওয়াজিবে কিফায়া সুতরাং ঐ সমস্ত ইলম শিক্ষা করাও ওয়াজিবে কিফায়া হইবে।

২। এমন বিদ'আত যাহা হারাম। যেমন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের পরিপন্থী যাবতীয় মাযহাব, মতবাদ ও কর্মকাণ্ড সমূহ।

৩। এমন বিদ'আত যাহা প্রশংসনীয়। যেমন, মাদরাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করা। কেননা এইগুলি কল্যাণযুগে বর্তমান রূপে ছিল না সত্য। কিন্তু দ্বীনের খিদমত ও প্রচারের জন্য এইগুলি সহায়ক হইতেছে।

৪। মাকরূহ বিদ'আত। যেমন, মসজিদের কারুকাজ।

৫। জায়েয বিদ'আত। যেমন, পানাহারের ও পরিধানের নিত্য নতুন উপকরণ।

সুতরাং বুঝা গেল যে, كل بدعة ضلالة কথাটি ব্যাপক, কিন্তু উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ।

হাদীছের শিক্ষা ঃ

১। প্রকাশ্য শরীয়ত বিরোধী হুকুম না হইলে যে কোন অবস্থায় আমীরের আনুগত্য করা জরুরী।

২। সুন্নাতের উপর আমল করা এবং বিদ'আ হইতে বাঁচিয়া থাকা নাজাত লাভের উপায়।

১৬১। সুন্নাতের ইত্তেবা করিবার ও না করিবার ফল

اَلثَّالِثُ: عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ اُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ اَبٰى». قِيْلَ: وَمَنْ يَاْبٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «مَنْ اَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ اَبٰى» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তবে যে (জান্নাতে প্রবেশ করিতে) অস্বীকার করিবে। (সে বঞ্চিত হইবে।) আরয করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (জান্নাতে প্রবেশ করিতে আবার) কে অস্বীকার করিবে? তিনি বলিলেন, যে আমার আনুগত্য করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যে আমার অবাধ্য হইবে সে (যেন জান্নাতে প্রবেশ করিতে) অস্বীকার করিল। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তর দ্বারা বুঝা গেল যে, জান্নাতে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করা কথাটা রূপক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর অবাধ্য হওয়া জান্নাতে দাখেল হইতে অস্বীকার করিবারই নামান্তর। কেননা তাঁহার আনুগত্য ছাড়া জান্নাতে দাখিল হইবার দ্বিতীয় কোন পথ নাই।

রাসূলের অবাধ্যতা যদি মূল ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে কিংবা সুন্নাহকে অস্বীকার করিবার ক্ষেত্রে হয় তবে তো সে কাফির। সে চির জাহান্নামী হইবে। কোনদিন জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে অবাধ্যতা যদি আমলের ক্ষেত্রে হয় তবে জান্নাতে প্রবেশ করিতে না পারিবার অর্থ বিনা আযাবে প্রথম সুযোগে প্রবেশ করিতে না পারা।

১৬২। অহংকার ও সুন্নতের বিরুদ্ধাচরণের ফল

اَلرَّابِعُ: عَنْ اَبِيْ مُسْلِمٍ، وَقِيْلَ: اَبِيْ اِيَاسٍ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلًا اَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِيْنِكَ» قَالَ: لَا اَسْتَطِيْعُ. قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ» مَا مَنَعَهُ اِلَّا الْكِبْرُ، فَمَا رَفَعَهَا اِلٰى فِيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু মুসলিম (মতান্তরে আবু ইয়াস) সালামা বিন আমর বিন আকওয়া (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বাম হাতে আহার করিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি ডান হাতে আহার কর। সে বলিল, আমি

ডান হাতে খাইতে পারি না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যেন না পার।

অহংকারই তাহাকে এই (হুকুম পালনে) বাধা দিয়াছিল। পরে সে তাহার (ডান) হাত (কখনও) মুখ পর্যন্ত তুলিতে পারে নাই। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

তাহার নাম ছিল বুসর বিন রাঈল 'ঈর'। আবু নাঈম ও অন্যান্যরা তাহাকে প্রসিদ্ধ ছাহাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিনা ওযরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও আদেশ অমান্য করিবার কারণে তিনি তাহার জন্য বদ দু'আ করিয়াছিলেন। তবে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, শুধু অহংকার বা আদেশ লংঘন তাঁহার মুনাফিক হওয়া প্রমাণ করে না। বরং **كل بيمينك** এই আদেশ যদি ওয়াজিব পর্যায়ের হয় তবে ইহা মা'ছিয়াত বা নাফরমানী হইবে। কিন্তু কাযী ইয়ায (রহঃ) এই কারণে তাহাকে মুনাফিক সাব্যস্ত করিয়াছেন।

যদি ডান হাতে খাইবার ব্যাপারে অসুস্থতা বা অন্য কোন ওযর না থাকে তবে বাম হাতে খাওয়া সুন্নতের খেলাফ এবং নিষেধ। যেহেতু অন্যান্য জাতি বাম হাতে খায় সেহেতু বিনা ওযরে বাম হাতে খাইলে সে নিম্নোক্ত হাদীছের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

من تشبه بقوم فهو منهم *

যে অন্য কাওমের সহিত সাদৃশ্য গ্রহণ করিবে সে তাহাদের মধ্যে গণ্য হইবে।

তবে আহারের সময় প্রয়োজনে বাম হাতের সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই জন্যই আহারের পূর্বে উভয় হাত ধোয়া সুন্নত।

তদ্রূপ খাওয়া অবস্থায় চামচ দ্বারা খানা বা তরকারী লইবার জন্য চামচ বাম হাতে ধরা যাইতে পারে। যেমন পানি পান করিবার জন্য গ্লাস বাম হাতে ধরিয়া ডান হাত গ্লাসের নীচে রাখিয়া পান করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল চামচ বা গ্লাস অন্যদের ব্যবহার করিতে কষ্ট না হওয়া।

হাদীছের শিক্ষা ঃ সুন্নাতের উপর আমল না করিবার, বিশেষতঃ সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম অতি ভয়ংকর। অনেক সময় আল্লাহ পাক দুনিয়াতেও ইহার শাস্তি দিয়া থাকেন। সুতরাং এই বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত।

১৬৩। নামাযে ছাফ সোজা না করিবার পরিণাম

اَلْخَامِسُ: عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمسلِم : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّيْ صُفُوْفَنَا حَتّٰى كَاَنَّمَا يُسَوِّيْ بِهَا الْقِدَاحَ حَتّٰى اِذَا رَاٰى اَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ . ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا، فَقَامَ حَتّٰى كَادَ اَنْ يُكَبِّرَ، فَرَاٰى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهٗ فَقَالَ: «عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ».

হযরত আবু আব্দুল্লাহ্ নো'মান বিন বশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, হয় তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করিবে নতুবা আল্লাহ্ তোমাদের 'চেহারা পরিবর্তন' করিয়া দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারসমূহ এমনভাবে সোজা করিতেন যেন উহা দ্বারা তিনি তীরের কাঠি সোজা করিতেছেন। এমন কি যখন তিনি দেখিতেন যে, আমরা (বিষয়টি) তাঁহার নিকট হইতে বুঝিয়া লইয়াছি। (তখন তিনি নামায শুরু করিতেন।) অতঃপর একদিন তিনি (নামাযের জন্য) বাহির হইলেন এবং (মুছল্লায়) দাঁড়াইলেন। এমন কি তিনি তাকবীর বলিতে যাইবেন এমন সময় একজন লোককে দেখিতে পাইলেন যাহার সিনা (কাতার হইতে) বাহির হইয়া আছে। তখন তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! হয় তোমরা তোমাদের ছাফ সোজা করিবে নতুবা আল্লাহ তোমাদের চেহারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন।

ফায়দা ঃ

(পরিবর্তন করিয়া দিবেন) এই হুঁশিয়ারির অর্থ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, এখানে শব্দের প্রকৃত অর্থ অর্থাৎ চেহারা পরিবর্তন করিয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য। যেমন চেহারা উল্টা দিকে করিয়া দেওয়া কিংবা চেহারা বিকৃত করিয়া দেওয়া। হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত এই অর্থকে সমর্থন করিতেছে—

لتسون الصفوف او لتطمسن الوجوه *

হয় তোমরা কাতার সোজা করিবে কিংবা তোমাদের চেহারা বিকৃত করিয়া দেওয়া হইবে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহঃ) এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

আল্লামা নববী ও অন্যান্যদের মতে ইহা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ তোমাদের মাঝে অন্তরের বিভেদ এবং শত্রুতা এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া দিবেন। কেননা মুসলমানদের কাতার বে-মিল হইবার অর্থ তাহাদের বাহিরের অবস্থার বে-মিল হওয়া। আর বাহিরের বেমিল হওয়া ভিতরের বে-মিল হইবার কারণ। আরবীতে এইরূপ বাক্যের এইরূপ অর্থের প্রচলন রহিয়াছে। যেমন বলা হয় تغير لى وجه فلان অর্থাৎ আমার প্রতি তাহার চেহারা পরিবর্তন হইয়াছে অর্থাৎ বিরূপতা দেখা দিয়াছে। ইহাছাড়া আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত রিওয়ায়াতে এই অর্থের সমর্থন রহিয়াছে। যেমন—

او ليخالفن الله بين قلوبكم *

কিংবা আল্লাহ পাক তোমাদের অন্তর সমূহের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

মোটকথা وجوه শব্দটির অর্থ বিশেষ অংগ (অর্থাৎ চেহারা) করা হইলে مخالفة বা পরিবর্তনের অর্থ হইবে চেহারার আকৃতিগত পরিবর্তন আর উহা দ্বারা সমগ্র দেহ উদ্দেশ্য হইলে পরিবর্তনের অর্থ হইবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিবর্তন। হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, এই

অর্থও হইতে পারে যে, তোমাদের প্রতিদান বিভিন্ন করিয়া দিবেন। অর্থাৎ কাতার সোজা করিবার ব্যাপারে সচেষ্ট ব্যক্তিকে উত্তম প্রতিদান দিবেন আর এই বিষয়ে উদাসীন ব্যক্তিকে মন্দ প্রতিদান দিবেন।

(যেন তিনি তীরের কাঠি সোজা করিতেছেন) এখানে নামাযের কাতার সোজা করিবার গুরুত্ব শরীয়তে কি অপরিসীম তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল। আরও জানা গেল যে, মুসল্লীদের কাতার সোজা করিবার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া ইমাম সাহেবেরও দায়িত্ব। অর্থাৎ এই বিষয়ে ইমাম সাহেবকেও আল্লাহর দরবারে জওয়াবদেহী করিতে হইবে।

আরও জানা গেল যে, বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে এই যে বিরোধ-বিভেদ এবং মনের শত অমিল, ইহার বড় কারণ হইল নামাযে আমাদের কাতার সোজা না হওয়া। পূর্ববর্তীদের নামাযের কাতার যেখানে দাগ না টানিয়াই সোজা হইত সেইখানে আমাদের কাতার দাগ টানিয়া দিয়াও সোজা হইতে চাহে না। মুসলিম সমাজের বর্তমান অনৈক্য ও বিভেধ-বিসম্বাদের বিভিন্ন কারণ তালাশ করা হইতেছে এবং ঐগুলি সংশোধনের চেষ্টাও করা হইতেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন সেই দিকে মোটেও খেয়াল করা হইতেছে না।

এই হাদীছ দ্বারা আরও বোঝা যায় যে, ইকামত ও তাকবীরে তাহরীমের মাঝে নামাযের প্রয়োজনে কথা বলা মাকরূহ নহে।

হাদীছের শিক্ষা ঃ নামাযের ছফ সোজা হইবার বরকত অপরিসীম আবার ছফ সোজা না হইবার ক্ষতিও বিরাট। সুতরাং এই বিষয়ে ইমাম ও মুক্তাদী সকলকেই যত্নবান হইতে হইবে।

১৬৪। রাত্রে আগুন নিভাইয়া শোয়া

اَلسَّادِسُ: عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: اِحْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلٰى اَهْلِهٖ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاْنِهِمْ قَالَ: «اِنَّ هٰذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَّكُمْ ، فَاِذَا نِمْتُمْ فَاَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, একবার রাত্রে মদীনার একটি ঘর লোকজনসহ জ্বলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন তাহাদের ঘটনা জানানো হইল তখন তিনি বলিলেন, এই আগুন হইল তোমাদের দুশমন। সুতরাং যখন তোমরা ঘুমাইবে তখন উহা নিভাইয়া রাখিও।

ফায়দা ঃ

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, এই নির্দেশ পরামর্শমূলক। কেননা ইহা দুনিয়াবী বিষয়। কিন্তু অন্যরা ইহা মুস্তাহাব বলিয়াছেন। কেননা ইহার সহিত দ্বীনী বিষয়েরও সম্পর্ক রহিয়াছে এই হিসাবে যে, আগুন জ্বালাইয়া রাখা দ্বারা জান-মালের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। অথচ জান-মালের হিফাযতের ব্যবস্থা করা শরীয়তের হুকুম।

আল্লামা তীবী (রহঃ) বলেন, কেহ যদি একা ঘরে রাত্রি জাগরণ করে আর ঐ ঘরে আগুন

প্রজ্বলিত থাকে তবে তাহার উচিত ঘুমের সময় উহা নিভাইয়া ফেলা কিংবা এমন রক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাহাতে দুর্ঘটনার আশংকা দূর হয়। পক্ষান্তরে ঘরে বহু লোক থাকিলে কোন একজনের উপর, বিশেষতঃ যে সকলের শেষে ঘুমাইবে তাহার উপর আগুন নিভাইবার দায়িত্ব বর্তাইবে। সে এই বিষয়ে ত্রুটি করিলে সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণকারী রূপে সাব্যস্ত হইবে।

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, হাদীছের অর্থ ব্যাপক। প্রদীপের ও চুলার আগুন এবং অন্যান্য সর্ব প্রকার আগুন (মশার কয়েল বা ঘর গরম রাখিবার জন্য প্রজ্বলিত হিটার বা কয়লার আগুন) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। তবে যে বাতির আগুন কাঁচঘেরা থাকে অর্থাৎ নিরাপদ অবস্থায় থাকে। তাহা এই হাদীছের অন্তর্ভুক্ত নহে।

এই হাদীছের মৌলিক বক্তব্য হইল আগুনের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকা। বস্তুতঃ আমাদের দেশে প্রতি বৎসর শুধু অসতর্কতার কারণে অসংখ্য অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে এবং জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি হইয়া থাকে।

চিন্তা করিয়া দেখুন, উম্মতের প্রতি কতটা দরদ ছিল আমাদের নবীজীর অন্তরে যে, আমাদের ইহ জীবনেরও কল্যাণের জন্য এই ধরনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুন্নত রাখিয়া গিয়াছেন। যেমন, খাবার ঢাকিয়া রাখা, রাত্রে পাত্র উপুড় করিয়া রাখা, হামি আসিলে মুখে হাত দেওয়া (যাহাতে ক্ষতিকর কিছু খোলা মুখে ঢুকিতে না পারে) তিন শ্বাসে পানি পান করা, পানির পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলা, একা সফর না করা, পথ চলিতে সংগে লাঠি রাখা, গর্তে পেশাব না করা, গাছের নীচে বা ছায়াদার স্থানে পেশাব পায়খানা না করা (যাহাতে মানুষ ছায়ায় বিশ্রাম লইতে পারে)- এই ধরনের অসংখ্য আদব তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন যাহা পালন করিলে আমাদের দুনিয়ার জীবনও নিষ্কন্টক ও নিরাপদ হইবে আবার আখিরাতেও বিরাট প্রতিদান পাওয়া যাইবে। আল্লাহ পাক আমাদের পক্ষ হইতে আমাদের পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোত্তম জাযা দান করুন। আমীন।

হাদীছের শিক্ষা ঃ আগুন সম্পর্কে এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনাপূর্ণ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সতর্ক থাকা খুব জরুরী। অসর্তকতা মুমিনের গুণ নহে।

১৬৫। ইলমে নবুওয়তের উদাহরণ

اَلسَّابِعُ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اِنَّ مِثْلَ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا. وَاَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا اُخْرٰى، اِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً. فَذٰلِكَ مِثْلُ مَنْ فَقُهَ فِيْ دِيْنِ اللهِ، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَاْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «فَقُهَ» بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُوْرِ، وَقِيْلَ: بِكَسْرِهَا، اَيْ: صَارَ فَقِيْهًا.

হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ আমাকে যে হিদায়াত ও ইলমসহ প্রেরণ করিয়াছেন। উহার উদাহরণ কোন ভূমিতে বর্ষিত বৃষ্টির ন্যায়। ঐ ভূমির একটি খণ্ড অতি উত্তম। ফলে উহা পানি গ্রহণ করিল এবং প্রচুর সবুজ ঘাস উৎপন্ন করিল। ঐ ভূমির অন্য একটি খণ্ড ছিল যাহা পানি ধারণ করিয়া রাখিল। ফলে আল্লাহ্ উহা দ্বারা মানুষের কল্যাণ করিলেন। আর মানুষ উহা হইতে পান করিল এবং (গবাদি পশুকে) পান করাইল এবং চাষাবাদ করিল। ঐ বৃষ্টির কিছু অংশ অন্য এক ভূখণ্ডেও পৌঁছিল যাহা উষর। পানিও ধারণ করে না, ফসলও উৎপন্ন করে না। ইহা ঐ লোকের উদাহরণ যে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিয়াছে এবং আল্লাহ্ আমাকে যাহা কিছুসহ প্রেরণ করিয়াছেন উহা তাহার কল্যাণ করিয়াছে। ফলে সে শিক্ষা লাভ করিল এবং শিক্ষা দান করিল এবং ঐ লোকের উদাহরণ যে উহার প্রতি মাথা তুলিল না এবং (ঐ ব্যক্তির উদাহরণ, যে) আল্লাহর (প্রেরিত) হিদায়াত কবুল করিল না।

ফায়দা ঃ

(কোন ভূমিতে বর্ষিত বৃষ্টির ন্যায়) আসমান হইতে অবতীর্ণ ইলম ও হিদায়াতকে আসমান হইতে বর্ষিত বৃষ্টির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কেননা বৃষ্টি যেমন বিশুষ্ক ও মৃতভূমিকে প্রাণ দান করে এবং সজীব করিয়া তোলে তেমনি ইলম ও হিদায়াতও বিশুষ্ক ও মৃতহৃদয়কে ঈমানী ও নূরানী জীবন দান করে।

হিকমত ঃ বৃষ্টির জন্য আরবী ভাষার সাধারণ শব্দ হইল مطر পক্ষান্তরে غيث শব্দের অর্থ সেই বৃষ্টি যাহা খরাপীড়িত ও তৃষিত ভূমিতে বহু প্রতিক্ষার পর বড় প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বর্ষিত হয়। আর সকল কিছু জীবনের স্পর্শে জাগিয়া উঠে। হাদীছ শরীফে ইলম ও হিদায়াত তথা অহীকে বৃষ্টির সহিত তুলনা করিতে গিয়া সাধারণ শব্দ مطر এর পরিবর্তে غيث শব্দের ব্যবহার দ্বারা এই দিকে ইংগিত করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা আবির্ভাবের পূর্বে মানুষের অবস্থাও ছিল পানির অভাবে শুকাইয়া চৌচির হওয়া ভূমির মত। তৃষিত মানবতা তখন বিশুষ্ক ভূমির মতই ইলম ও হিদায়াতের শীতল বারি বর্ষণের প্রতিক্ষায় ছিল। সেই মুহূর্তে তৃষিত মানবতার মুক্তির জন্য আল্লাহ পাক আসমানী অহীর মাধ্যমে ইলম ও হিদায়াতের বারি বর্ষণ করিয়াছেন।

উদাহরণের ব্যাখ্যা। আলোচ্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে আসমান হইতে বর্ষিত বৃষ্টি দ্বারা উপকৃত হওয়া না হওয়া হিসাবে তিন শ্রেণীর জমিনের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আসমান হইতে তাঁহার উপর অবতীর্ণ অহী দ্বারা উপকৃত হওয়া না হওয়া হিসাবে উম্মতকে [১] তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। অতঃপর উম্মতের একটি শ্রেণীকে জমির একটি শ্রেণীর সহিত তুলনা করিয়া উম্মতের অবস্থা বুঝাইয়াছেন।

১। উম্মত দ্বারা উম্মতে দাওয়াত ও উম্মতে ইজাবত উভয় প্রকারই উদ্দেশ্য। উম্মতে দাওয়াত দ্বারা সমগ্র মানব জাতি উদ্দেশ্য। কেননা তাঁহার দাওয়াত সমগ্র মানব জাতির জন্য। আর উম্মতে ইজাবত অর্থ মুসলমান জাতি যাহারা তাঁহার দাওয়াত গ্রহণ করিয়াছেন। এইখানে উম্মত শব্দটি বৃহত্তর অর্থে ব্যবহৃত।

পানি শোষণ করিয়া ফসল উৎপন্নকারী ভূমি হইল ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে দ্বীনের সমঝ ও ইলম নিজেও হাছিল করিয়াছে এবং উহার উপর আমল করিয়াছে। (জমির পানি শোষণ করিবার মত।) আবার অন্যদিগকেও শিক্ষা দান করিয়াছে। আবার অন্যরাও তাহার ইলম দ্বারা উপকৃত হইয়াছে (যেমন জমির ঘাস দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়।)

ফসল উৎপন্ন না করিয়া শুধু পানি ধারণকারী ভূমি হইল ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে ইলম হাছিল করিয়াছে এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়াছে (জমি যেমন পানি ধারণ করিয়া অন্যের উপকার করিয়াছে) কিন্তু নিজে আমল করিয়া লাভবান হয় নাই (জমি যেমন নিজে ঘাস উৎপন্ন করিয়া সজীব সবুজ হয় নাই।)

যে ভূমি ফসলও উৎপন্ন করে নাই এবং পানিও ধারণ করে নাই উহা ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে ইলম ও হিদায়াত কবুলই করে নাই।

হাদীছের আসল উদ্দেশ্য হইল মানুষকে ইলম হাছিল করা, উহার উপর আমল করা এবং অন্যকে ইলম শিক্ষা দান করিবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। যেমন অন্য হাদীছে আসিয়াছে–

خيركم من تعلم القران و علمه *

তোমাদের মাঝে সেই উত্তম যে, কোরআন শিক্ষা করিয়াছে এবং শিক্ষা দান করিয়াছে।

তদ্রূপ এখানে এই বিষয়ে সতর্ক করাও উদ্দেশ্য যে, ইলম যেন আমাদের মুক্তির কারণ হয়, ধ্বংসের কারণ না হয়। যেমন অন্য হাদীছে আছে–

القرآن حجة لك او عليك *

কোরআন হয় তোমার পক্ষে হুজ্জত হইবে কিংবা তোমার বিপক্ষে

তদ্রূপ বে-আমল আলিমদিগকেও সতর্ক করা উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ বে-আমল আলিমদের অবস্থা কেয়ামতের দিন সবচাইতে কঠিন হইবে। একদল জান্নাতী লোক একদল জাহান্নামীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা জাহান্নামে গেলে কি করিয়া? আমরা তো তোমাদের কথার উপর আমল করিয়াই জান্নাতের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তাহারা বলিবে, আমরা উপদেশ দিতাম। কিন্তু নিজেরা আমল করিতাম না।

(উহার প্রতি মাথা তুলিল না) মাথা না তুলিবার অর্থ আমল না করিবার কারণে অর্জিত ইলম দ্বারা উপকৃত না হওয়া। যেমন অন্ধ ব্যক্তি প্রদীপ হাতে অন্ধকার পথে চলিতেছে। মানুষ তো সেই আলো দ্বারা উপকৃত হয় এবং পথ দেখিয়া চলে। কিন্তু তাহার নিজের কোন লাভ হয় না। বরং সে গর্তে পড়িয়া যায়।

সে গর্তে পড়িয়া যায়।

১৬৬। উম্মতের প্রতি নবীজীর দয়া

اَلثَّامِنُ: عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَاَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَاَنْتُمْ تَفَلَّتُوْنَ مِنْ يَدِيْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

«اَلْجَنَادِبُ»: نَحْوُ الْجَرَادِ وَالْفَرَاشُ ، هٰذَا هُوَ الْمَعْرُوْفُ الَّذِيْ يَقَعُ فِي النَّارِ.

«وَالْحُجَزُ»: جَمْعُ حُجْزَةٍ، وَهِيَ مَعْقِدُ الْإِزَارِ وَالسَّرَاوِيْلِ.

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার এবং তোমাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন জ্বালাইল। ফলে ফড়িং ও পতংগদল উহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল আর সে (করুণাবশতঃ) তাহাদিগকে দূরে সরাইতেছে। তদ্রূপ আমিও আগুন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তোমাদের কোমর ধরিয়া আছি। অথচ তোমরা আমার হাত ফসকাইয়া যাইতেছ। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(ফংড়ি ও পতংগদল উহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে) কেননা তাহারা জানে না যে ঐ চমকদার বস্তুটি তাহাদের জন্য সাক্ষাৎ মৃত্যু। বস্তুতঃ ঐই আগুন হইল দুনিয়ার আগুন। উহার উজ্জ্বল আলো ও চাকচিক্যের মোহে পড়িয়া মানুষ সেই দিকে ছুটিয়া যায় এবং হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া উহার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া জ্বলিয়া ছারখার হয়। অথচ সে যদি ঐ আগুন হইতে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করিত এবং (উহার ক্ষতি হইতে বাঁচিয়া) বিভিন্ন প্রয়োজনে উহাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেই নিয়ম ও বিধান জানিয়া লইত; তবে ক্ষতির পরিবর্তে উহা তাহার উভয় জাহানের জন্য লাভজনক হইত। কেননা ইসলাম তো দুনিয়াকে পরিহার করিতে বলে না। বরং উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করে। অন্য হাদীছে বলা হইয়াছে, দুনিয়া হইল সমুদ্রের পানি। আর আমাদের জিন্দেগী হইল উহার উপরে ভাসমান নৌকা। আমরা সেই নৌকার যাত্রী। পানি ছাড়া নৌকা চলিতে পারে না কিন্তু মানুষ ততক্ষণই নিরাপদ থাকিবে যতক্ষণ পানি নৌকার বাহিরে থাকে। যদি কোনক্রমে পানি নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিতে শুরু করে তবে ডুবিয়া ধ্বংস হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। দুনিয়ার সহিত আমাদেরও সম্পর্ক অনুরূপ।

(আর সে তাহাদিগকে দূরে সরাইতেছে) কেননা তাহার অন্তরে এই পতংগদলের প্রতি অপরিসীম মমতা রহিয়াছে আর সে জানে যে, ইহাতে ঝাঁপ দিবার পরিণতি মৃত্যু ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নহে। কিন্তু পতংগদল না বুঝিয়া ধ্বংসের আগুনে ঝাঁপ দিতেছে।

(তোমাদের কোমরে ধরিয়া আছি।) অর্থাৎ ঐ পতংগদল যেমন আগুনে ঝাঁপ দিয়া মরিতেছে। তদ্রূপ তোমরাও ইসলামের দাওয়াত অস্বীকার করিয়া কিংবা খাহেশাতের পিছনে চলিয়া এবং দুনিয়ার চাকচিক্যে ভুলিয়া জাহান্নামের আগুনে ঝাঁপ দিতেছ। আর আমি তোমাদিগকে সত্যের পথ বাতলাইয়া, শরীয়তের আহকাম ও বিধান বলিয়া জান্নাতের নেয়ামত ও জাহান্নামের আযাব স্মরণ করাইয়া তোমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু পতংগদল যেমন ঐ দরদী লোকটির বাধা উপেক্ষা করিয়া আগুনে ঝাঁপ দিতেছে তদ্রূপ তোমরাও আমার সাবধানবাণী উপেক্ষা করিয়া এবং তরীকা ও সুন্নত ছাড়িয়া জাহান্নামের দিকে ধাবিত হইতেছ।

এই হাদীছে উম্মতের মুক্তির জন্য পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে যে ব্যাকুলতা ও আকুতি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিবার শক্তি আমাদের মত নালায়েকদের

কি করিয়া হইবে? তবে এতটুকু বোঝাই যথেষ্ট যে, যাহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ, তরীকা ও সুন্নাত অনুযায়ী দুনিয়াতে জীবন-যাপন করিবে তাহারাই আখিরাতে জাহান্নামের ভয়ংকর আযাব হইতে নাজাত পাইবে। আর যাহারা উহা হইতে বিচ্যুত হইবে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য।

১৬৭। চাটিয়া খাইবার হিকমত

اَلتَّاسِعُ: عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، اَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: «اِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِيْ اَيِّهَا الْبَرَكَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ، فَلْيَاْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَ اَصَابِعَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ فِيْ اَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: «اِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَاْنِهِ حَتّٰى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَاِذَا سَقَطَتْ مِنْ اَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى، فَلْيَاْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ»

হযরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আংগুল ও বর্তন চাটিয়া খাইবার আদেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তোমরা জান না যে, খানার কোন অংশে বরকত রহিয়াছে। (মুসলিম শরীফ)

মুসলিম শরীফের অন্য বর্ণনায় আছে–

তোমাদের কাহারও (হাত হইতে) লোকমা যদি পড়িয়া যায় তবে সে যেন উহা তুলিয়া লয় এবং উহার সহিত লাগিয়া থাকা ময়লা পরিষ্কার করিয়া উহা খাইয়া ফেলে। শয়তানের জন্য যেন ছাড়িয়া না দেয়। আর আংগুলগুলি মুছিয়া না খাওয়া পর্যন্ত যেন রুমাল দ্বারা হাত না মুছে। কেননা সে জানে না যে, তাহার খাবারের কোন অংশে বরকত রহিয়াছে।

মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে, শয়তান তোমাদের প্রতিটি কাজে তোমাদের প্রত্যেকের নিকট উপস্থিত থাকে। এমনকি তাহার আহারের সময় তাহার নিকটে উপস্থিত থাকে। সুতরাং তোমাদের কাহারও (হাত হইতে) লোকমা পড়িয়া গেলে তাহার কর্তব্য হইল, উহাতে লাগিয়া থাকা ময়লা পরিষ্কার করিয়া উহা খাইয়া ফেলা এবং শয়তানের জন্য উহা ছাড়িয়া না দেওয়া।

ফায়দা ঃ

(আংগুল ও বর্তন চাটিয়া খাইবার আদেশ করিয়াছেন) নিজে চাটিয়া খাইলেও যেমন সুন্নত আদায় হইবে। তেমনি স্ত্রী, সন্তান যাহারা তাহার আংগুল চাটিতে ঘৃণাবোধ করিবে না,

কিংবা ছাত্র ও শিষ্য যাহারা ইহা চাটিয়া খাওয়াকে বরকত মনে করিবে তাহাদিগকে চাটিয়া খাইতে দিলেও সুন্নাত আদায় হইয়া যাইবে।

বর্তন চাটিয়া খাইবার আরেকটি ফায়দা এই যে, ইহাতে অন্তরে বিনয় পয়দা হয়। এই জন্যই দেখা যায় যে, অহংকারী ও প্রতাপশালী লোকেরা সাধারণতঃ বর্তন চাটিয়া খায় না। এমন কি কেহ খাইতে বলিলে তাহাতে অপমানিত বোধ করে। কেহ কেহ তো কটুক্তি পর্যন্ত করিয়া থাকে। কিন্তু মনে রাখিবে যে, সুন্নাত তরক করিলে শুধু সুন্নাত তরকের গোনাহ হইবে এবং সুন্নাতের উপর আমলের ফযীলত হইতে মাহরূম হইবে। কিন্তু সুন্নাত সম্পর্কে কটুক্তি করিলে বা হাসি তামাশা করিলে ঈমানই চলিয়া যাইবে। আল্লাহ আমাদিগকে হিফাযত করুন। আমীন।

(কোন্ অংশে বরকত রহিয়াছে) আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, আহার গ্রহণের উদ্দেশ্য হইল শরীরের প্রয়োজন পুরা হওয়া এবং শারীরিক সুস্থতা বজায় থাকা এবং আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী করিবার জন্য পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় করা। সেই সংগে খাবারের অপকারিতা হইতে বাঁচিয়া থাকা। কেননা হাদীছ শরীফে আছে, খাবার যখন খাদ্যনালী দিয়া নামে তখন সে আল্লাহ পাকের নিকট হুকুম গ্রহণ করে। উপকার করিবার হুকুম হইলে উপকার দান করে আর ক্ষতি করিবার হুকুম হইলে ক্ষতি করে। তাহাছাড়া মুমিনের খাবার দ্বারা অন্তরে নূর পয়দা হয়। কিন্তু এই নূর ও বরকত মানুষের সামনে উপস্থিত খাবারের যে কোন একটা অংশে আল্লাহ পাক নিহিত রাখেন। আর বান্দার তো জানা নাই যে, ঐ নূর ও বরকত উদরস্থ খাবারে আছে নাকি আংগুলে লাগিয়া থাকা খাবারে কিংবা বর্তনের উচ্ছিষ্ট অংশে কিংবা পড়িয়া যাওয়া লোকমার মধ্যে। তাই বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ঐ সকল কিছুর হিফাযত করা কর্তব্য।

(লোকমা পড়িয়া গেলে) অহংকারী ও প্রাচুর্যের অধিকারী কোন কোন লোক যেমন উক্ত লোকমা ফেলিয়া দেয়, তেমন করিবে না বরং তুলিয়া খাইবে। ধুলাবালি লাগিলে উহা পরিষ্কার করিয়া খাইবে। আর যদি নাপাক লাগিয়া যায় এবং উহা ধোয়া সম্ভব হয় তবে ধুইয়া খাইতে হইবে। আর ধোয়া সম্ভব না হইলে এমন স্থানে ফেলিবে যাহাতে পশুপাখী খাইতে পারে। কিছুতেই নষ্ট করিবে না। এই জন্য দস্তরখান বিছাইয়া খাওয়া সুন্নাত, যাহাতে পড়িয়া যাওয়া লোকমা ও খাদ্যকণায় ময়লা লাগিতে না পারে।

(শয়তানের জন্য উহা ছাড়িয়া না দেওয়া) ইহা দ্বারা প্রমাণ হইল যে, শয়তান আহার গ্রহণ করে। অন্য হাদীছে আছে বর্তন চাটিয়া না খাইলে কিংবা লোকমা ফেলিয়া রাখিলে উহা এই বলিয়া বদ দু'আ করিতে থাকে যে, তুমি যেমন আমাকে শয়তানের হাতে সোর্পদ করিয়াছ তেমনি আল্লাহ যেন তোমাকেও শয়তানের হাতে সোপর্দ করেন।

চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, একটি মাত্র সুন্নাতের উপর উদাসীনতার কারণে আমল না করিয়া প্রতিদিন আমরা আমাদের নিজেদের হাতে তৈয়ারকৃত খাবারের এবং নিজেদের কষ্টার্জিত পয়সা দ্বারা খরিদকৃত খাবারের বদ দু'আর পাত্র হইতেছি। ইহার চাইতে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে!

(রুমাল দ্বারা) আংগুল চাটিয়া খাইবার পরে রুমাল ব্যবহার করায় দোষের কিছু নাই। আংগুল চাটিয়া খাইবার তরীকা সম্পর্কে আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ)

বলেন, আল-আওছাত কিতাবে তাবরানী কর্তৃক হযরত কা'আব বিন আজারাহ-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে আংগুল চাটিয়া খাইবার তরীকা বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আছে–

رايت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل باصابعه الثلاث بالابهام و التى تليها و الوسطى ثم رآيته يلعق الثلاث قبل ان يمسحها الوسطى ثم التى تليها ثم الابهام *

আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বৃদ্ধাংগুলি এবং উহার সংলগ্ন আংগুল এবং মধ্যমা (এই তিন আংগুল) দ্বারা আহার করিতে দেখিয়াছি। অতঃপর (রুমাল দ্বারা মুছিয়া ফেলিবার পূর্বে) ঐ তিন আংগুল তাঁহাকে চাটিয়া খাইতে দেখিয়াছি। প্রথমে মধ্যমা। অতঃপর তৎসংলগ্ন, অতঃপর বৃদ্ধাংগুলি।

আপন শায়খের উদ্ধৃতি দিয়া আল্লামা আলকামী (রহঃ) বলেন, মধ্যমাকে আগে চাটিয়া খাইবার হিকমত সম্ভবতঃ এই যে, উহা অধিকতর লম্বা হইবার কারণে উহাতে খাদ্যকণা বেশী লাগিয়া থাকে। ইহাছাড়া চাটিয়া খাইবার সময় সাধারণতঃ আংগুলের ভিতরের দিকটা মুখের সামনে থাকে। সুতরাং মধ্যমা হইতে শুরু করিয়া বৃদ্ধাংগুলি পর্যন্ত চাটিয়া গেলে ডান দিক হইতে শুরু হইবে।

(তোমাদের প্রতিটি কাজে) লোকমার প্রসংগে এই কথাটি বলিবার উদ্দেশ্য হইল শয়তান সম্পর্কে উম্মতকে সামগ্রিকভাবে সতর্ক করা। অর্থাৎ তোমরা শয়তান হইতে গাফেল থাকিলে কি হইবে। সে কিন্তু তোমাদের কাহারও ব্যাপারে মুহূর্তের জন্য গাফেল হয় না। তোমাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রতিটি কাজে কর্মে সে ওত পাতিয়া থাকে এবং সুযোগ পাইবামাত্র বিভিন্ন উপায়ে (কখনও পাপে লিপ্ত করিয়া, কখনও আমল হইতে সরাইয়া, কখনো রিয়া পয়দা করিয়া, কখনো অন্তরে ওয়াসওয়াসা ঢালিয়া) তোমাদের সর্বনাশ করিতে সে সচেষ্ট। সুতরাং তোমাদেরও কর্তব্য হইল এই নিকৃষ্টতম দুশমন হইতে মুহূর্তের জন্য গাফেল না হওয়া এবং আল্লাহর নিকট শয়তান হইতে পানাহ চাওয়া এবং ইসতিগফার করা। কেননা ইসতিগফারকে শয়তান বড় ভয় পায়। হাদীছ শরীফে আছে, শয়তান আফসোস করিয়া বলে, আমি বহু কষ্ট করিয়া আদম সন্তানকে পাপে লিপ্ত করি। কিন্তু সে ইসতিগফার করিয়া সব মাফ করাইয়া লয়।

১৬৮। বিদ'আত চালু করিবার পরিণাম

اَلْعَاشِرُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ: «يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ اِلَى اللهِ تَعَالٰى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ﴿ كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهٗ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ﴾ [الانبياء: ١٠٣]، اَلَا وَإِنَّ اَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ، ﷺ، اَلَا وَإِنَّهٗ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ اُمَّتِيْ ، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ؛ فَاَقُوْلُ: يَا رَبِّ اَصْحَابِيْ ؛ فَيُقَالُ: اِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ﴾ اِلٰى قَوْلِهٖ: ﴿ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ [المائدة: ١١٧، ١١٨]، فَيُقَالُ لِيْ : إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . «غُرْلًا» اَيْ: غَيْرَ مَخْتُوْنِيْنَ.

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, হে লোক সকল! (পুনরুত্থানের পর) তোমাদিগকে নগ্নপদ, নগ্নদেহ ও খাতনাহীন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে সমবেত করা হইবে। (আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন,) তোমাদিগকে প্রথমবার যেইরূপ সৃষ্টি করিয়াছি সেই রূপে প্রত্যাবর্তন করাইব। ইহা আমার প্রতিশ্রুতি। অবশ্যই আমি (আমার প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ করিব। শুনিয়া রাখ, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাহাকে বস্ত্রাবৃত করা হইবে তিনি হইলেন ইবরাহীম (আঃ)।

শুনিয়া রাখ, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের একদল লোককে হাযির করা হইবে। অতঃপর তাহাদিগকে বামে (জাহান্নামের দিকে) লইয়া যাওয়া হইবে। তখন আমি (আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করিয়া) বলিব, ইয়া রব! ইহারা তো আমার সাথী। তখন (আমাকে) বলা হইবে, আপনি জানেন না, ইহারা আপনার পরে কি কি নূতন বিষয় সৃষ্টি করিয়াছে। তখন আমি আল্লাহর নেক বান্দা (হযরত ঈসা আঃ)-এর মত বলিব–

وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ..... الى قوله العزيز الحكيم *

(যতদিন আমি তাহাদের মাঝে ছিলাম ততদিন তাহাদের ব্যাপারে আমি তদারককারী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে ওয়াফাত দান করিলেন তখন আপনিই ছিলেন তাহাদের (আমলের) হিসাব রক্ষক। আর আপনি তো সর্ববিষয়েই সাক্ষী। আপনি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দেন তবে (কাহারও আপত্তি করিবার অধিকার নাই। কেননা) তাহারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন তবে আপনি তো মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান। তখন (নতুন নতুন বিষয় সৃষ্টির বিবরণ হিসাবে) আমাকে বলা হইবে, আপনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিবার পর হইতে বরাবর তাহারা (দ্বীন হইতে) ফিরিয়া যাইতেছিল। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(যেমন আমি প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছি) মানুষকে নগ্নপদ , নগ্নদেহ ও খতনাহীন অবস্থায় সমবেত করিবার প্রমাণ রূপে এই আয়াত তিলাওয়াত করা হইয়াছে। কেননা ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে, জন্মলাভের সময় তাহার যত অংগ ছিল সবই তখন অবিকল থাকিবে। কর্তিত অংশও বাদ যাইবে না।

ইহা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, স্বেচ্ছায় অংগচ্ছেদ করা বা কাহাকেও দান করা বা বিক্রয় করা বৈধ নহে। কেননা প্রত্যেক মানুষের অংগ প্রত্যংগ তাহার সহিত যুক্ত রাখাই আল্লাহর ইচ্ছা। ইহা অবশ্য প্ররোক্ষ প্রমাণ। এই সম্পর্কে শরীয়তের বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণও রহিয়াছে। তাহাছাড়া যুক্তিরও দাবী ইহাই। কেননা হস্তক্ষেপের জন্য মালিকানা জরুরী। অথচ আপন অংগ প্রত্যংগের উপর মানুষের মালিকানা নাই।

(সর্বপ্রথম যাহাকে বস্ত্রাবৃত করা হইবে তিনি হইলেন ইবরাহীম আঃ) প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইহা দ্বারা তো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হয়। উত্তর এই যে, আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে

না। আর বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা সমস্ত আম্বিয়া কেরামের উপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রমাণিত।

আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, কাহারও কাহারও মতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর এই বিশেষত্ব লাভের কারণ এই যে, তাঁহাকে নগ্ন অবস্থায় আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। আর বায়হাকী বর্ণিত এক হাদীছে আছে যে, ইহার বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই জোড়া পোশাক পরানো হইবে।

(ইহারা তো আমার সাথী) আল্লামা ইবনুন-নাহবী (রহঃ) বলেন, اصحابى বা সাথী দ্বারা ছাহাবা উদ্দেশ্য নহে। বরং সম্ভবতঃ এইখানে মুনাফিকদের কথা বলা হইয়াছে। দৃশ্যতঃ তাহারা ছাহাবা কেরামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই اصحابى বলা হইয়াছে।

আল্লামা মুহম্মদ বিন আল্লান (রহঃ) বলেন, اصحابُ দ্বারা উম্মতভুক্ত লোকসকল উদ্দেশ্য, যাহারা পরবর্তী যুগে পয়দা হইয়াছে। অর্থাৎ صحبة বা সাথীত্ব এই স্থলে রূপক অর্থবিশিষ্ট। হাদীছ শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার উম্মতকে অযুর নূরানী চিহ্ন দ্বারা চিনিবেন। এই অর্থই অধিকতর যুক্তিসংগত। কেননা শুরুতে رجال من امتى (আমার উম্মতের একদল লোক বলা হইয়াছে) رجال من اصحابى (আমার ছাহাবীদের একদল) বলা হয় নাই। এই ছূরতে তাহাদের দ্বীন হইতে ফিরিয়া যাইবার অর্থ হইবে, সরল পথ হইতে সরিয়া যাওয়া এবং বিভিন্ন নাফরমানি ও বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া। মূল ঈমান ত্যাগ করা নহে।

আল্লামা তীবী (রহঃ) বলেন, এখানে অল্প কতিপয় গোঁয়ার বেদুঈন-এর কথা বলা হইয়াছে, যাহারা ওয়াফতুন-নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল। মূলতঃ তাহারা ঈমানই আনিয়াছিল মুসলমানদের শান শওকত দেখিয়া। আবার মুরতাদও হইয়াছিল মুসলমানদের উপর ঘূর্ণায়মান দুর্যোগ দেখিয়া। পরিচিত ছাহাবায়ে কেরামের কাহারো বেলায় ইহা ঘটে নাই।

মোট কথা, এই যে, اصحابُ শব্দ দ্বারা ছাহাবা কেরামের শানে কোন প্রকার মন্দ কথা বলিবার কোন অবকাশ নাই।

হাদীছের শিক্ষা ঃ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই তরীকা ও সুন্নাত রাখিয়া গিয়াছেন উহার উপর অবিচল থাকা এবং সুন্নাতের সহিত সম্পর্কহীন নতুন কোন আকীদা বা আমল উদ্ভাবন না করা আল্লাহর গজব হইতে বাঁচিবার উপায়।

১৬৯। ক্ষতির সম্ভাবনাপূর্ণ বেহুদা কাজ হইতে বিরত থাকা

اَلْحَادِيْ عَشَرَ: عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ، ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: «اِنَّه لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ ، وَاِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ: اِنَّ قَرِيْبًا لِابْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ؛ فَنَهَاهُ وَقَالَ: اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَذْفِ وَقَال: «اِنَّهَا لَا تَصِيْدُ صَيْدًا» ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: اُحَدِّثُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ، ﷺ، نَهٰى

عَنْهُ، ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِفُ!؟ لَا اُكَلِّمُكَ اَبَدًا.

হযরত আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'খাযাক' হইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ইহা শিকার বধ করে না। শত্রুকেও ঘায়েল করে না। বরং চক্ষু ফুঁড়িয়া দেয় এবং দাঁত ভাংগিয়া ফেলে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত ইবনে মুগাফফাল (রাঃ)-এর জনৈক আত্মীয় একবার পাথর ছুঁড়িয়া মারিল। তখন তিনি তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর ছুঁড়া হইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ইহা কোন শিকার বধ করে না। কিন্তু লোকটি পুনরায় এইরূপ করিল। তখন তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে হাদীছ বলিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। অথচ তুমি পুনরায় পাথর ছুঁড়িতেছ (এবং সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ!) তোমার সহিত কখনই কথা বলিব না।

ফায়দা ঃ

'খাযক' অর্থ বৃদ্ধাংগুলি ও তর্জনীর সাহায্যে প্রস্তরকণা নিক্ষেপ করা অর্থাৎ একটির উপর প্রস্তরকণা রাখিয়া অপরটি দ্বারা উহা নিক্ষেপ করা। তবে এই নির্দিষ্ট রূপ উদ্দেশ্য নহে। যে কোন ভাবেই হউক অযথা খেলাচ্ছলে পাথর ছুঁড়িয়া মারিবার কথা এখানে বলা হইয়াছে।

এই হাদীছের আলোকে আতশবাজিসহ এমন যাবতীয় কাজ নিষিদ্ধ হইবে যাহাতে কোন ফায়দা নাই বরং সমূহ ক্ষতির আশংকা।

আলোচ্য হাদীছ হইতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ ও তাঁহার সুন্নাতের প্রতি ছাহাবা কেরামের আযমত ও মুহব্বত কি পরিমাণ ছিল তাহা কিঞ্চিত অনুমান করা যায়।

এক হাদীছে আছে, এই জাতীয় এক ঘটনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)ও তাঁহার এক পুত্রের সহিত আজীবন কথা না বলিবার কসম খাইয়াছিলেন।

এই তো ছিল ছাহাবায়ে কেরামের অবস্থা। অন্যদিকে আমাদের অবস্থা হইল এই যে, মুখে তো আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মুহব্বতের লম্বা চওড়া দাবী করি অথচ আমাদের চোখের সামনে কত শত সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ হইতেছে। সুন্নত লইয়া হাসি তামাশা হইতেছে। একের পর এক সুন্নাত মিটাইয়া দেওয়া হইতেছে। অথচ আমাদের অন্তরে ইহার জন্য কোন ব্যথা নাই। ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি নাফরত ও ঘৃণা নাই। বরং তাহাদের সহিত উঠা-বসা সবই বদস্তুর চলিতে থাকে।

বনী ইসরাঈলের ধ্বংসের কারণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তাহারা শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ হইতে দেখিয়া মুখে মুখে তো ইহার প্রতিবাদ করিত। কিন্তু উঠা-বসা, চলা-ফেরা ও একত্রে খানা-পিনা বন্ধ করিত না।

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, বিদ'আতী, পাপাচারী এবং হাদীছ

ও সুন্নাত তরককারীদের সংগ ত্যাগ করা এবং তাহাদের সহিত উঠা-বসা ও কথা-বার্তা বন্ধ রাখা কর্তব্য এবং তাহাদের সহিত স্থায়ীভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও কথা বন্ধ রাখা জায়েয আছে, যতদিন না তাহারা সুন্নাতের পথে ফিরিয়া আসে।

এক হাদীছে অবশ্য মুসলমান ভাইয়ের সহিত তিন দিনের বেশী কথা বন্ধ রাখিবার ব্যাপারে কঠোর নিষেধ আসিয়াছে। কিন্তু এই নিষেধ হইল ঐ ক্ষেত্রে যখন তাহা ব্যক্তিগত আক্রোশে বা দুনিয়াবী কারণে হয়।

১৭০। যুক্তিতে না ধরিলেও সুন্নাতের ইত্তেবা জরুরী

وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، يُقَبِّلُ الْحَجَرَ - يَعْنِي الْأَسْوَدَ - وَيَقُوْلُ: إِنِّيْ أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَلَوْلَا أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ، ﷺ، يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

তাবে'ঈ হযরত 'আবিস বিন রাবীআ (রহঃ) বলেন, ওমর (রাঃ)-কে আমি হাজারে আসওয়াদ চুমু খাইতে দেখিয়াছি এবং এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র। (কাহারও) উপকারও করিতে পার না, ক্ষতিও করিতে পার না। যদি আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুমু খাইতে না দেখিতাম তবে তোমাকে চুমু খাইতাম না।

ফায়দা ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) ইহা সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার (হযরত) ওমর (রাঃ)-কে দেখিলাম; হাজারে আসওয়াদকে তিনবার চুমু খাইলেন। অতঃপর বলিলেন, তুমি এক পাথর মাত্র, উপকার করিতে পার না, ক্ষতিও করিতে পার না। যদি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুমু খাইতে না দেখিতাম তবে আমি তোমাকে চুমু খাইতাম না। অতঃপর ওমর (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি এইরূপ করিতে (ও বলিতে) দেখিয়াছি।

আল্লামা তাবরানী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)–এর এইরূপ করিবার হিকমত এই ছিল যে, লোকেরা তখন সদ্য মূর্তিপূজা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। তাই তিনি আশংকা করিয়াছিলেন যে, অজ্ঞ লোকেরা হয়ত হাজারে আসওয়াদ চুমু খাওয়াকে পাথরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ধারণা করিয়া বসিবে। যেমন জাহেলী যুগে পাথরের মূর্তি সম্পর্কে তাহারা ধারণা করিত।

(যদি আমি) হযরত ওমর (রাঃ)–এর এই মন্তব্যে দ্বীনী বিষয়ে শরীয়তের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং হিকমত ও রহস্য না জানা সত্ত্বেও সুন্নাতের পূর্ণ ইত্তেবা প্রতিফলিত হইতেছে। বস্তুতঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সমস্ত কথা ও কাজের হিকমত ও তাৎপর্য আমাদের জানা নাই সেই গুলির ইত্তেবা করিবার ক্ষেত্রে ইহা এক বুনিয়াদী উছূল।

যে সমস্ত অজ্ঞ লোকেরা হাজারে আসওয়াদের নিজস্ব গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্বাস করে হাদীছে তাহাদের ধারণা খণ্ডন করা হইয়াছে। আরও বোঝা যায় যে, আমল বা আকীদার ক্ষেত্রে ফাসাদ সৃষ্টির আশংকা দেখা দিলে ইমাম ও মুরশিদের কর্তব্য হইল কথায় ও কাজে প্রকৃত হাকীকত বয়ান করিয়া দেওয়া।

অধ্যায় – ১৭

আল্লাহর হুকুম পালনের অপরিহার্যতা

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا *

না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তাহারা মুমিন হইবে না যতক্ষণ না তাহারা আপনাকে নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসাকারী রূপে মানিয়া লয়। অতঃপর আপনার ফায়সালার ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে তাহারা কোন রূপ অসুবিধা বোধ না করে এবং পূর্ণ আন্তরিকতাসহ তাহা মানিয়া লয়।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

اِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ *

মুমিনদের মাঝে (কোন বিষয়ে) ফায়সালা করিবার জন্য যখন তাহাদিগকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন ইহাই তাহাদের উপযুক্ত কথা যে, আমরা শুনিলাম এবং (খুশী মনে) মানিয়া লইলাম। আর উহারাই সফলকাম।

ফায়দা ঃ

(না, আপনার প্রতিপালকের শপথ) পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শুরুতে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে কিছু বিবরণ উল্লেখিত হইয়াছে। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) اسباب النزول কিতাবে ইহার শানেনুযূল সম্পর্কে একাধিক মত উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন মতে হযরত যোবায়র (রাঃ)–এর সহিত এক আনছারীর ক্ষেতে পানি দেওয়া সংক্রান্ত ঝগড়া ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালা দিলেন যে, যোবায়র প্রথমে ক্ষেতে পানি দিবে। অতঃপর পার্শ্ববর্তী লোকের জন্য পানি ছাড়িয়া দিবে। তখন আনছারী লোকটি বলিয়া উঠিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি আপনার ফুফাত ভাই বলিয়াই কি এই ফায়সালা দিলেন? হযরত যোবায়র (রাঃ) বলেন, আমি মনে করি যে, এই ঘটনা উপলক্ষেই এই আয়াত নাযিল হইয়াছে। ছিহা সিত্তায় এই বর্ণনা রহিয়াছে।

অন্য এক মতে ইহার শানেনুযূল এই যে, দুইজন লোক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিচার পেশ করিল। তিনি উভয়ের মাঝে বিচার করিলেন। তাঁহার রায় যাহার বিরুদ্ধে গেল সে বলিল, আমাদিগকে ওমরের নিকট পাঠাইয়া দিন। উভয়ে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট গেল। দ্বিতীয় লোকটি বলিল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পক্ষে ফায়সালা দিয়াছেন। কিন্তু আমার এই প্রতিপক্ষ বলিয়া উঠিল যে, আমাদিগকে ওমরের নিকট পাঠাইয়া দিন। ঘটনা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, আমি ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তোমরা নিজ স্থানেই অপেক্ষা কর। তখন উভয়ের মাঝে ফায়সালা করিব। পরে তিনি তলোয়ার হাতে ফিরিয়া আসিলেন এবং যে লোকটি বলিয়াছিল, "আমাদিগকে ওমরের নিকট পাঠাইয়া দিন।" তাহাকে হত্যা করিলেন। এই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল।

হাদীছসমূহ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শুরুতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছটি এবং উক্ত অধ্যায়ে বর্ণিত অন্যান্য হাদীছও বর্তমান অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্য।

১৭১। ছাহাবা কেরামের ইতা'আতের নমুনা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، ﷺ، ﴿ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِيْ الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ﴾ الآيَةَ [البقرة: ٢٨٣]، اشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ، ﷺ، فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ، ﷺ، ثُمَّ بَرَكُوْا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا: اَيْ رَسُوْلَ اللهِ كُلِّفْنَا مِنَ الاَعْمَالِ مَا نُطِيْقُ: الصَّلَاةَ وَالْجِهَادَ وَالصِّيَامَ وَالصَّدَقَةَ، وَقَدْ اَنْزَلَتْ عَلَيْكَ هٰذِهِ الْآيَةَ وَلَا نُطِيْقُهَا. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ، ﷺ: «اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَقُوْلُوْا كَمَا قَالَ اَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِن قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُوْلُوْا: سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ»، فَلَمَّا اقْتَرَاَهَا[৩] الْقَوْمُ، وَذَلَّتْ بِهَا اَلْسِنَتُهُمْ؛ اَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى فِيْ اِثْرِهَا: ﴿ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴾ فَلَمَّا فَعَلُوا ذٰلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالٰى؛ فَاَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا ﴾، قَالَ: نَعَمْ ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ قَالَ: نَعَمْ ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ قَالَ: نَعَمْ ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴾ قَالَ: نَعَمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই আয়াত নাযিল হইল–

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ *

আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহরই মালিকানাধীন। আর তোমাদের অন্তরে যাহা কিছু আছে তাহা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর আল্লাহ তোমাদের নিকট হইতে উহার হিসাব লইবেন। (আয়াতের শেষ পর্যন্ত।) তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবা কেরামের নিকট উহা কঠিন মনে হইল। তাই তাঁহারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইলেন এবং নতজানু হইয়া বসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (ইতিপূর্বে) আমাদের উপর এমন আমল ফরয করা হইয়াছিল যাহা আমরা পালন করিতে পারি। যেমন, নামায, জিহাদ, রোযা ও ছাদাকা। কিন্তু এখন আপনার উপর এই আয়াত নাযিল হইয়াছে যাহা পালন করিতে আমরা সক্ষম নহি। (তখন) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি তোমাদের পূর্ববর্তী দুই কিতাবী কাওমের ন্যায় سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا (আমরা শুনিলাম এবং অমান্য করিলাম) বলিতে চাহ? বরং এইভাবে বল, سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْر আমরা শুনিলাম এবং আনুগত্য করিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার মাগফিরাত কামনা করি। আর তোমার নিকটই (আমাদিগকে) ফিরিয়া যাইতে হইবে। যখন তাহারা এই আয়াত তিলাওয়াত করিল এবং এই আয়াতের ব্যাপারে তাহাদের জিহ্বা সহজ হইয়া গেল তখন আল্লাহ উক্ত আয়াতের পর এই আয়াত নাযিল করিলেন–

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ *

রাসূলের প্রতি তাঁহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা কিছু নাযিল করা হইয়াছে তাহার প্রতি তিনি ঈমান আনিয়াছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই আল্লাহর প্রতি এবং তাঁহার ফিরিশতাগণের প্রতি এবং তাঁহার কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁহার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং (এই ঘোষণা দিয়াছে যে,) আমরা তাঁহার রাসূলগণের কাহারও মাঝে কোন পার্থক্য করি না এবং তাহারা (আরও) বলে, আমরা শুনিলাম এবং মানিয়া লইলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার মাগফিরাত কামনা করি। আর আপনার নিকটই তো ফিরিয়া যাইতে হইবে।

যখন ছাহাবা কেরাম (এই আয়াত) পড়িতে লাগিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত রহিত করিলেন এবং নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন–

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا *

আল্লাহ কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না। তাহার জন্য তাহার নেক কাজের পুরস্কার রহিয়াছে এবং তাহার জন্য তাহার মন্দ কাজের শাস্তি রহিয়াছে।

(তাহারা বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ভুলিয়া গেলে কিংবা ভুল করিলে আপনি আমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না।

যখন ছাহাবা কেরাম (এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন তখন) আল্লাহ বলিলেন, হাঁ,

(আমি কবুল করিলাম।) তাঁহারা যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন–

رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا *

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই প্রার্থনা কবুল করুন। আর আপনি আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর যেমন কঠিন হুকুম আহকামের বোঝা চাপাইয়াছিলেন আমাদের উপর তেমন কোন বোঝা চাপাইবেন না।

(তখন) আল্লাহ্ বলিলেন, হাঁ, (আমি কবুল করিলাম।)

ছাহাবা কেরাম যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন–

رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ *

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন কোন দায়িত্বভার চাপাইবেন না যাহা বহন করিবার সাধ্য আমাদের নাই।

(তখন) আল্লাহ্ বলিলেন, হাঁ, (আমি কবুল করিলাম।)

وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ *

আর আমাদের পাপ মোচন করুন এবং আমাদিগকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি করুণা করুন।

আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির কাওমের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য করুন।

(তখন) আল্লাহ্ বলিলেন, হাঁ, (আমি কবুল করিলাম।)(মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(আয়াতের শেষ পর্যন্ত) পূর্ণ আয়াত এই– "সুতরাং যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা আযাব দিবেন। আর আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (সুতরাং তোমাদের হিসাব লওয়া এবং শাস্তি বা পুরস্কার দেওয়া তাঁহার অসাধ্য নহে।)

(যাহা পালন করিতে আমরা সক্ষম নই) ছাহাবা কেরামের অস্বাভাবিক ভীতি এবং এই মন্তব্যের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, মনের যেই সকল চিন্তা ভাবনা তাহাদের অজান্তে আসিয়া পড়ে এবং যাহা রোধ করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই সেইগুলির ব্যাপারে তাঁহাদিগকে জওয়াবদেহী করা হইবে। তাই ইহাকে তাঁহারা সাধ্যাতীত মনে করিয়াছিলেন।

(দুই কিতাবী সম্প্রদায়) অর্থাৎ ইহুদী ও নাছারা।

(আমরা তাহার রাসূলগণের কাহারও মাঝে পার্থক্য করি না) যেমন ইহুদী ও নাছারাগণ কোন কোন নবীর উপর ঈমান আনিয়াছে আবার কোন কোন নবীকে অস্বীকার করিয়াছে। আমরা এইরূপ পার্থক্য করি না বরং সকলকে আল্লাহর প্রেরিত সত্য রাসূল বলিয়া বিশ্বাস করি। তবে এক নবীর উপর অন্য নবীর শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করি না। কেননা আল্লাহ পাক বলিয়াছেন–

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ *

ঐ রাসূলগণ তাঁহাদের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি।

(শুনিলাম এবং মানিয়া লইলাম) মুফাসসির আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, যখন ছাহাবা কেরাম আল্লাহর আয়াত ও হুকুম অম্লান বদনে গ্রহণ করিয়া سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا বলিলেন, তখন আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে তাঁহাদের প্রশংসা করিলেন এবং সান্ত্বনা বাণী শুনাইলেন যে, কাহাকেও সাধ্যাতীত কোন হুকুম আল্লাহ পাক দেন না। ইহা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আত্মনিবেদনের সুফল ও তাৎক্ষণিক পুরস্কার। আর আখিরাতের মহাপুরস্কার তো আছেই। পক্ষান্তরে বনী ইসরাঈল যখন অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়া বলিল سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا তখন আল্লাহ পাক তাহাদের উপর অপদস্থতা, অভাব-অনটন ও উচ্ছেদের শাস্তি চাপাইয়া দিলেন। ইহাই অবাধ্যতার তাৎক্ষণিক শাস্তি। আর আখিরাতের মহাশাস্তি তো আছেই। ইহাই হইল কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার অটল বিধান। নিঃশর্ত আনুগত্য যাহারা করিবে তাহারা দুনিয়াতেও কামিয়াব হইবে আখিরাতেও কামিয়াব হইবে। আর যাহারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করিবে তাহারা দুনিয়াতেও অপদস্থ হইবে, আখিরাতেও শাস্তি ভোগ করিবে। আল্লাহ আমাদিগকে পানাহ দান করুন। আমীন।

(রহিত করিলেন) পূর্ববর্তী اِنْ تُبْدُوْا আয়াতের মর্মার্থ এই যে, মনের গোপন বিষয়েরও হিসাব লওয়া হইবে। ইহার মধ্যে মনের ওয়াসওয়াসাও অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ নিজের অজান্তে মনের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা আসিয়া পড়ে। এমন কি আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহের ভাব জাগিয়া উঠে যাহা রোধ করিবার সাধ্য মানুষের থাকে না। উহারও হিসাব কিতাব হইবে। কিন্তু এই হুকুম ছাহাবা কেরাম যখন মানিয়া লইলেন তখন আল্লাহ পাক এই হুকুম রহিত করিয়া لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ আয়াত নাযিল করিলেন, যাহার মর্মার্থ এই যে, মনের ওয়াসওয়াসার জন্য পাকড়াও হইবে না। যে সকল আলিম বলেন যে, পূর্ববর্তী আয়াতে ওয়াসওয়াসা অর্ন্তর্ভুক্ত ছিল তাহাদের মতে পরবর্তী আয়াত দ্বারা উহা রহিত করা হইয়াছে। আর যাহারা বলেন যে, ওয়াসওয়াসা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ছাহাবা কেরাম উহাকে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন মাত্র। তাহাদের মতে এখানে نسخ বা রহিতকরণের অর্থ ছাহাবা কেরামের মনের উৎকণ্ঠা দূর করিয়া প্রকৃত বিষয় পরিষ্কার করিয়া দেওয়া।

(যেমন পূর্ববর্তীদের উপর) পূর্ববর্তীদের উপর এমনই কঠিন হুকুম ছিল যে, তাহাদের তাওবা ছিল হত্যা করা এবং যাকাতের পরিমাণ ছিল মালের চারি ভাগের এক ভাগ এবং শরীরে নাজাসাত লাগিলে পাক করিবার ছূরত ছিল ঐ স্থান কাটিয়া ফেলা।

(সাহায্য করুন) আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতে বান্দাদিগকে শিক্ষা দান করা হইয়াছে যে, কিভাবে আল্লাহর দারবারে দু'আ করিতে হইবে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) এই সূরা শেষ করিয়া 'আমীন' বলিতেন।

অধ্যায় – ১৮

বিদ'আত ও নব-উদ্ভাবিত বিষয় সম্পর্কে নিষেধবাণী

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ الَّا الضَّلَالُ *

হক (ও সত্যের) পরে গোমরাহি ছাড়া আর কি থাকিতে পারে?

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন– مَا فَرَّطْنَا فِىْ الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ *

কিতাবে কোন কিছুই (বর্ণনা করা) আমি বাদ দেই নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ *

যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ কর তবে উহাকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দিকে (অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাহর দিকে) রুজু কর।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَ اِنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ *

আর ইহা আমার সরল সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তাহা অনুসরণ কর। (উহার বিপরীত) অন্যান্য পথ অনুসরণ করিও না। তবে উহা তোমাদিগকে তাঁহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ *

আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর। তখন আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।

এই বিষয়ে আয়াত সুপ্রচুর ও সুপরিচিত

এবং হাদীছের সংখ্যাও সুপ্রচুর ও সুপ্রসিদ্ধ। সুতরাং শুধু মাত্র অল্প কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করিব।

হাদীছসমূহ

১৭২। কোন বিদ'আত গ্রহণযোগ্য নহে।

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، ﷺ: «مَنْ اَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলিয়াছেন, যে আমাদের এই দ্বীনের মাঝে এমন নূতন কোন বিষয় সৃষ্টি করিবে যাহা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নহে তাহা প্রত্যাখ্যাত। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করিল যাহার উপর আমাদের (দ্বীনের) অনুমোদন নাই তাহা প্রত্যাখ্যাত।

ফায়দা ঃ

(যাহা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নহে) অর্থাৎ যাহা শরীয়তের কোন উছূল ও বিধান দ্বারা সমর্থিত নহে। সুতরাং বুঝা গেল যে, যে সকল নূতন বিষয় শরীয়তের কোন না কোন উছূল দ্বারা সমর্থিত তাহা বিদ'আত নহে বরং দ্বীনেরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কোন কোন নূতন বিষয় ওয়াজিব বা অবশ্যপালনীয়। আবার কোন কোনটি মুস্তাহাবভুক্ত।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ বিদ'আতের বিরুদ্ধে এমন অকাট্য দলীল যাহা পূর্ণ হিফাযতপূর্বক যাবতীয় বে-শরা কাজ খণ্ডনের জন্য সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচার করা কর্তব্য।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, ইহা শরীয়তের অন্যতম বুনিয়াদী উছূলরূপে গণ্য। আল্লামা তূফী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছটিকে শরীয়তের দলীল সমষ্টির অর্ধেক বলা যাইতে পারে।

হাদীছের শিক্ষা ঃ আলোচ্য হাদীছের শিক্ষা এই যে, দ্বীনের নামে যে কোন বিষয় উপস্থিত হইবে উহাকে কোরআন ও সুন্নাহ (এবং ইজমা ও কিয়াসের) আলোকে যাচাই করা কর্তব্য। উহাতে বিষয়টির সমর্থন পাওয়া গেলে তাহা গ্রহণ করা হইবে। অন্যথায় রদ করা হইবে। পূর্বপুরুষের যামানা হইতে প্রচলিত কিংবা অমুক পীর ফকীর করিতেছেন– এইসকল যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে।

১৭৩। কিয়ামত অতি নিকটবর্তী

وَعَن جَابِرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ، ﷺ، إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتّٰى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ» وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ» وَيَقْرُنُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، ﷺ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنهُ، حَدِيثُهُ السَّابِقُ فِي بَابِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ.

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে) ভাষণ দিতেন তখন তাঁহার চক্ষু দুইটি লাল হইয়া যাইত এবং আওয়াজ বড় হইয়া যাইত এবং ক্রোধ প্রবল হইত। এমন কি মনে হইত যেন তিনি কোন হানাদার বাহিনী সম্পর্কে এক সতর্ককারী (যিনি তাহার উদাসীন জাতিকে) অস্থিরভাবে

বলিতেছেন, তোমাদের উপর সকালে হামলা হইবে এবং তোমাদের উপর সন্ধ্যায় হামলা হইবে। (সুতরাং তোমরা সতর্ক হও।) তিনি বলিতেন, কিয়ামতসহ আমি প্রেরিত হইয়াছি এই দুইটির মত। (এই কথা বলিয়া) তিনি তাঁহার তর্জনী ও মধ্যমা অংগুলিদ্বয় একত্র করিতেন।

তিনি আরও বলিতেন, সর্বোত্তম বচন হইল আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম তরীকা হইল মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা। আর নিকৃষ্টতম বিষয় হইল নব-উদ্ভাবিত বিষয় সমূহ। আর প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী। অতঃপর তিনি বলিতেন, আমি প্রত্যেক মুমিনের উপর তাহার নিজের চাইতে বেশী অধিকার রাখি। কেহ যদি সম্পদ রাখিয়া (মারা) যায় তবে উহা তাহার পরিবারবর্গের জন্য। আর যদি কেহ ঋণ বা অসহায় পোষ্য সন্তান রাখিয়া যায় তবে (সন্তান) আমার তত্ত্বাবধানে এবং (ঋণ) আমার যিম্মায়। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(চক্ষুদ্বয় লাল হইত) কেননা তাঁহার পূর্ণ সত্তায় তখন আসমানী জালাল বা 'প্রতাপ' প্রকাশ পাইত এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী উম্মতের বিচিত্র অবস্থা এবং তাহাদের অধিকাংশের দ্বীনী অধঃপতন তাঁহার সামনে বিমূর্ত হইত।

(যেন তিনি হানাদার বাহিনী সম্পর্কে সতর্ককারী) এই ব্যক্তি যেমন আপন কাওমের প্রতি অত্যধিক দরদের কারণে চিৎকার করিয়া তাহাদিগকে হানাদার বাহিনীর আসন্ন হামলা সম্পর্কে সতর্ক করিতেছে এবং নিজেদের ধ্বংস ও বিপর্যয় সম্পর্কে তাহাদের উদাসীনতার কারণে ক্রোধে টগবগ করিতেছে; রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থাও তদ্রূপ। উম্মতের প্রতি তাঁহার অপরিসীম দয়ামায়া ও দরদের কারণে এবং কিয়ামতের ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে উম্মতের উদাসীনতার কারণে উচ্চকণ্ঠে ক্রোধপূর্ণ ভাষায় তাহাদিগকে তিনি সতর্ক করিতেন।

(তর্জনী ও মধ্যমা) এই দুই আংগুল একত্র করিবার উদ্দেশ্য হইল কিয়ামতের নৈকট্য বুঝানো। আরেকটা উদ্দেশ্য এই কথা বুঝানো যে, এই দুই আংগুলের মাঝে যেমন অন্য কোন আংগুল নাই। তদ্রূপ তাঁহার ও কিয়ামতের মাঝে আর কোন নবী নাই।

(নিকৃষ্টতম বিষয় হইল নব-উদ্ভাবিত বিষয় সমূহ) অর্থাৎ কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমায় যাহা সরাসরি বিদ্যমান নাই কিংবা সেখানে উহার কোন সূত্র নাই।

(প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী) এই সংক্রান্ত আলোচনা 'সুন্নাত ও তাহার আদব সমূহ নিষ্ঠার সহিত পালন' অধ্যায়ে ইরবায বিন সারিয়া—এর হাদীছে বর্ণনা করা হইয়াছে।

(আমি প্রত্যেক মুমিনের উপর তাহার নিজের চাইতে বেশী অধিকার রাখি।) এখানে নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতিধ্বনি করা হইয়াছে— اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ *

নবী মুমিনদের উপর তাহাদের নিজেদের চাইতে বেশী অধিকারী।

(আমার যিম্মায়) পরবর্তীকালে উহা ইমামের উপর বর্তাইয়াছে। তিনি উহা বাইতুল মাল হইতে আদায় করিবেন।

অধ্যায় – ১৯

ভাল কিংবা মন্দ পন্থা প্রবর্তন

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا *

আর যাহারা বলে, (হে) আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মাঝে (আমাদের জন্য) চক্ষুর শীতলতা দান করুন এবং আমাদিগকে মুত্তাকীগণের ইমাম (অগ্রপথিক) বানাইয়া দিন।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَ جَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا *

আমি তাহাদিগকে ইমাম বানাইলাম, (মানুষকে) তাহারা আমার হুকুমে (কল্যাণের দিকে) পথ প্রদর্শন করে।

ফায়দা ঃ

ভালপন্থা অর্থ শরীয়তের উছূল ও বিধান যাহা সমর্থন করে। আর মন্দ পন্থা অর্থ যাহা উহার বিপরীত অর্থাৎ যাহা শরীয়তের কোন উছূল ও বিধান দ্বারা সমর্থিত নহে।

(আর যাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক!) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনগণের কতিপয় উত্তম গুণ উল্লেখপূর্বক তাহাদের প্রশংসা করিতেছেন। তন্মধ্যে একটি গুণ স্ত্রী সন্তানদের সৎ ও পরহেযগার হইবার দু'আ। বস্তুতঃ স্ত্রী-সন্তানদের জন্য দু'আ করা এবং তাহাদিগকে দ্বীনের উপর গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টারত থাকাই হইল মুমিনের অন্যতম কর্তব্য। হাদীছ শরীফে আছে যে, নেক স্ত্রীই হইল দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। তদ্রূপ নেক সন্তান লাভ করা মানুষের জন্য অতি বড় সৌভাগ্য। হাদীছ শরীফে আছে, কেয়ামতের দিন মানুষ তাহার আমলনামায় এমন কিছু নেকী দেখিতে পাইবে যাহা সে করে নাই। তখন সে জানিতে চাহিবে যে, এইগুলি কোথা হইতে আসিল। তখন ফিরিশতাগণ বলিবেন, তোমার সন্তান তোমার জন্য ইসতিগফার করিবার কারণে এইগুলি তোমার আমলনামায় লেখা হইয়াছে। একদল ওলামায়ে কেরাম বলেন, সন্তান যখন কোন নেক আমল করে তখন তাহার পিতা-মাতার আমলনামায় উহার দ্বিগুণ লেখা হয়।

(ইমাম বানাইয়া দিন) অর্থাৎ তাহারা যেন নেক আমলের ক্ষেত্রে আমাদের অনুসরণ করে। তাহা হইলে তাহাদের নেক আমলও আমাদের আমলনামায় জমা হইবে। (অবশ্য তাহাদের ছাওয়াব কোন অংশে কম হইবে না।)

হাদীছসমূহ

১৭৪। ভাল বা মন্দ আমালের সূচনাকারী

عَنْ اَبِي عَمْرٍو، جَرِيرِ بْنِ عَبدِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عنه، قال: كُنَّا فِي صَدْرِ النَّهارِ عندَ رسولِ الله، ﷺ، فَجاءَه قومٌ عُراةٌ مُجْتابِي النمارِ، اَوِ العَباءِ، مُتَقَلِّدِي السُّيوفِ، عَامَّتُهُم من مُضَر، بَلْ كلُّهم مِنْ مُضر؛ فَتَمَعَّرَ رسولُ الله، ﷺ، لِمَا رَاَى بِهم مِنَ الفاقة؛ فَدَخلَ ثم خَرجَ، فَاَمَرَ بلالاً فَاَذَّنَ واقامَ، فَصَلّى ثم خَطبَ؛ فقال: ﴿ يااَيُّها الناسُ اتَّقوا رَبَّكم الذي خَلَقكم من نَفْسٍ وَاحدةٍ ﴾ الى اخر الاية: ﴿ اِنَّ اللهَ كانَ عليكم رقيبًا ﴾، والايةَ الاخرى التي في اٰخرِ الحَشْرِ: ﴿ يا ايُّها الذين اٰمنوا اتَّقوا اللهَ وَلْتَنظُرْ نفسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ تَصَدَّقَ رَجلٌ مِنْ ديناره مِنْ دِرْهَمِهِ من ثَوْبِه من صاعِ بُرِّه من صاعِ تَمرِه، حتى قال: «وَلو بِشِقِّ تَمْرَةٍ»، فجاءَ رجلٌ مِنَ الأنصارِ بِصُرَّةٍ كادَتْ كَفُّه تَعْجِزُ عنها، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثم تَتابعَ الناسُ حَتّى رَاَيتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعامٍ وَثيابٍ، حتى رأيتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ، ﷺ، يَتَهَلَّلُ كأنه مذْهَبَةٌ؛ فقالَ رسول الله، ﷺ: «مَنْ سَنَّ في الإسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَه أجرُها، وَأجْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِه مِنْ غَيْرِ أن يَنْقُصَ مِن أجورِهِم شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ في الإسلامِ سُنةً سَيِّئةً كان عليه وِزْرُها وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعدِه من غيرِ أن يَنْقُصَ مِنْ أوْزارِهم شَيْءٌ» رواه مسلم(٢).

হযরত আবু আমর জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একবার আমরা দিনের প্রারম্ভভাগে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে ছিলাম। এমন সময় কিছুলোক বস্ত্রহীন, চট কিংবা 'আবা পরিহিত এবং গলায় তলোয়ার ঝুলানো অবস্থায় তাঁহার নিকট আসিয়া হাযির হইল। তাহাদের অধিকাংশ মোযর গোত্রের ছিল। বরং তাহারা সকলেই মোযার গোত্রের ছিল। তাহাদের দারিদ্র্যাবস্থা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক মলিন হইয়া গেল।

তখন তিনি (ঘরের ভিতরে) প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পর বাহির হইলেন এবং (হযরত) বিলাল (রাঃ)-কে (আযানের) হুকুম দিলেন। তিনি আযান ও ইকামত দিলেন। তখন তিনি নামায আদায় করিলেন। অতঃপর (ছাহাবা কেরামকে) উপদেশ দিতে গিয়া يايها الناس হইতে আয়াতের শেষ رقيبا পর্যন্ত পড়িলেন।

(অর্থ) হে লোক সকল! তোমরা আপন প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে একজন মানুষ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন- এবং ঐ মানুষ হইতে তাহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আর উভয় হইতে অনেক নারী ও পুরুষ ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং সেই আল্লাহকে ভয় কর যাঁহার দোহাই দিয়া তোমরা একে অপরের নিকট প্রার্থনা কর। আর (তোমরা) আত্মীয়তা রক্ষা করিয়া চল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের পাহারাদার।

সেই সংগে সূরাতুল হাশরের শেষের দিকের এই আয়াতটিও পড়িলেন−

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ *

হে ঐ লোকেরা, যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য রাখে যে, আগামী দিনের জন্য সে কি অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে। (অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করিয়া বলিলেন,) কেহ তাহার দীনার হইতে, কেহ তাহার দিরহাম হইতে, কেহ তাহার কাপড় হইতে, কেহ তাহার গম হইতে, কেহ তাহার খেজুর হইতে (এইভাবে প্রত্যেকে) যেন (নিজ নিজ সাধ্যমত) দান করে। এমন কি তিনি বলিলেন, এক টুকরা খেজুর হইলেও যেন দান করে।

তখন একজন আনছারী একটি থলিয়া আনিলেন, (উহা এত ভারী ছিল যে বহন করিয়া আনিতে) তাহার হাত অক্ষম হইবার উপক্রম হইল। বরং অক্ষমই হইয়া গেল। অতঃপর লোকেরা একের পর এক দান করিতে লাগিল। এমন কি আমি খাদ্যদ্রব্য ও কাপড়ের দুইটি স্তুপ দেখিতে পাইলাম। আরও দেখিতে পাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক সোনালী বর্ণের মত ঝলমল করিতেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম তরীকা জারি করিবে সে উহার প্রতিদান এবং তাহার পরে যাহারা উহার উপর আমল করিবে উহার প্রতিদান লাভ করিবে। কিন্তু তাহাদের প্রতিদান কোন অংশে কমিবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ তরীকা চালু করিবে তাহার উপর উহার বোঝা এবং উহার উপর যাহারা আমল করিবে তাহাদের বোঝা চাপিবে। কিন্তু ইহাতে তাহাদের (গোনাহের) বোঝা কোন অংশে কম হইবে না। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(চেহারা মুবারক মলিন হইল) অর্থাৎ তাহাদের প্রতি স্বগোত্রীয় ধনীদের সাহায্য সহানুভূতি না থাকিবার কারণে তাহাদের জীবনে যে ভয়াবহ দারিদ্র্য নামিয়া আসিয়াছিল উহার কারণে তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। কেননা সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিবে কিফায়া হইল অভাবী লোকদের কষ্ট দূর করা, অন্নহীনকে অন্ন দান করা এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করা। আর এই মোযার গোত্রীয় লোকেরা অন্নহীন ও বস্ত্রহীন ছিল। কিন্তু গোত্রের সচ্ছল লোকেরা তাহাদের কষ্ট দূর করিবার জন্য আগাইয়া আসে নাই। এই সামগ্রিক বিষয়টি ছিলো মনোকষ্টের এবং চেহারা মলিন হইবার কারণ। নিছক তাহাদের দরিদ্রাবস্থা অবলোকনই ইহার কারণ নহে। কেননা ইহা তো উম্মতের নেককার লোকদের শান। ইহা তো আল্লাহর ওলীদের জন্য তোহফা।

(নামায পড়িলেন) প্রথমতঃ ইহা ফরয নামায ছিল। কেননা আযান-ইকামত ফরয নামাযের সহিত খাছ। দ্বিতীয়তঃ ইহা যোহরের নামায ছিল। কেননা দিনের প্রারম্ভভাগের ইহাই প্রথম ফরয নামায।

(হে লোক সকল!) আয়াতটি মক্কী। সেহেতু সম্বোধন মক্কাবাসীদের প্রতি। তবে ناس (বা লোকসকল) শব্দটির ব্যাপকতার কারণে বিষয়বস্তুটিও সাধারণ ও ব্যাপক হইবে। মক্কাবাসীদের মাঝে সীমাবদ্ধ হইবে না।

বিদ্যমান ঘটনার সহিত আয়াতের সংশ্লিষ্টতা এই দিক হইতে যে, গোটা মানবজাতি যে এক রক্তের এবং এক পিতা-মাতার সন্তান, প্রথমে ইহা স্মরণ করানো হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহকে ভয় করিবার এবং আত্মীয়তাকে ভয় করিবার কথা একত্র করা হইয়াছে। আর ইহা প্রমাণ করে যে, আত্মীয়তা-রক্ষার বিষয়টি আল্লাহর নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অতঃপর 'আল্লাহ তোমাদের পাহারাদার' আয়াতের এই শেষ কথাটি আল্লাহকে ভয়কারী সচ্ছল মুমিনকে অভাবী লোকদের, বিশেষতঃ দরিদ্র আত্মীয়দের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতি প্রকাশে অবশ্যই উদ্বুদ্ধ করিবে।

(একজন মানুষ হইতে) অর্থাৎ আদম (আঃ) হইতে আর তাঁহার জোড়া হইলেন আমাদের আদি মাতা হযরত হাওয়া (আঃ)।

(এমন কি এক টুকরা খেজুর হইলেও যেন দান করে) এখানে من অব্যয়টি আংশিকতা জ্ঞাপক। সুতরাং কথাটির অর্থ হইল, যদি দীনার বা দিরহাম বা অন্যান্য উল্লেখিত বস্তুগুলি পুরা দান করিবার সামর্থ্য না থাকে তবে অংশবিশেষ হইলেও দান করিবে। এমন কি দান করিবার মত কিছুই যদি না থাকে তবে এক টুকরা খেজুরের মত সামান্য জিনিস হইলেও দান করিবে। এমন কি নিজের প্রয়োজন বাদ দিয়াও দান করিবে। কেননা ইহা আত্মত্যাগের উচ্চস্তর। আল্লাহ এমন দানকারীদের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন–

و يؤثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصة *

নিজেদের প্রয়োজন সত্ত্বেও অন্যদিগকে তাহারা নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে।

(একটি থলিয়া আনিলেন) এক বর্ণনা মতে উহা দিরহামের থলিয়া ছিল।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, দ্বীনের কাজে চাঁদা চাহিলে না করা উচিত নহে। একটি গমের দানা হইলেও দান করিয়া শরীক থাকা উচিত। আর আল্লাহ দাতার দিল দেখেন। দানের পরিমাণ দেখেন না।

(ঝলমল করিতেছে) তাঁহার এই আনন্দের কারণ দুইটি। প্রথমতঃ একদল অভাবী মুসলমানের অভাব দূর হইল। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার ছাহাবাগণ তাঁহার আদেশ পালনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগাইয়া আসিয়াছেন এবং সকলেই নিজ নিজ সাধ্যমত দান করিয়া অভাবী মুসলমান ভাইদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের চূড়ান্ত করিয়াছেন।

(ভাল তরীকার প্রচলন করিবে) যদিও ঐ তরীকার উত্তম হওয়া শরীয়তের প্রত্যক্ষ বাণী দ্বারা প্রমাণিত না হয় বরং কিয়াস দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়।

প্রচলন করিবার অর্থ এই যে, কথা বা কাজের মাধ্যমে উহার প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিল। উহা করিতে কাহাকেও সাহায্য করিল কিংবা সে শুধু আমল করিল আর অন্যরা তাহাকে দেখিয়া অনুসরণ করিল। এই সকল ক্ষেত্রেই তাহার আমলনামায় অন্যদের আমলের ছাওয়াব জমা হইতে থাকিবে। যতদিন এই আমল চলিতে থাকিবে ততদিন বহু গুণে বর্ধিত হইয়া উহা তাহার আমলনামায় জমা হইতে থাকিবে। যেমন আপনার দাওয়াত গ্রহণ করিয়া দশজন মানুষ নামাযী হইল। তাহাদের কারণে আরও একশজন নামাযী হইল। এইভাবে কেয়ামত পর্যন্ত নামাযীর সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল। এইভাবে সর্বশেষ যাহারা নামাযী হইল তাহাদের আমলের ছাওয়াব তাহাদের পূর্ববর্তীদের (যাহাদের উছিলায় তাহারা নামাযী হইয়াছে) আমলনামায় জমা

হইবে। আবার এই আমলনামার ছাওয়াব তাহাদের পূর্ববর্তীদের আমলনামায় জমা হইবে। এইভাবে হইতে হইতে আপনার আমলনামায় সকলের নামাযের ছাওয়াব জমা হইতে থাকিবে। আপনি কবরে শুইয়া শুইয়া লক্ষ কোটি নামাযের ছাওয়াব পাইতে থাকিবেন। সুবহানাল্লাহ!

যাহারা বিভিন্ন খোঁড়া যুক্তি দেখাইয়া পূর্ববর্তী বুজুর্গানে দ্বীনের, বিশেষতঃ ছাহাবা কেরামের সমালোচনা করিতে আনন্দবোধ করেন তাহারা একবার ভাবিয়া দেখুন; কেয়ামত পর্যন্ত সকল পরবর্তীদের কত অসংখ্য আমল প্রতিমুহূর্তে তাঁহাদের আমলনামায় জমা হইতে থাকিবে। সুতরাং তাঁহাদের ও আমাদের মাঝে মর্যাদার ব্যবধান ও পার্থক্য কত এবং তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের নাগাল পাওয়া পরবর্তীদের পক্ষে কোনদিন সম্ভব কি না!

(মন্দ তরীকা) ভাল তরীকা সম্পর্কে যাহা কিছু বলা হইল মন্দ তরীকা সম্পর্কেও একই কথা মন্দ অর্থে প্রযোজ্য হইবে। অর্থাৎ একজনের দ্বারা কোন মন্দ আমল চালু হইবার পর কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ ঐ মন্দ আমল করিবে সকলের মন্দ আমলের গোনাহ প্রথম লোকটির আমলনামায় আসিয়া জমা হইতে থাকিবে।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের এই ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা প্রয়োজন যে, তাহার দ্বারা যেন কোনরূপ মন্দ কাজ বা কোন বিদ'আত চালু না হয়। কিংবা ঐ রূপ কিছু চালু হইবার ব্যাপারে তাহার বিন্দুমাত্র ভূমিকাও যেন না থাকে। নতুবা কবরে শুইয়া শুইয়া পরবর্তীদের সেই গোনাহের শাস্তি তাহাকেও ভোগ করিতে হইবে। আল্লাহ আমাদিগকে হিফাযত করুন। আমীন

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, من سن سنة حسنة অংশ দ্বারা كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة এর ব্যাপকতাকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। অর্থাৎ محدثة বা নব-উদ্ভাবিত বিষয়কেই শুধু বিদ'আত বলা হইবে এবং ঐ বিদ'আতকেই শুধু গোমরাহী বলা হইবে যাহা حسنة নহে অর্থাৎ শরীয়তের কোন সূত্র ও উছুল দ্বারা পরোক্ষভাবেও সমর্থিত নহে। ইতিপূর্বে এই আলোকেই বিদ'আতের পাঁচভাগে বিভক্তির কথা আলোচিত হইয়াছে।

হাদীছের শিক্ষা ঃ

১। গরীব অভাবীদিগকে (বিশেষতঃ যাহারা হাত পাতে না) তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত (ইকরামের সহিত)।

২। সামান্য পরিমাণ হইলেও আল্লাহর রাস্তায় দান করিতে থাকা উচিত।

৩। মুমিনের কর্তব্য এই বিষয়ে খেয়াল রাখা যে, তাহার দ্বারা যেন নেক আমল জারী হইতে থাকে। কোন বিদ'আত বা গোনাহ যেন তাহার দ্বারা জারী না হয়।

১৭৫। প্রথম হত্যাকারী হাবীলের পরিণাম

وَعَنِ ابْنِ مسعودٍ رضي الله عنه، أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إلا كانَ عَلى ابْنِ آدمَ الأول (٢) كِفْلٌ من دَمِها لأنه كانَ أولَ مَنْ سَنَّ القَتْلَ» متفق عليه(٣)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হইবে তাহার রক্তপাতের পাপের কিছু অংশ (হযরত) আদম (আঃ)-এর প্রথম পুত্রের উপর বর্তাইবে। কারণ সে-ই হইল প্রথম ব্যক্তি যে হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত করিয়াছিল। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

তাহার নাম কাবীল। সে আপন ছোট ভাই হাবিলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছিল। হযরত আদম (আঃ)-এর এই দুই পুত্রের ঘটনা কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ * لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ اِنِّىْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ * اِنِّىْۤ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِىْ وَ اِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ * فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ * فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ قَالَ يٰوَيْلَتٰۤى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ *

আপনি তাহাদিগকে (হযরত) আদম (আঃ)-এর দুই পুত্রের ঘটনা সত্যভাবে তিলাওয়াত করিয়া শুনান। যখন তাহারা উভয়ে কিছু উৎসর্গ নিবেদন করিল। তখন তাহাদের একজনের পক্ষ হইতে কবুল করা হইল আর অপরজনের পক্ষ হইতে কবুল করা হইল না। সে বলিল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করিব। সে বলিল, আল্লাহ মুত্তাকীদের পক্ষ হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও তবে আমি তোমাকে হত্যা করিবার জন্য তোমার দিকে আমার হাত বাড়াইব না। কেননা আমি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই যে, তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপসহ (আল্লাহর সমীপে) প্রত্যাবর্তন করিবে। ফলে তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহাই জালিমদের শাস্তি। অতঃপর তাহার অন্তর তাহাকে ভ্রাতৃ-হত্যায় উদ্বুদ্ধ করিল। তাই সে তাহাকে হত্যা করিল এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। তখন আল্লাহ এক কাক প্রেরণ করিলেন যাহা মাটি খুঁড়িতেছিল যেন তাহাকে দেখাইয়া দেয় যে, কিভাবে আপন ভাইয়ের মৃতদেহ আবৃত করিবে। সে বলিল, হায় আফসোস! আমি কি এই কাকের সমতুল্য হইতেও ব্যর্থ হইলাম, যাহাতে আপন ভাইয়ের মৃতদেহ আবৃত করিতে পারি!

বিশুদ্ধ সনদে আল্লামা ইবনে কাছীর বর্ণনা করেন, যখন হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং সন্তানের জন্ম ও বংশবিস্তার শুরু হয় তখন প্রতি গর্ভে দুই জময পুত্র-কন্যা জন্ম লাভ করিত। বংশবিস্তারের জন্য হযরত আদম (আঃ)-এর পুত্র-কন্যাদের বিবাহ শাদীর প্রয়োজন ছিল। অথচ ভাই বোন ছাড়া আর কোন মানব সন্তান ছিল না। তাই মানববংশ রক্ষার প্রয়োজনে হযরত আদম (আঃ)-এর শরীয়তে এক গর্ভের সন্তানদিগকে অপর গর্ভের সন্তানদের জন্য গায়র মহরম ধরা হইত এবং এই গর্ভের পুত্র সন্তান ঐ গর্ভের কন্যাসন্তানকে বিবাহ করিত। সেই হিসাবে হাবীল কাবীলের এবং কাবীল হাবীলের

বোনকে বিবাহ করিয়াছিল। কাবীলের বোন ছিল সুন্দরী। পক্ষান্তরে হাবীলের বোন তেমন সুন্দরী ছিল না। আদমী শরীয়ত অনুযায়ী কাবিল তাহার জময বোনকে বিবাহ করিতে পারিল না। হাবীলের বোনকেই বিবাহ করিতে হইল। হাবীল সুন্দরী স্ত্রী লাভ করিল আর কাবীল অসুন্দরী স্ত্রী পাইল। ফলে তাহার অন্তরে হাবীলের প্রতি হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে বাবা হযরত আদম (আঃ)–এর নিকট জিদ ধরিল। বলিল। আমার বোন আমাকে দিন। আর তাহার বোন তাহাকে দিন। হযরত আদম (আঃ) কাবীলের শরীয়তবিরোধী আবদার প্রত্যাখ্যান করিলেন। অতঃপর তিনি পুত্র কাবীলকে তাহার ভুল বুঝাইয়া দিবার এবং উভয় পুত্রের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, তোমরা উভয়ে আল্লাহর নামে নিজ নিজ কোরবানী পেশ কর। যাহার কোরবানী গৃহীত হইবে বুঝিতে হইবে যে, সে-ই সত্য পথে আছে। অপরজনকে (তখন অনুতপ্ত হইয়া অল্লাহর দরবারে তাওবা করিতে হইবে।)

তখন নিয়ম এই ছিল যে, যাহার কোরবানী কবুল হইত, আসমান হইতে এক আগুন আসিয়া তাহার কোরবানী ভস্ম করিয়া দিয়া যাইত।

হাবীল ও কাবীল উভয়ে নিজ নিজ কোরবানী পেশ করিল। আর আসমানী আগুন কাবীলের কোরবানী স্পর্শ না করিয়া শুধু হাবীলের কোরবানী ভস্ম করিয়া দিয়া গেল। ইহাতে কাবীল অনুতপ্ত হইবার পরিবর্তে আরও ক্ষিপ্ত হইল এবং ভাইকে হত্যা করিবার ঘোষণা দিল। কিন্তু হাবীল পরম ধৈর্যধারণপূর্বক আপন ভাইকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, তুমি তাকওয়া অবলম্বন কর। তখন তোমার কোরবানীও কবুল হইবে। কেননা আল্লাহ শুধু মুত্তাকীদের কোরবানীই কবুল করিয়া থাকেন।

সুতরাং কাবীল যেমন কিয়ামত পর্যন্ত সকল হত্যাকারীর পাপের অংশীদার হইবে। তেমনি হাবীলও কিয়ামত পর্যন্ত সকল ছবরকারীদের ছাওয়াবের অংশীদার হইবেন।

অধ্যায় – ২০

হেদায়াত বা গোমরাহীর পথে আহ্বানের ফল

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ *

আর লোকদিগকে আপন প্রতিপালকের পানে আহ্বান করুন।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ *

আপনার প্রতিপালকের পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশের সহিত আহ্বান করুন।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى *

আর তোমরা নেক কাজ ও পরহেযগারির ব্যাপারে পরস্পর সহযোগিতা কর।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ *

আর তোমাদের মধ্য হইতে এমন একটি জামা'আত থাকা উচিত যাহারা মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করিবে।

ফায়দা ঃ

(প্রথম আয়াত) অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াত দিন, যাহাতে তাহারা আল্লাহর যাত ও ছিফাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং রিসালতকে স্বীকার করিয়া শরীয়তের আহকাম মোতাবিক ইবাদত করে।

হাদীসসমূহ

১৭৬। নেক কাজে সহযোগিতা করিবার ফযীলত

وَعن أبي مَسعودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَنصارِيِّ البَدْرِي رَضيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ دَلَّ على خَيْرٍ فَلَه مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِه» رواه مسلم(١).

হযরত আবু মাসউদ উকবা বিন আমর আল আনসারী, আল বদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন কল্যাণের পথ দেখায় তাহার জন্য কল্যাণকর্ম সম্পাদনকারীর অনুরূপ ছাওয়াব হইবে।

(মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

মুসলিম শরীফে হযরত আবু মসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনাতেই আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সওয়ারি হালাক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সওয়ারি দান করুন। তিনি বলিলেন, আমার নিকট তো এখন সওয়ারি নাই। অন্য একজন আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাহাকে এমন লোকের কথা বলিয়া দিতে পারি যে তাহাকে সওয়ারি দান করিবে। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি নেক কাজের পথ দেখাইয়া দিবে তাহার জন্য উক্ত নেক কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ ছাওয়াব রহিয়াছে।

مثل (অনুরূপ ছাওয়াব রহিয়াছে।) 'অনুরূপ' এর অর্থ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রহিয়াছে। আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ নেক কাজকারীর জন্য যেমন ছাওয়াব রহিয়াছে তেমনি তাহার জন্যও ছাওয়াব রহিয়াছে। সুতরাং উভয়ের জন্য ছাওয়াব থাকা শুধু প্রমাণিত হইল। একজনের ছাওয়াব হইল আমল করিবার কারণে আর দ্বিতীয়জনের ছাওয়াব আমলের ওছীলা বা মাধ্যম হইবার কারণে। কিন্তু উভয়ের ছাওয়াব সমান হওয়া জরুরী নহে। কাহারও কাহারও মতে এই সমতুল্যতা মূল ছাওয়াবের ক্ষেত্রে। কিন্তু আমলের দশগুণ

(বা আরও বেশী গুণ) ছাওয়াব দিবার যে কথা শরীয়তে বলা হইয়াছে ঐ ক্ষেত্রে উভয়ে সমান হইবে না। বরং উহা শুধু আমলকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন ইরশাদ হইয়াছে–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا *

যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ করিবে তাহার জন্য উহার দশগুণ ছাওয়াব রহিয়াছে।

আরও ইরশাদ হইয়াছে–

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ *

যাহারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তাহাদের উদাহরণ ঐ শস্যদানার ন্যায় যাহা সাতটি শীষ উৎপন্ন করিল। প্রতিটি শীষে রহিয়াছে একশত দানা। আর আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বর্ধিত করিয়া দেন।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, গুণের ক্ষেত্রেও উভয়ে সমান হইতে পারে। কেননা আমলের ছাওয়াব তো আল্লাহর পক্ষ হইতে দান মাত্র। অধিকার বা প্রাপ্য নহে। সুতরাং যাহাকে ইচ্ছা এবং যে কাজের উপর ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা তিনি ছাওয়াব দিতে পারেন। বিশেষতঃ নিয়তই যখন আমলের প্রাণ এবং আমলের কবুলিয়তের মাপকাঠি সেহেতু যদি সে নিজে কোন কারণে কোন আমল করিতে অপারগ হয় আর ঐ আমল সম্পাদনে সক্ষম কোন ব্যক্তিকে উহাতে উদ্বুদ্ধ করে বা সহায়তা করে তবে উভয়ের ছাওয়াব সমান হওয়া, এমন কি বেশী হওয়াতেও আশ্চর্যের কিছু নাই।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এই বক্তব্য ঐ সকল ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যেখানে অনুরূপ ছাওয়াবের কথা বলা হইয়াছে। যেমন হাদীছ শরীফে আছে–

من فطر صائما فله مثل اجره *

যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাইল তাহার জন্য রোযাদারের ছাওয়াবের অনুরূপ (ছাওয়াব) রহিয়াছে।

আল্লামা মুহম্মদ বিন আল্লান ছিদ্দীকী (রহঃ) বলেন, তিরমিযী শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছও আল্লামা কুরতুবীর বক্তব্য সমর্থন করে।

হাদীছটির (অংশ বিশেষ) এই–

و رجل ليس عنده شيء من الدنيا و تمنى انه لو كان ذلك لانفقته فيما انفقها فيه من الخيرات صاحبه فهما فى الاجر سواء (او كما قال)

আর ঐ লোক যাহার নিকট দুনিয়ার কোন মাল নাই অথচ সে আকাঙ্ক্ষা করিল যে, যদি তাহার নিকট মাল থাকিত তবে সেও উহা ঐ ক্ষেত্রে খরচ করিত যেই ক্ষেত্রে (অমুক) মালদার তাহার মাল ব্যয় করিয়াছে। তবে উভয়ে ছাওয়াবের ক্ষেত্রেও সমান হইবে। (এখানে 'অনুরূপ'-এর পরিবর্তে 'সমান' শব্দটি সমতুল্যতার অর্থে সুস্পষ্ট।)

১৭৭। সৎ পথে বা অসৎ পথে আহ্বানকারীর পরিণাম

وَعَنْ أبي هُريرةَ رضيَ الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ دَعا إلى هُدًى كانَ له مِنَ الأجرِ مِثْلُ أجورِ مَنْ تَبِعَه لا يَنْقُصُ ذلك مِنْ أجورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعا إلى ضَلالَةٍ كانَ عليهِ مِنَ الإثْمِ مِثْلُ آثامِ مَنْ تَبِعَه لا يَنْقُصُ ذلك مِنْ آثامِهم شَيْئًا» رواه مسلم(১).

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথে আহ্বান জানায় তাহার জন্য তাহার অনুসরণকারীদের ছাওয়াবের অনুরূপ ছাওয়াব হইবে। আর ইহা তাহাদের ছাওয়াবের কিছুই হ্রাস করিবে না। তদ্রূপ যে ব্যক্তি কোন গোমরাহীর পথে আহ্বান জানাইবে তাহার উপর তাহার অনুসরণকারীদের গোনাহের অনুরূপ গোনাহ বর্তাইবে। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

অর্থাৎ নিজের কাজ বা কথা দ্বারা কোন নেক আমল করিতে কিংবা বদ আমল তরক করিতে উদ্বুদ্ধ করিল কিংবা ঐ বিষয়ে সাহায্য করিল। গোমরাহীর পথে আহ্বানের ক্ষেত্রেও একই কথা।

(তাহাদের ছাওয়াবের কিছুই হ্রাস করিবে না।) কেননা উভয়ের ছাওয়াব লাভের ক্ষেত্র ভিন্ন। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হইয়াছে।

১৭৮। আল্লাহর বান্দাদের হিদায়াতের মাধ্যম হইবার ফযীলত

١٧٥ - وَعَنْ أبي العَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الساعِدِيِّ رضي الله عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال يومَ خيبر: «لأُعْطِيَنَّ الرايةَ غدًا رجُلاً يَفْتَحُ اللهُ على يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَه، وَيُحِبُّه اللهُ ورسولُه»، فَبَاتَ الناسُ يَدوكونَ لَيلتَهم أيُّهُمْ يُعطاها. فَلَمَّا أصبحَ النَّاسُ غَدَوْا على رَسولِ الله ﷺ: كُلُّهم يَرْجُو أنْ يُعْطاها، فقال: «اينَ عَلِيُّ بْنُ أبي طالِبٍ؟»، فقيل: يا رَسولَ اللهِ هو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قال: «فأرْسِلوا إليهِ»، فَأُتِيَ به، فَبَصَقَ رسولُ اللهِ ﷺ في عَيْنَيْهِ، وَدَعا له، فَبَرَأَ حتى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ به وَجَعٌ، فأعْطاه الرايةَ. فقال عَلِيٌّ رضيَ الله عنه: يا رسولَ اللهِ أُقاتِلُهم حَتّى يكونوا مِثْلَنا؟ فقال: «أنْفُذْ على رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِساحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى الإسْلامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِما يَجِبُ عليهم مِنْ حَقِّ اللهِ تعالى فيه، فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ الله بِكَ رَجُلاً واحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِن حُمْرِ النَّعَمِ»(٢) متفق عليه(٣).

হযরত আবুল আব্বাস সাহল ইবনে সা'আদ সা'ঈদী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, খায়বার যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আগামীকাল

আমি এমন একজনকে পতাকা দান করিব যাহার হাতে আল্লাহ্ বিজয় দান করিবেন। তিনি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসেন আর আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলও তাহাকে ভালবাসেন।

সারারাত্র ছাহাবা কেরাম এই আলোচনাতেই কাটাইলেন যে, কাহাকে ঝাণ্ডা দান করা হইবে। যখন সকাল হইল তখন তাহারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইলেন। সকলেরই আশা যে, তাহাকে পতাকা দান করা হইবে। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আলী বিন আবু তালিব কোথায়? বলা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার চোখে অসুখ। তিনি বলিলেন, তাহার নিকট লোক পাঠাও। তাহাকে হাযির করা হইল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার চক্ষুদ্বয়ে থুথু দিলেন এবং তাহার জন্য দু'আ করিলেন, ফলে তিনি এমন সুস্থ হইয়া গেলেন যেন তাহার (চক্ষুদ্বয়ে) কোন ব্যাথা ছিলই না। তখন তিনি তাহাকে ঝাণ্ডা দান করিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিব যতক্ষণ না তাহারা আমাদের মত হইয়া যায়? তিনি বলিলেন, তুমি ধীর স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হইয়া তাহাদের এলাকায় পদার্পণ করিবে। অতঃপর তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিবে এবং এই ক্ষেত্রে তাহাদের উপর আল্লাহর কি কি হক ওয়াজিব তাহা তাহাদিগকে জানাইবে। কেননা আল্লাহর কসম! তোমার দ্বারা আল্লাহ পাক একজন মানুষকেও যদি হিদায়াত দান করেন তবে তোমার জন্য তাহা লাল উটদলের চাইতে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

পিছনেও এই আলোচনা গিয়াছে যে, বান্দাকে আল্লাহর মুহব্বত করিবার অর্থ হইল তাহাকে আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজ করিবার এবং আল্লাহর বন্দেগীতে আত্মনিবেদিত হইবার তাওফিক দান করা। আর আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে বান্দার মুহব্বত করিবার অর্থ হইল আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের যাবতীয় হুকুম মানিয়া চলা এবং নিষেধ সমূহ পরিহার করিয়া চলা।

(সকলেরই আশা যে,) ঝাণ্ডা লাভের জন্য এই আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা ঝাণ্ডার নিজস্ব কোন মর্যাদা কিংবা পার্থিব যশ খ্যাতি লাভের জন্য নহে। বরং ঝাণ্ডার সম্ভাব্য অধিকারী ব্যক্তির অনন্য সাধারণ দ্বীনী মর্যাদার কারণে। কেননা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে মুহব্বতের ঘোষণার চাইতে বড় মর্যাদা আর কি হইতে পারে!

(তাহার চোখে অসুখ) অন্য বর্ণনায় আছে যে, তাহার চোখ-উঠা রোগ হইয়াছিল।

(অতঃপর তাহাদিগকে দাওয়াত দিবে) অমুসলমান কাওমের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার পূর্বে দাওয়াত দিবার কি হুকুম তাহা পিছনে 'নেক কাজে দ্রুত অগ্রসর হওয়া' অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

কেহ কেহ এই হাদীছের আলোকে লড়াই শুরু করিবার পূর্বে দাওয়াত দেওয়াকে ওয়াজিব বলেন। কিন্তু বিশুদ্ধমত এই যে, ইহা ঐ লোকদের সহিত খাছ যাহাদের নিকট ইতিপূর্বে

ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে নাই। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মুছতালিক গোত্রের উপর বিনা দাওয়াতেই হামলা করিয়াছিলেন।

(লাল উটদলের চাইতে উত্তম) লাল উট হইল আবরদের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম সম্পদ। তাহাদের নিকট ইহার চাইতে উৎকৃষ্ট কোন সম্পদ নাই। তাই কোন কিছুকে ইহার চাইতে উত্তম বলিবার অর্থ আরবদের নিকট দুনিয়ার সকল সম্পদের চাইতে উত্তম। বস্তুতঃ আখিরাতের বিষয়গুলিকে দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদের সহিত তুলনা করিবার উদ্দেশ্য শুধু বিষয়টিকে মানুষের বোধ ও উপলব্ধির নিকটবর্তী করা। কেননা মানুষের ক্ষুদ্র দৃষ্টি তো এই সকল সম্পদের ঘেরাটোপেই আবদ্ধ। অন্যথায় চিরস্থায়ী আখিরাতের একটি ক্ষুদ্র কণাও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া এবং অনুরূপ আরও বহুগুণ দুনিয়া যদি কল্পনাও করিয়া লওয়া হয় তবে ঐ সমস্তের চাইতেও উত্তম হইবে।

তাৎপর্যঃ পৃথিবীর আদিকাল হইতে যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশজয়ের ঘটনা চলিয়া আসিতেছে। সেই সকল যুদ্ধের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইল আপন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়াই যুগে যুগে সবল জাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়াছে। তাহাদের দেশ নিজেদের দখলে আনিয়াছে। তাহাদের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছে। এমন কি তাহাদের আবরু ইজ্জতও ভূলুণ্ঠিত করিয়াছে। এই সকল যুদ্ধের পিছনে উপরোক্ত স্থুল স্বার্থ ছাড়া মহৎ কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শ ছিল না। পৃথিবীর কোন দেশ বিজেতা ও সেনাপতি তেমন দাবীও করেননি কখনো।

পক্ষান্তরে আল্লাহর রাসূলও তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনে বিভিন্ন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং মুসলমানদিগকে জিহাদে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু কি ছিল আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্য? কোন্ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর জন্য আপন উম্মতকে তিনি জিহাদে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন? নিছক রক্তপাত? দেশ জয়? মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা? না, ইহার কোনটি নহে। তবে কোন্ সে মহান উদ্দেশ্য? আলোচ্য হাদীছে ইহাই পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে। অর্থাৎ অল্লাহর বান্দাদের হিদায়াতই হইবে তোমার মূল লক্ষ্য। যাহারা আল্লাহর বান্দাদিগকে আল্লাহ হইতে সরাইয়া রাখিয়াছে। সত্যের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া আছে তাহাদিগকে নির্মূল করিয়া সত্যের পথ নিষ্কন্টক করাই উদ্দেশ্য। এইখানেই পৃথিবীর অন্যান্য জাতির যুদ্ধবিগ্রহ এবং ইসলামের জিহাদের পার্থক্য। এইখানেই ইসলামী জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

১৭৯। দ্বীনী কাজে সাহায্য চাওয়া সুয়াল নহে

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قال: يا رَسولَ اللهِ إني أُريد الغَزْوَ وَلَيسْ مَعي مَا أَتَجَهَّزُ بهِ؟ قال: «ائْتِ فُلانًا فإِنَّهُ قَدْ كانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ» فَأَتاه فَقال: إِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَيقولُ: أَعْطِني الذي تَجَهَّزْتَ به، فقال: يَا فُلانَةُ أَعْطِيهِ الذي تَجَهَّزْتُ بِهِ، ولا تَحْبِسِي منه شَيْئًا، فَوَاللهِ لا تَحْبِسينَ مِنْهُ شيئًا فَيُبَارَكُ لكِ فيه. رواه مسلم

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আসলাম গোত্রীয় জনৈক যুবক আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে যাইতে চাই। অথচ আমার নিকট সামান জোগাড় করিবার মত কিছু নাই। তিনি বলিলেন, অমুকের নিকট যাও। কেননা সে (জিহাদের জন্য) সামান জোগাড় করিবার পর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তখন (আসলামী) যুবক তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে সালাম দিতেছেন। আর বলিতেছেন, তুমি যে সমস্ত সামান জোগাড় করিয়াছ তাহা আমাকে দিয়া দাও। তখন লোকটি তাহার স্ত্রীকে ডাক দিয়া বলিলেন, আমার জোগাড় করা সামানপত্র তাহাকে দিয়া দাও। উহার কোন কিছুই রাখিও না। আল্লাহর কসম! উহার কোন কিছুই রাখিও না। তবে আল্লাহ পাক তোমাকে উহাতে বরকত দান করিবেন।

ফায়দা ঃ

এই হাদীছ হইতে বুঝা যায় যে, প্রয়োজনে জিহাদ বা অন্য কোন দ্বীনী কাজের জন্য সাহায্য চাওয়া সুয়ালের অন্তর্ভুক্ত নহে। আরও বুঝা যায় যে, কেহ যদি নেক কাজে খরচ করিবার জন্য কোন সামান জোগাড় করিয়া থাকে। আর পরে কোন কারণে ঐ কাজে উহা খরচ করা সম্ভব না হয় তবে অন্য কোন নেক কাজে উহা ব্যয় করিয়া ফেলাই উত্তম। অবশ্য যদি মান্নত করিয়া থাকে তবে শুধু উত্তম নহে বরং ওয়াজিব হইয়া যাইবে।

(সামান জোগাড় করিবার মত) অর্থাৎ সওয়ারি, পাথেয়, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি জোগাড় করিবার মত প্রয়োজনীয় অর্থ নাই।

(আমার জোগাড় করা সামানপত্র তাহাকে দিয়া দাও) কেননা একজন সামর্থ্যহীন মুজাহিদকে জিহাদে যাইবার ব্যাপারে সাহায্য করিয়া আমি অসুস্থতাবশতঃ জিহাদে যাইতে না পারা সত্ত্বেও জিহাদের পুর্ণ ছাওয়াব পাইব। তদুপরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম পালন করা হইবে। এই জন্যই আপন স্ত্রীকে তিনি বারংবার তাগিদ দিতেছিলেন, যেন ঐ সামানের কোন কিছুই রাখিয়া দেওয়া না হয়। কেননা ইহাতে প্রথম উদ্দেশ্যটি হাছিল হইয়া গেলেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম পালনে ত্রুটি থাকিয়া যাইত। অধ্যায়-শিরোনামের সহিত আলোচ্য হাদীছের সংযোগ ও সামঞ্জস্য এই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেক কাজের পথ দেখাইয়াছেন। কেননা একজন সামানের অভাবে আর অপরজন অসুস্থতার কারণে জিহাদের ছাওয়াব হইতে মাহরূম হইতেছিল আর তিনি উভয়কে ছাওয়াব লাভের পন্থা বাতলাইয়া দিলেন।

অধ্যায় – ২১

নেকী ও পরহেযগারীর ব্যাপারে সহযোগিতা

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى *

তোমরা নেক কাজের ব্যাপারে এবং তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পর সহযোগিতা কর।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন—

وَ الْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ * اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ *

সময়ের কসম! নিঃসন্দেহে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে আছে। তবে তাহারা নহে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে এবং একে অপরকে হকের উপদেশ দিয়াছে এবং ছবরের উপদেশ দিয়াছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর একটি বক্তব্যের মর্মকথা এই যে, সকল মানুষ কিংবা অধিকাংশ মানুষ এই সূরার (সারমর্ম) সম্পর্কে চিন্তা করিবার ব্যাপারে খুবই উদাসীন।

ফায়দা ঃ

(প্রথম আয়াত) على البر و التقوى অর্থাৎ যেই সমস্ত নেক কাজের আদেশ দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি করিবার ব্যাপারে এবং যেই সমস্ত মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করা হইয়াছে সেইগুলি বর্জন করিবার ব্যাপারে একে অন্যকে সহায়তা কর।

এই নির্দেশ সকল ইবাদতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে ফরয ইবাদতের ক্ষেত্রে সহযোগিতাও ফরয। আবার মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করাও মুস্তাহাব।

(দ্বিতীয় আয়াত) العصر শব্দটির অর্থ যুগ, সময়, দ্বিপ্রহরের পরবর্তী সময়, আছরের নামায। কিংবা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানা।

সময়ের কসম করিবার কারণ এই যে, সময়ই হইল বর্তমান জীবন ও জগতের নিয়ন্ত্রক। জন্ম ও মৃত্যু এবং ক্ষয় ও উদ্ভব সকল কিছুর পিছনেই সময়ের গতি ক্রিয়াশীল। ইহাছাড়া মানুষের জীবন তো সময় ছাড়া আর কিছু নহে। সুতরাং সময় বিশ্ব জগতের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আছরের নামাযের নামে কসম করিবার কারণ এই যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে ইহা আলাদা গুরুত্বের অধিকারী। এই কারণে কোরআন শরীফে ইহার কথা আলাদাভাবে বলা হইয়াছে। যেমন—

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى *

তোমরা সমস্ত নামায, বিশেষতঃ আছরের নামাযকে যত্নের সহিত পালন কর।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার নামে কসম করিবার কারণ এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে, তাঁহার মুবারক যামানাই হইল সর্বোত্তম যামানা।

(নিঃসন্দেহে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে আছে) অর্থাৎ আল্লাহ মানব সম্প্রদায়কে একটি ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়াছেন। ঐ ব্যবসায়ের মূলধন হইল তাহার সময় বা জীবন। আল্লাহ চাহেন যে, মানুষ এই মূলধনকে ব্যবসায়ে খাটাইয়া সর্বোত্তম মুনাফা হিসাবে জান্নাত লাভ করুক। কিন্তু সে নাফরমানি ও গোনাহের কাজে সময় নষ্ট ও অপচয় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। মানব

জীবনের যতটুকু সময় নেক আমলে ও ইবাদত বন্দেগীতে ব্যয় হয় তাহা ফলদায়ক আর যতটুক সময় অন্যকাজে ব্যয় হয় তাহা নিষ্ফল এবং বরবাদির কারণ।

(হকের উপদেশ দিয়াছে।) হক দ্বারা ঈমান ও তাওহীদ কিংবা কোরআন ও কোরআনী আহকামের উপর আমল বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা একে অন্যকে উপদেশ দিয়া বলে, ঈমান ও তাওহীদের উপর অবিচল থাক কিংবা কোরআনের উপর আমলের ক্ষেত্রে অবিচল থাক।

(ধৈর্যের উপদেশ) অর্থাৎ ধৈর্যের সহিত যাবতীয় আহকাম পালন করা এবং সংযমের সহিত গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকা– এই দুই বিষয়ে একে অন্যকে উপদেশ দান করিয়াছে।

খাযিন বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, মানুষ যখন দুনিয়াতে দীর্ঘায়ু লাভ করে এবং বৃদ্ধ হয় তখন সে ক্রমে সংকুচিত হইতে থাকে এবং সকল কিছু তাহার হাতছাড়া হইতে থাকে এবং তাহার মধ্যে একটা সর্বহারাভাব জাগ্রত হয়। কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে তাহাদের অবস্থা ভিন্ন। কেননা বৃদ্ধ বয়সেও আল্লাহ পাক তাহাদের ঐ সমস্ত আমল ও ছাওয়াব তাহাদের আমলনামায় লিখিতে থাকেন যাহা তাহারা যৌবনে সুস্বাস্থ্যের সময় কারিয়াছিল। ফলে ভরপুর আমলনামার কারণে তাহার মন আরও সতেজ হইতে থাকে এবং পরম করুনাময়ের সহিত তাহার মিলনাকাঙক্ষা গভীর হইতে গভীরতর হইতে থাকে।

(এই সূরা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা) অর্থাৎ মানুষ যদি এই সূরার মর্মবাণী চিন্তা করিত তবে সে কামিয়াব হইত। একজন মানুষও ঈমান ছাড়া থাকিত না এবং একজন ঈমানদারও আমল ছাড়া থাকিত না। কেননা ইহাতে বরবাদি ও নাজাতের দুইটি পথ পরিষ্কার করিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

আয়াতের শিক্ষা হইল জীবনের মূল্যবান সময় ইবাদত বন্দেগী ছাড়া উদ্দেশ্যহীন কাজে ... না করা এবং একে অপরকে ন্যায় ও কল্যাণের উপদেশ দান করিতে থাকা।

হাদীছসমূহ

১৮০। জিহাদে না গিয়াও জিহাদের ছাওয়াব

عَنْ أبِي عَبْدِ الرحمنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ غازِيًا في سَبيلِ اللهِ فَقَدْ غَزا وَمَنْ خَلَفَ غازِيًا في أهْلِه بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا» متفق عليه.

হযরত আবু আব্দুর রহমান যায়দ বিন খালিদ আল-জোহানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তার কোন গাজীকে জিহাদের সরঞ্জাম সরবরাহ করিল সে যেন (নিজেই) জিহাদ করিল। তদ্রূপ যে ব্যক্তি কোন গাজীর স্থলবর্তী রূপে তাহার পরিবারবর্গের উত্তম দেখাশোনা করিল সে নিজেই যেন জিহাদ করিল। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

হযরত ইবনে হিব্বান (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ এই যে, সে ঐ গাজীর অনুরূপ ছাওয়াবের অধিকারী হইবে। যদিও প্রকৃতপক্ষে সে জিহাদে শরীক হয় নাই। ইবনে হিব্বানের এক বর্ণনায় উক্ত হাদীছের শেষে ইহাও রহিয়াছে- غير انه لا ينقص من اجره شيء (তবে ঐ গাজীর ছাওয়াব তাহাতে কোন অংশে কম হইবে না।)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হাদীছের ইবারত এইরূপ-

من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل اجره حتى يموت او يرجع *

যে ব্যক্তি কোন গাজীকে তাহার রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করিল তাহার জন্য ঐ গাজীর ছাওয়াবের অনুরূপ ছাওয়াব হইবে যতক্ষণ না সে মৃত্যু বরণ করে কিংবা ফিরিয়া আসে।

আলকামী (রহঃ) বলেন, এই রিওয়ায়াত দ্বারা দুইটি বিষয় সাব্যস্ত হইতেছে। প্রথমতঃ অনুরূপ ছাওয়াব লাভের উল্লেখিত ওয়াদা একজন মুজাহিদকে জিহাদের পূর্ণাংগ সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করিবার সহিত সম্পৃক্ত। (حتى يستقل) দ্বারা ইহাই উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়তঃ এই ব্যক্তি ঐ গাযওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত (কিংবা গাজীর মৃত্যু পর্যন্ত) ছাওয়াবের ক্ষেত্রে তাহার সমভাগী হইতে থাকিবে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি গাজীর পরিবারবর্গের যাবতীয় দেখাশোনা করিবে সে ঐ গাজীর ছাওয়াবের সমভাগী হইতে থাকিবে। কেননা এই দুইটি ক্ষেত্রে পূর্ণাংগ সহযোগিতা ছাড়া জিহাদে শরীক হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। সুতরাং এই দুইটি ক্ষেত্রে পূর্ণাংগ সহযোগিতাকারীরা যেন তাহার সহিত যুদ্ধে শরীক ছিল।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জিহাদের সামান আংশিক সরবরাহ করিল। যেমন শুধু তলোয়ার বা বন্দুক বা পাথেয় দান করিল। কিংবা মুজাহিদের পরিবারবর্গের আংশিক খিদমত করিল। যেমন তাহাদের কোন প্রয়োজন সারিয়া দিল, খরচ দিল, আবরু ইজ্জতের হিফাযত করিল, ব্যবসা দেখাশোনা করিল, ইত্যাদি। তবে সাহায্যের পরিমাণ হিসাবে এবং ইখলাছের প্রকৃতি হিসাবে কম বা বেশী ছাওয়াব পাইতে থাকিবে। এমন কি কেহ যদি মুজাহিদদের কামিয়াবির জন্য দু'আ করিতে থাকে তবে সেও জিহাদের ছাওয়াবে অংশীদার হইবে।

যিনি জিহাদ-ক্ষেত্র হইতে নিরাপদ দূরত্বে বসিয়া মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ দিতেছেন; তদ্রূপ যাহারা পরোক্ষভাবে মুজাহিদদের গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দিতেছেন তাহারাও পূর্ণাংগ জিহাদের ছাওয়াব পাইবেন।

যাহারা জিহাদ, হজ্জ, দাওয়াত ও তাবলীগ বা ইলম হাছিলের জন্য বাহির হইয়াছেন তাহাদের সকলের সাহায্য করিবার ক্ষেত্রেও এই হাদীছ প্রযোজ্য হইবে।

কিন্তু আফসোস! অধিকাংশ মানুষ বিনা কষ্টের এই বিরাট ছাওয়াব হাছিল করিবার ব্যাপারে বড়ই গাফলতের পরিচয় দিতেছে।

১৮১। পরিবারের প্রতি দুইজনের একজন দ্বীনের জন্য বাহির হওয়া কর্তব্য

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، بَعَثَ بَعْثًا إلى بَنِي لِحْيانَ مِنْ هُذَيْلٍ فقال: «لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رجُلينِ اَحَدُهُما وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا» رواه مسلم

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হোযায়ল গোত্রের শাখা-গোত্র বনু লিহয়ানের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, (প্রত্যেক পরিবারের) প্রতি দুই ব্যক্তির মধ্য হইতে একজন যেন বাহিনীতে যোগদান করে। তখন উভয়েরই ছাওয়াব হইবে। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

কেননা যে ব্যক্তি ঘরে থাকিয়া যাইবে সে মুজাহিদের পারিবারিক দেখাশোনার দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে। সুতরাং ইহা পূর্ববর্তী হাদীছের من خلق غازيا فقد غزا এর সমার্থক হইল। অর্থাৎ দ্বিতীয় লোকটি যদি শুধু শুধু ঘরে বসিয়া থাকে তবে কোন ছাওয়াব তাহার প্রাপ্য হইবে না। বরং দ্বীনের কাজে বাহির হইয়া যাওয়া অপর লোকটির খিদমত করিতে হইবে।

১৮২। বাচ্চার হজ্জের কারণে মায়ের ছাওয়াব

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أنَّ رسول اللهِ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحاءِ فقال: «مَنِ القومُ؟»، قالوا: المُسْلِمُونَ، فَقَالوا: مَنْ انتَ؟ قال: «رسولُ اللهِ»، فَرَفَعَتْ إلَيْهِ امْرَاَةٌ صَبِيًّا فقالَتْ: اَلِهٰذا حَجٌّ؟ قال: «نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ» رواه مسلم .

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাওহা নামক স্থানে একটি কাফেলার সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা? তাহারা বলিল, আমরা মুসলমান। তাহারা (পাল্টা) প্রশ্ন করিল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আল্লাহর রাসূল। তখন জনৈকা স্ত্রীলোক আপন শিশু-পুত্রকে তাঁহার সামনে উঁচু করিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) ইহার কি হজ্জ হইতে পারে? তিনি বলিলেন, হাঁ, আর তুমিও ছাওয়াব পাইবে। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

তবে এই হজ্জ দ্বারা ফরয হজ্জ আদায় হইবে না। বরং বালেগ হইবার পর যদি হজ্জ ফরয হইবার যাবতীয় শর্ত পাওয়া যায় তবে তাহাকে ফরয হজ্জ আদায় করিতে হইবে।

(তাহার সামনে উঁচু করিয়া ধরিয়া) এই কথা হইতে বোঝা যায় যে, বাচ্চা খুবই ছোট ছিল এবং আমলের হাকীকত বুঝিবার বয়স তাহার ছিল না। সুতরাং ইহা প্রমাণ করে যে, এই ধরনের বে-বুঝ বাচ্চার হজ্জও হইতে পারে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে বাচ্চার অলী বা অভিভাবক তাহার পক্ষ হইতে ইহরাম বাধিবে। তবে বাচ্চা বুঝদার হইলে সে নিজেই ইহরাম বাধিবে এবং নফল ইবাদতের ছাওয়াব লাভ করিবে।

বাচ্চার মা (অথবা অন্য অভিভাবক) ছাওয়াব পাইবার কারণ এই যে, সে তাহার দেখাশোনা ও পরিচর্যা করিয়াছে এবং ইহরাম নষ্ট হইবার মত কাজ হইতে তাহাকে দূরে রাখিয়াছে এবং হজ্জের যাবতীয় আহকাম পালনে তাহাকে সাহায্য করিয়াছে।

(তোমরা কাহারা) ইহা হজ্জাতুল বিদা-এর সময়ের ঘটনা। রাওহা মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। আবু দাউদের বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাহাদিগকে ছালাম করিয়াছিলেন। পরে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারী সংক্ষেপণের আশ্রয় লইয়াছেন বলিতে হইবে।

হযরত ইবনে রাসলান (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা বোঝা যায় যে, কোন কাফেলা (বা ব্যক্তির সহিত দেখা হইলে তাহাদিগকে না চিনিলেও সালাম করা কর্তব্য এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে সালাম ও প্রতিসালাম হইবার পর কথা-বার্তা শুরু করা উচিত। কেননা হাদীছ শরীফে আছে- السلام قبل الكلام (আগে সালাম পরে কালাম)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাদের চিনিতে না পারিবার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সাক্ষাৎ রাত্রে হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ঘটনাটি দিনে হইলে সম্ভবতঃ মদীনায় হিজরত না করিবার কারণে ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহারা দেখে নাই। হয়ত ইসলাম গ্রহণের পরও তাহারা হিজরত না করিয়া নিজেদের এলাকায় রহিয়া গিয়াছিল।

১৮৩। খাজাঞ্চীর ছাদাকা

١٨٠ - وَعَنْ ابي مُوسٰى الأشعريِّ رضي الله عنه، عَنِ النبيِّ ﷺ أنَّهُ قال: «الخازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الذي يُنَفِّذُ ما أُمِرَ به، فَيُعْطِيهِ كامِلاً مُوَفَّرا، طَيِّبَةً به نَفْسُه(٧) فَيَدْفَعُهُ إلى الذي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ» متفق عليه .

হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ মুসলমান আমানতদার খাজাঞ্চী একজন ছাদাকাকারী রূপে গণ্য হইবে যে, তাহার প্রতি প্রদত্ত (দানের) হুকুম (পূর্ণরূপে) কার্যকর করে অর্থাৎ খুশিমনে পূর্ণ পরিমাণে দান ছাদাকা আদায় করে এবং যাহাকে দান করিবার হুকুম করা হইয়াছে তাহার নিকট তাহা অর্পণ করে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(আমানতদার খাজাঞ্চী) অর্থাৎ মালিকের পক্ষ হইতে যেই মাল তাহাকে দান করিবার হুকুম করা হইয়াছে সেই মালের ক্ষেত্রে আমানতদারি রক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং ইতিপূর্বে বা পরবর্তীতে অন্য কোন মালের ক্ষেত্রে খেয়ানত করিয়া থাকিলে উহার জন্য গোনাহগার হইবে বটে। কিন্তু এই আমলের ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে না। কেননা মধ্যবর্তী আমলের সহিত পূর্ববর্তী বা পরবর্তী গোনাহের কোন সম্পর্ক নাই এবং ইহা মধ্যবর্তী আমলের ছাওয়াব কমাইতে পারে না।

(দানের হুকুম কার্যকর করে) এই কথাতেই মূল বক্তব্য আসিয়া যায়। দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা প্রথম বাক্যকে তাকীদ করা হইয়াছে মাত্র। তাকীদ করিবার কারণ এই যে, খাজাঞ্চী সাধারণতঃ মালিকের দানের নির্দেশ পালনেও কুণ্ঠার পরিচয় দিয়া থাকে। আরও তাকীদ হিসাবে বলা হইয়াছে 'খুশিমনে', অর্থাৎ যাহাকে দান করা হইল তাহাকে ঈর্যা করিবে না। তাহার সহিত রুক্ষ ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করিবে না।

খাজাঞ্চী যদি খুশিমনে দানের আদেশ পালন করে এবং প্রাপককে ঠিক ঠিকভাবে খিদমত মনে করিয়া উহা পৌঁছাইয়া দেয় তবে ছাদাকার ছাওয়াব ছাড়াও মানুষের অন্তরে তাহার প্রতি ভালবাসা পয়দা হইয়া থাকে। আর ক্ষেত্রবিশেষে মালিকের চাইতেও খাজাঞ্চীর ছাওয়াব বেশী হইতে পারে। যেমন মালিক উহা উপার্জন করিতে বা আদেশ জারি করিতে যে পরিমাণ কষ্ট হইয়াছে তাহার চাইতে অধিক পরিমাণ কষ্ট হইল খাজাঞ্চীর উহা প্রাপকের নিকট পৌঁছাইতে সুতরাং স্বভাবতঃই সে বেশী ছাওয়াব পাইবে।

অধ্যায় – ২২

নছীহত (উপদেশ ও কল্যাণ কামনা)

অয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

انما المؤمنون اخوة *

মুমিনগণ পরস্পর ভাই।

হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে খবর দিয়া আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

و انصح لكم *

আমি তোমাদের কল্যাণ কামনা করি

এবং হযরত হূদ (আঃ) সম্পর্কে খবর দিয়া ইরশাদ করেন–

و انا لكم ناصح امين *

আর আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত কল্যাণকামী

ফায়দা ঃ

প্রথম আয়াতের অবশিষ্টাংশ এই– فاصلحوا بين اخويكم

সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মাঝে (সম্পর্কের) সংশোধন করাইয়া দাও।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ভ্রাতৃত্ব–সম্পর্কের দাবী হইল তাহার স্বার্থ, সুবিধা ও উপকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাহার কল্যাণ কামনা করা। সুতরাং অধ্যায় শিরোনামের সহিত আয়াতের সংযোগ ও সাযুজ্য সুস্পষ্ট।

(দ্বিতীয় আয়াত) নূহ আলাইহিস্সালাম আপন কাওমকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আমি তোমাদের প্রতি 'নছীহত' করি। (অর্থাৎ তোমাদিগকে কল্যাণ ও হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করি।)

আল্লামা কিরমানী (রহঃ) বলেন, নছীহত (বা কল্যাণ কামনার) আলামত তিনটি–

১। মুসলমানদের দূরবস্থার উপর হৃদয়ের চিন্তাগ্রস্ততা ও ব্যাকুলতা।

২। তাহাদিগকে আন্তরিক উপদেশ দান করা।

৩। এবং তাহাদের মুর্খতা ও অসদাচরণ সত্ত্বেও তাহাদিগকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করা।

হযরত হুদ (আঃ) তাঁহার কাওমকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আমি তোমাদের জন্য কল্যাণকামী (অর্থাৎ তোমাদের কল্যাণের জন্য তোমাদিগকে আল্লাহর ইবাদত করিতে এবং শির্ক পরিহার করিতে আহ্বান জানাই) বিশ্বস্ত (অর্থাৎ রিসালাতের দায়িত্ব পালনের এবং উপদেশদানের ক্ষেত্রে আমি বিশ্বস্ততা রক্ষা করি। নিজের পক্ষ হইতে কিছুই বলি না বরং আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা আদেশ হয় হুবহু তাহাই বলি। সুতরাং আমার কথা মানিয়া লইবার মাঝেই তোমাদের কামিয়াবি।)

হাদীছসমূহ

১৮৪। দ্বীন অর্থ কল্যাণকামনা

فَالاولُ: عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْنِ اَوْسٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه اَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الدينُ النَّصِيحَةُ»(٢)، قلنا: لِمَنْ؟ قال: «لِلّٰهِ وَلِكِتَابِه وَلِرَسُولِه وَلِأَئِمَّةِ المسلمين وَعامَّتِهِمْ» رواه مسلم.

হযরত আবু রোকাইয়া তামীম বিন আওস আদ-দারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দ্বীন অর্থ কল্যাণ কামনা। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, কাহার প্রতি (এই কল্যাণ কামনা) তিনি বলিলেন, আল্লাহর প্রতি এবং তাঁহার কিতাবের প্রতি এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি এবং মুসলমানদের ইমাম (বা নেতাদের) প্রতি এবং সাধারণ মুসলমানদের প্রতি।

ফায়দা ঃ

ইহা অতি গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ। ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, এই হাদীছের উপর ইসলামের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। কেননা ইহার উপর আমল হইলেই ঈমান ও আকীদার হিফাযত হইবে এবং মুসলিম সমাজের বুনিয়াদ ও কাঠামো সংহত ও মজবুত থাকিবে। অন্যথায় আকায়েদের ক্ষেত্রে যেমন ফাসাদ ও চরম গোমরাহী দেখা দিবে তদ্রূপ সামাজিক কাঠামোর ক্ষেত্রেও ধ্বস নামিবে। আল্লাহ সকলকে ইহার উপর পূর্ণ আমলের তাওফীক দান করুন। আমীন।

আরবী نصيحة শব্দটি অতি ব্যাপক অর্থবোধক ও সারগর্ভ একটি শব্দ। যাহার অর্থ কাহারও সঠিক কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হওয়া।

(দ্বীন অর্থ কল্যাণকামনা) অর্থাৎ দ্বীনের বুনিয়াদ ও প্রধান বিষয় হইল কল্যাণকামনা। যেমন বলা হয় الحج عرفة। হজ্জ অর্থ আরাফায় অবস্থান। অথচ ইহা পূর্ণ হজ্জ নহে। হজ্জের প্রধান অংশ। তবে আরাফায় অবস্থানের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য এইভাবে বলা হয়। তদ্রূপ কল্যাণ কামনাই দ্বীনের সবটুকু নহে। বরং আরও বহু আমল দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তবে নছীহত ও কল্যাণ কামনার গুরত্ব প্রকাশের জন্য বলা হইয়াছে, 'দ্বীন অর্থ কল্যাণ কামনা।'

(আল্লাহর প্রতি) আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর প্রতি নছীহত বা কল্যাণ কামনার অর্থ তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করা। কোন কিছুকে তাঁহার সহিত শরীক না করা। তাঁহার কোন গুণ ও ছিফাত অস্বীকার না করা। তাঁহাকে সকল পূর্ণতার অধার মনে করা এবং যাবতীয় ত্রুটি ও দুর্বলতা হইতে তাঁহাকে পবিত্র ঘোষণা করা। তাঁহার পূর্ণ আনুগত্য করা এবং নাফরমানি পরিহার করা। আল্লাহর ওয়াস্তে কাহাকেও ভালবাসা এবং কাহারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। যাহারা আল্লাহর অনুগত ও প্রিয় তাহাদের প্রতি অন্তরংগতা পোষণ করা। যাহারা তাঁহার অবাধ্য ও অপ্রিয় তাহাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা। যাহারা আল্লাহর সহিত কুফুরি করে কিংবা কোন আহকাম মানিতে অস্বীকার করে তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। তাঁহার নেয়ামত সমূহ স্বীকার করা এবং উহার শোকর করা এবং সকল কাজে ইখলাছ অর্জন করা। (অর্থাৎ শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিবার নিয়তে সকল কাজ করা।) এই সকল গুণ অর্জনে নিজে সচেষ্ট হওয়া এবং অন্যদিগকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে উদ্বুদ্ধ করা। আল্লাহর বান্দাদের প্রতি সদয় আচরণ করা এবং তাহাদের মধ্যে যাহাকে সম্ভব দ্বীনের ইলম দান করা।

আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, উপরোল্লেখিত গুণাবলীর হাকীকত এই যে, এইগুলি অর্জন করিবার অর্থ বান্দার নিজের কল্যাণ সাধন। কেননা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তো সকল কল্যাণকামীর কল্যাণকামনা হইতে চিরপবিত্র। বান্দার প্রতি অনুগ্রহবশতঃ বান্দার নিজের প্রতি কল্যাণকামনাকে আল্লাহ তাঁহার প্রতি কল্যাণকামনা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

(এবং তাঁহার কিতাবের প্রতি) ওলামায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহর কালাম বা কোরআনের প্রতি কল্যাণকামনার অর্থ হইল ইহাকে আল্লাহর পক্ষ হইতে জিবরীল আমীনের মাধ্যমে তাঁহার রাসূলের উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানী কিতাব রূপে বিশ্বাস করা। আরও বিশ্বাস করা যে, মাখলূকের কালামের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহার কোন সূরায়, কোন আয়াতে, কোন শব্দে, কোন হরফে, এমন কি কোন নোকতায় কোন সন্দেহ নাই।

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ *

ঐ কিতাব উহাতে কোন সংশয় সন্দেহ নাই।

لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد *

কোন মিথ্যা ইহাতে অনুপ্রবেশ করিবে না অগ্র হইতেও নহে, পশ্চাত হইতেও নহে।

অতঃপর আল্লাহর কালাম হিসাবে উহার প্রতি আযমত ও ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করা এবং পূর্ণ হক আদায় করিয়া অর্থাৎ বিশুদ্ধ উচ্চারণে (এবং সম্ভব হইলে) অর্থ বুঝিয়া তিলাওয়াত করা। ভয় ও খুশির আয়াতে অন্তরে ভয় বা খুশির ভাব গ্রহণ করা। উহার যাবতীয় আহকাম ও বিধানকে জীবনের সর্বত্র পালন ও প্রতিষ্ঠিত করা। উহার অন্তহীন জ্ঞান ও ইলমের যৎসামান্য

হাছিল করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করা এবং সেই জ্ঞান অন্যদের মাঝে প্রচারের জন্য জীবন ব্যয় করা। উহার যাবতীয় উপদেশ বিগলিত হৃদয়ে গ্রহণ করা। ইসলামী শরীয়তের উৎস হিসাবে ফিকাহ্ শাস্ত্রীয় তরীকায় উহার অধ্যয়ন ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করা। বাতিলপন্থীদের যাবতীয় চক্রান্ত ও ভুল ব্যাখ্যার হাত হইতে উহাকে রক্ষা করা। উপরোল্লেখিত যাবতীয় বিষয়সহ উম্মতকে কোরআন শিক্ষার পথে আহ্বান করা এবং কোরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করা।

(এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি) আল্লাহর রাসূলের প্রতি কল্যাণকামনার অর্থ তাঁহার রিসালাত ও নবুয়তের উপর ঈমান আনা। তাঁহার মু'জিযাসমূহ বিশ্বাস করা, তাঁহার যাবতীয় আদেশ নিষেধের পূর্ণ আনুগত্য করা। জীবিত ও মৃত সর্বাবস্থায় তাঁহার নোসরত করা। (জীবিত অবস্থায় তাঁহার নোসরতের অর্থ তো পরিষ্কার। যেমন ছাহাবা কেরাম তাঁহার হিফাযতের জন্য জান বাজি রাখিয়া লড়াই করিতেন। মৃত অবস্থায় তাঁহার নোসরতের অর্থ তাঁহার তরীকা ও সুন্নত জিন্দা রাখা এবং কোন নরাধম তাঁহার শানে গোস্তাখি করিলে তাহাকে শায়েস্তা করা। (যেমন পরবর্তীকালে যুগে যুগে আশেকানে রাসূল সকল গোস্তাখানে রাসূল–এর বেলায় করিয়াছেন।) যাহারা রাসূলের প্রতি (ভিতরে বাহিরে শত্রুতা) পোষণ করে তাহাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা এবং যাহারা তাঁহার প্রতি আন্তরিকতা পোষণ করে তাহাদের প্রতি আন্তরিকতা পোষণ করা। তাঁহার প্রতি পূর্ণ আযমত ও ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করা। তাঁহাকে আপন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ, এমন কি আপন সত্তার চাইতে অধিক মুহাব্বত করা। তাঁহার তরীকা ও সুন্নতের উপর পূর্ণ আমল করা এবং উহার প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করা। হাদীছের যাবতীয় ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দান করা। হাদীছের প্রতি পূর্ণ আযমত ও শ্রদ্ধা পোষণ করা। পূর্ণ নিশ্চয়তা ছাড়া হাদীছ সম্পর্কে কথা বলা হইতে বিরত থাকা। হাদীছের সহিত সম্পর্কের কারণে হাদীছ শিক্ষাকারী ও শিক্ষাদানকারীদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করা এবং তাহাদের যথাসাধ্য খিদমত করিয়া যাওয়া। আদবের সহিত হাদীছ পাঠ করা এবং যাবতীয় আখলাকে নবী নিজের মাঝে হাছিলের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। তাঁহার ছাহাবা ও আহলে বাইতের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা রাখা। সুন্নতের বিরুদ্ধাচরণকারী বিদ'আতীদের প্রতি এবং যে কোন ছাহাবীর সমালোচনাকারীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

(এবং মুসলমানদের ইমামগণের প্রতি) ইমাম অর্থ শাসকবর্গ। শাসকবর্গের প্রতি কল্যাণকামনার অর্থ সত্যের উপর তাহাদিগকে সহযোগিতা করা। পূর্ণ আনুগত্যের সহিত[১] তাহাদের নির্দেশ পালন করিয়া যাওয়া এবং পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সহিত সংশোধনের মনোভাব পোষণ করিয়া হিকমত ও কোমলতার মাধ্যমে তাহাদের ভুল ধরাইয়া দেওয়া এবং সতর্ক করা এবং তাহাদের উপর অর্পিত মুসলমানদের হক আদায়ে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করা। তাহাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করা এবং হিকমতের সহিত যথাসাধ্য চেষ্টা করা। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা ফিতনা সৃষ্টি না করা। বরং তাহাদের আনুগত্যের প্রতি মুসলমানদিগকে অনুপ্রাণিত করা এবং মিথ্যা স্তুতি ও তোষামোদ দ্বারা তাহাদিগকে বিভ্রান্ত না করা।

১। অন্যায়ের উপর তাহাদের আনুগত্য ও সহযোগিতা করা যাইবে না। কেননা لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق (আল্লাহর নাফরমানী করিয়া কোন মাখলূকের আনুগত্য বৈধ নহে।) তবে ফিতনা করা যাইবে না। কেননা ইহাতে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে।

ইমামের অর্থ খলীফা ও তাহার অধীনস্থ শাসকবর্গ ধরিয়া এই ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাই আলোচ্য শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ। তবে এই ব্যাখ্যা দান করিবার পর আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, আইম্মা ও ইমাম দ্বারা ওলামায়ে কেরামও উদ্দেশ্য হইতে পারেন। তখন তাহাদের প্রতি হিতাকাঙক্ষার অর্থ হইবে শরীয়ত সম্পর্কে তাহারা যেই সকল হুকুম আহকাম বর্ণনা করেন তাহা মানিয়া লওয়া এবং তাহাদের তাকলীদ করা এবং তাহাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং দ্বীন ও ইলমের ধারক বাহক হিসাবে তাহাদিগকে ভক্তি করা। তাহাদিগকে হেয় না করা এবং তাহাদের খিদমত করা।

(এবং সাধারণ মুসলমানদের প্রতি) অর্থাৎ শাসকবর্গ ছাড়া অন্য সকল মুসলমানের প্রতি। তাহাদের প্রতি কল্যাণকামনার অর্থ তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথ প্রদর্শন করা এবং কথায় ও কাজে তাহাদিগকে এই বিষয়ে সাহায্য করা। তাহাদের আবরু রক্ষা করা। (অর্থাৎ সতর ঢাকিবার জন্য প্রয়োজনে বস্ত্র দান করা এবং তাহাদের ইজ্জত নষ্ট না করা) তাহাদের অভাব-প্রয়োজন (যথাসাধ্য) দূর করা। তাহাদের উপকার করা এবং ক্ষতি হইতে না দেওয়া। কোমলতা ও হামদর্দির সহিত তাহাদিগকে সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করা। নিজের জন্য যাহা পসন্দ করে তাহা মুসলমানদের জন্য পসন্দ করা। কথায় ও কাজে অর্থাৎ সর্বসাধ্য ব্যয় করিয়া তাহাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর হিফাযত করা। সর্বোপরি উপরে কল্যাণকামনার যত প্রকার বলা হইল ঐ সকল আখলাক ও চরিত্র গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করা।

বস্তুতঃ আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গানে দ্বীন সাধারণ মানুষের কল্যাণকামনা করিতে গিয়া বহু ক্ষেত্রে নিজেদের দুনিয়ার ক্ষতিও স্বীকার করিতেন এবং মানুষেরই হাতে বিভিন্ন কষ্ট ভোগ করিতেন। তবুও তাহাদের কল্যাণকামনা হইতে বিরত হইতেন না। তদ্রুপ শাসকবর্গকে উপদেশ দিতে গিয়া অনেক সময় তাহাদের কোপানলে পড়িতেন এবং বিভিন্ন জুলুম নির্যাতন ভোগ করিতেন। কিন্তু তাহাদের প্রতি কল্যাণকামনা বর্জন করিতেন না। সময়ের ব্যবধানে এই ক্ষেত্রে যতই দুর্বলতা আসিতেছে দ্বীনের অবস্থাও ততই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে।

তবে ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন যে, শাসকবর্গ ও সাধারণ মুসলমানদের প্রতি এই নছীহত ও কল্যাণকামনা হইল ফরযে কিফায়া। পর্যাপ্তসংখ্যক লোক ইহা পালন করিলে অন্যরাও দায়িত্বমুক্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রয়োজন পরিমাণ না হইলে সকলের উপরই দায়িত্ব থাকিয়া যাইবে।

অবশ্য ইহা ঐ সময়ের কথা যখন উপদেশদাতা ও কল্যাণকামী ব্যক্তি মনে করে যে, তাহার কথা মানা হইবে এবং এই কারণে তাহাকে কোন বিপদে পড়িতে হইবে না। পক্ষান্তরে অন্যরূপ আশংকা হইলে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য নিরবতা অবলম্বনের অবকাশ রহিয়াছে।

১৮৫। বাই'আত গ্রহণের বৈধতা

الثاني : عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضي الله عنه قال: بَايَعْتُ رسولَ اللّٰهِ ﷺ عَلَىٰ إقامِ الصَّلاةِ، وَإيتاءِ الزكاةِ، وَالنُّصحِ لِكُلِّ مسلمٍ متفق عليه.

হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি এই কথার উপর রাসূলুল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (হাতে) বাই'আত হইয়াছি যে, নামায কায়েম করিব, যাকাত আদায় করিব এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করিব।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

নামায কায়েম করিবার অর্থ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও যাবতীয় আদব তথা খুশূ-খুযূসহ নামায আদায় করা এবং বে-নামাযীদের মাঝে নামাযের দাওয়াত দেওয়া।

বাই'আতের হাকীকত ঃ এই ধরনের বিভিন্ন হাদীছ এবং কোরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা ইহা সুপ্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবা কেরামকে বাই'আত করিতেন। বাই'আত মানে ওয়াদা, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবা কেরামের ইসলাম গ্রহণের সময় কিংবা পরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাহাদের নিকট হইতে বাই'আত বা ওয়াদা গ্রহণ করিতেন। যেমন এই হাদীছে হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) পাঁচটি বিষয়ের উপর বাই'আত করিয়াছেন। কোন কোন ছাহাবী দশটি বা সাতটি বিষয়ের উপর বাই'আত করিয়াছেন, যেমন চুরি না করা। যিনা না করা, শিরক না করা, ইত্যাদি। ইহা মূলতঃ তাযকিয়া বা আত্মা ও কলবের সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলম ও শরীয়তের শিক্ষক যেমন ছিলেন তেমনি আধ্যাত্মিক সংশোধকও ছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে—

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ *

তিনি তাহাদিগকে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শোনান এবং তাহাদিগকে পবিত্র করেন এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষাদান করেন।

ছাহাবা কেরাম বাই'আত গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোহবতে ও সান্নিধ্যে থাকিয়া কলবের নূরানিয়্যাত ও আত্মার পবিত্রতা লাভ করিতেন এবং পর্যায়ক্রমে আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া তা'আল্লুক মা'আল্লাহ বা আল্লাহর সহিত সম্পর্কের শীর্ষস্তরে উপনীত হইতেন।

বস্তুতঃ এই বাই'আত ও ছোহবত আত্মার সংশোধন ও কলবের চিকিৎসার জন্য অতীব জরুরী। পরবর্তী যুগে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া বা নবীর প্রতিনিধি হিসাবে ওলামায়ে কেরাম তালিম ও তাযকিয়ার উভয় দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আধ্যাত্মিক সংশোধনের উদ্দেশ্যে শায়খের হাতে বাই'আত গ্রহণ মূলতঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাই'আত গ্রহণের স্থলবর্তী এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শায়খের ছোহবত গ্রহণ মূলতঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোহবত গ্রহণেরই স্থলবর্তী। সুতরাং 'ধর্মানুরাগী' আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা পীর-মুরীদী ও বাই'আতী সিলসিলাকে শরীয়তের সহিত সম্পর্কহীন ও বিদ'আত বলিয়া যে মন্তব্য করিয়া থাকেন তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন।

বরং প্রত্যেক নর-নারী মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য হইল প্রয়োজনীয় দ্বীনী ইলম হাসিল করা এবং কোন হক্কানী শায়খ ও পীরের হাতে বাই'আত হইয়া আত্মার সংশোধনে আত্মনিয়োগ করা। এই সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় মসায়েল হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী

থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত কাসদুস-সাবীল কিতাবে দেখিয়া লওয়া উচিত। কেননা পীর-মুরীদী যেমন অতীব জরুরী তেমনি পীর-মুরীদীর নামে সর্বপ্রকার শরীয়তবিরোধী ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য। অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য।

পীরের হাতে হাত রাখিয়া বাই'আত করা সুন্নত। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাই'আত করিতেন। তবে স্ত্রীলোকদের পক্ষে পীরের হাতে হাত রাখা জায়েয নহে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদিগকে বাই'আত করিবার সময় তাহাদের হাত স্পর্শ করিতেন না। বরং পূর্ণ শরীয়তি পর্দা রক্ষা করিতেন। সুতরাং কেহ যেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বড় পীর হইবার দাবী না করে।

(মুসলমানদের কল্যাণ কামনা) এই সংক্রান্ত আলোচনা পূর্ববর্তী হাদীছে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

১৮৬। পূর্ণ মুমিন হইবার লক্ষণ

الثالث: عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه، عَنِ النبيِّ ﷺ قال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» متفق عليه .

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ পূর্ণ মুমিন হইতে পারিবে না যতক্ষণ না সে আপন ভাইয়ের জন্য ঐ সমস্ত (কল্যাণপূর্ণ) বিষয় পছন্দ করিবে যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(কল্যাণপূর্ণ) নাসাঈ শরীফের এক বর্ণনায় من الخير অংশটি বর্ধিত আছে। তাই তরজমার ক্ষেত্রে বন্ধনীতে 'কল্যাণপূর্ণ' কথাটি সংযুক্ত করা হইয়াছে।

(যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে) আল্লামা ইবনুছ-ছালাহ (রহঃ) বলেন, নিজের জন্য যাহা পছন্দ করে অন্যের জন্য তাহা পছন্দ করা সাধারণ দৃষ্টিতে অসম্ভব ও অসাধ্য মনে হইলেও আসলে ইহা অসম্ভব নহে বরং খুবই সহজ। কেননা হাদীছের মতলব তো এই যে, তোমাদের কাহারও ঈমান ঐ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করিবে না যেই পর্যন্ত না সে তাহার মুসলমান ভাইয়ের জন্য ঐ উত্তম জিনিস পছন্দ করিবে যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। আর ইহার উপর আমল করা এইভাবে সম্ভব যে, ঐ উত্তম বস্তুটি যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করিয়াছে (এবং উহা হাছিলের জন্য চেষ্টা করিতেছে বা হাছিল হইয়া গিয়াছে) তাহা আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য এমনভাবে হাছিল হইবার আকাঙক্ষা করিবে যাহাতে ঐ ক্ষেত্রে সে তাহার প্রতিদ্বন্দী না হয়। অর্থাৎ মুসলমান ভাইয়ের ঐ নেয়ামতটি লাভ হওয়া দ্বারা তাহার নেয়ামত যেন কোন অংশে কমিয়া না যায়। বলাবাহুল্য যে পবিত্র ও বিশুদ্ধ হৃদয়ের পক্ষে এই রূপ আকাঙক্ষা করা খুবই সহজ। ইতর হৃদয়ের পক্ষে অবশ্য কঠিন। তাহার পক্ষে বরং এইরূপ আকাঙক্ষা করা সহজ যে, আমার দুই চক্ষু চলিয়া যাউক আপত্তি নাই কিন্তু তাহার যেন অন্তত একটি চক্ষু নষ্ট হয়। আমার নাক কাটা যায় যাউক কিন্তু তাহার যেন যাত্রা ভংগ হয়। আল্লাহ পাক আমাদিগকে হৃদয়ের এমন ইতরতা এবং কলবের এমন ব্যাধি হইতে হিফাযত করুন। আমীন।

আল্লামা আবুয্‌-যিনাদ (রহঃ) অবশ্য আরও সূক্ষ্ম কথা বলিয়াছেন, তিনি বলেন, হাদীছের বাহ্যিক অর্থ হইল আপন মুসলমান ভাইয়ের সহিত সমতা কামনা করা। কেননা নিজের জন্য যাহা পছন্দ করিবে তাহার জন্যও উহা পছন্দ করা হইবে। কিন্তু ইহার হাকীকত হইল মুসলমান ভাইকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া। কেননা প্রত্যেক মানুষ নিজে সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ হওয়া পছন্দ করে। সুতরাং আপন ভাইয়ের জন্য যখন সে সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ হওয়া পছন্দ করিবে তখন সে তাহার জন্য নিজের চাইতেও শ্রেষ্ঠ হওয়া পছন্দ করিবে। এইভাবে মুসলমান ভাইকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইল।

আল্লামা ইবনুছ-ছ্বালাহ ও আল্লামা আবুয্‌-যিনাদ (রহঃ)-এর বক্তব্যের মাঝে এইভাবে সমন্বয় করা যায় যে, প্রথমটি হইল ঈমানের পূর্ণাংগতা লাভের প্রাথমিক স্তর। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি হইল পূর্ণাংগতার শীর্ষ স্তর।

আল্লামা মুহম্মদ বিন আল্লান (রহঃ) তৃতীয় একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, হাদীছের অর্থ এই যে, মুমিনের সহিত মুমিনের সম্পর্ক হওয়া উচিত এক দেহ, এক আত্মার মত। সুতরাং সকলে এক দেহ, এক আত্মা হিসাবে নিজের জন্য যাহা পছন্দ করিবে মুমিন ভাইয়ের জন্যও তাহা পছন্দ করিবে। কেননা দেহের এক অংশ অপর অংশের অকল্যাণ চাহিতে পারে না। যেমন ছহীহ হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

المؤمنون كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالحمى *

সকল মুমিন এক দেহের মত। যখন দেহের কোন একটি অংগ অসুস্থ হয় তখন সর্বাংগ তাহার জন্য পীড়িত হয়।

অবশ্য হৃদয় ও কলবের এমন উন্নতি এবং নফস ও আত্মার এমন উৎকর্ষ নিজে নিজেই হইয়া যাইবে না। ছাহাবা কেরামের যেমন হইয়াছিল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী ছোহবত দ্বারা তেমনি আমাদেরও ইহার সামান্য কিছু হাছিল হইতে পারে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ছীরত ও ছাহাবা কেরামের জীবন চরিত অধ্যয়ন এবং সেই সংগে ওয়ারিছীনে আম্বিয়া তথা হক্কানী ওলামা মাশায়েখের ছোহবত দ্বারা।

(পূর্ণ মুমিন হইতে পারিবে না) ঈমানের পূর্ণতার ইহা একটি শর্ত বটে। তবে একমাত্র শর্ত নহে। আরও বিভিন্ন শর্ত বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন নিম্নোক্ত হাদীছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিরংকুশ ভালবাসাকে ঈমানের পূর্ণতার আলামত বলা হইয়াছে।

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه *

তোমাদের কেহ পূর্ণ মুমিন হইতে পারিবে না যতক্ষণ না আমি তাহার নিকট তাহার আপন সত্তা, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা ও সকল মানুষের চাইতে প্রিয় হইব।

হাদীছের শিক্ষা ঃ নিজের জন্য যাহা কিছু পছন্দ করিবে আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্যও তাহা পছন্দ করিবে।

অধ্যায় – ২৩

সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ *

তোমাদের মধ্য হইতে একটি জামা'আত অবশ্যই থাকা উচিত যাহারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে এবং সৎকাজের আদেশ করিবে আর মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিবে। উহারাই সফলকাম।

আলাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ *

তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, যাহাদিগকে মানুষের (হিদায়াত ও কল্যাণের) জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করিয়া থাক এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিয়া থাক।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ *

আপনি ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করুন এবং সৎকাজের আদেশ করুন এবং মুর্খ লোকদিগকে এড়াইয়া চলুন।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ *

মুমিন পুরুষ ও মুমিন স্ত্রীলোকগণ একে অপরের বন্ধু। তাহারা সৎ কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করে।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ * كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ *

বনী ইসরাঈলের মধ্য হইতে যাহারা কুফরি করিয়াছে তাহাদিগকে (আল্লাহর নবী) দাউদ ও ঈসা বিন মরয়ামের যবানীতে অভিশাপ দেওয়া হইয়াছে। কেননা তাহারা অবাধ্য হইয়াছিল। আর তাহারা সীমা লংঘন করিত। যে পাপ কাজ তাহারা করিত তাহা হইতে একে অপরকে তাহারা নিষেধ করিত না। বড় নিকৃষ্ট কাজই তাহারা করিত।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ *

আপনি বলিয়া দিন যে, হক (ও সত্য বিষয়) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে আসিয়াছে। সুতরাং যাহার ইচ্ছা ঈমান আনয়ন করুক আর যাহার ইচ্ছা কুফুরি করুক।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ *

সুতরাং (হে নবী!) আপনাকে যাহা হুকুম করা হইয়াছে তাহা উচ্চ কণ্ঠে প্রকাশ করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَ اَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ *

আমি তাহাদিগকে নাজাত দিলাম যাহারা জুলুম হইতে নিষেধ করিত। আর যাহারা জুলুম করিয়াছে তাহাদিগকে আমি তাহাদের পাপাচারের কারণে কঠিন আযাব দ্বারা পাকড়াও করিলাম।

আলোচ্য অধ্যায়সংশ্লিষ্ট আয়াতের সংখ্যা সুপ্রচুর ও সুপরিচিত।

ফায়দা ঃ

প্রথম আয়াতে منكم এর من অব্যয়টির অর্থ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। তাফসীরে খাযিন–এর মতে অব্যয়টি বিবরণমূলক, আংশিকতা জ্ঞাপক নহে। কেননা كنتم خير امة আয়াতে من অব্যয়টি নাই। সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা নিশ্চিত ভাবেই 'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার'–এর আমল গোটা উম্মতের উপরই ওয়াজিব করা হইয়াছে। উম্মতের অংশবিশেষের উপর নহে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের من অব্যয়টি আংশিকতা জ্ঞাপক হইতে পারে না। তখন আয়াতের অর্থ হইবে তোমরা কল্যাণের পথে আহ্বানকারী, সৎকাজের আদশেকারী এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধকারী উম্মত হও।

আয়াতের এই অর্থ যাহারা করেন তাহাদের মতে উল্লেখিত সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ পর্যাপ্ত সংখ্যক মানুষ উহা পালন করিলে অন্যদের উপর হইতে দায়িত্ব সরিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে একদল আলিমের মতে من অব্যয়টি এখানে আংশিকতা জ্ঞাপক। কেননা উম্মতের মাঝে এমন বহু লোক রহিয়াছে যাহারা অক্ষমতা বা দুর্বলতা বা অন্য কোন ওযরের কারণে আদেশ ও নিষেধ করিতে পারে না। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আয়াতে من অব্যয়টি আসিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে এই দায়িত্ব আহলে ইলম ও শাসকবর্গের সহিত খাছ। সেই হিসাবে অর্থ হইবে, তোমাদের মধ্য হইতে কিছু লোক যেন সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করে।

মনে রাখিতে হইবে যে, ফরযে কিফায়ার ক্ষেত্রে হুকুম এই যে, পর্যাপ্ত সংখ্যক লোক যখন কর্তব্য পালন করে তখনই শুধু অন্যরা দায়িত্বমুক্ত হইতে পারে। পক্ষান্তরে অপর্যাপ্ত সংখ্যক লোক কর্তব্য পালনে নিযুক্ত হইলে তাহারা অবশ্যই ওয়াজিব বা ফরয তরকের গোনাহ হইতে

বাঁচিয়া যাইবে কিন্তু অন্যরা দায়িত্বমুক্ত হইবে না। যেমন, এক গ্রামে বহু লোকের এক সংগে মৃত্যু হইল । এখন যদি তাহাদের দাফন কাফনের কাজে এই পরিমাণ লোক অংশগ্রহণ না করে যাহাতে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাধা হইতে পারে তবে অবশিষ্ট সকলেই গোনাহগার হইবে। অল্প কয়েকজন কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত হইলেই ফরযে কিফায়া আদায় হইবে না। আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার তথা দাওয়াত ও তাবলীগের বিষয়টিও অনুরূপ। দেখিতে হইবে যে, যেই পরিমাণ মানুষ এই দায়িত্ব পালন করিতেছে, তাহাতে সমাজে সৎকাজের প্রসার এবং অসৎকাজের বিলোপ হইতেছে কি না। দাওয়াতের তাকাযা পুরা হইতেছে কি না। না হইলে অন্যরা দায়িত্বমুক্ত হইতে পারিবে না।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বিগত জাতি সমূহের উপর উম্মতে মুহম্মদিয়ার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ কর।" সুতরাং যাহার মাঝে এই গুণ বিদ্যমান হইবে সে উম্মতের শ্রেষ্ঠ লোকদের কাতারে শামিল হইবে।

চতুর্থ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সালমী (রহঃ) الحقائق। কিতাবে বলিয়াছেন, আয়াতের অর্থ এই যে, তাহারা একে অপরকে ইবাদতের ক্ষেত্রে সাহায্য করিয়া থাকে এবং শক্তি যোগাইয়া থাকে। যেমন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا *

মুমিন মুমিনের জন্য প্রাচীর স্বরূপ। তাহারা এক অপরকে শক্তি যোগায়।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে– المؤمن كالجسد الواحد *

মুমিনগণ একদেহের মত।

আল্লামা আবু বকর আল ওয়াররাক (রহঃ) বলিয়াছেন, স্বভাবগতঃভাবেই মুমিন মুমিনে প্রতি বন্ধুত্ব পোষণ করে।

পঞ্চম আয়াত সম্পর্কে তাফসীরে খাযিন কিতাবে বলা হইয়াছে যে, অধিকাংশ মুফাস্‌সিরীনের মতে তাহারা ঐ সকল লোক যাহারা সীমালংঘন করিয়া শনিবারে মৎস শিকার করিয়াছিল। তখন হযরত দাউদ (আঃ) তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়া বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! তাহাদিগকে বানর বানাইয়া দাও। ফলে তাহারা বানরে পরিণত হইয়াছিল।

আকৃতি রূপান্তরের এই ঘটনা কুরআনে সূরাতুল আরাফে বর্ণিত হইয়াছে। বনী ঈসরাঈলীরা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ছিল বিধায় মৎসশিকার ছিল তাহাদের প্রিয় কাজ এবং জীবিকা লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপায়। যেহেতু শনিবার ছিল তাহাদের সাপ্তাহিক ইবাদতের দিন সেহেতু ঐ দিন তাহাদের জন্য মৎসশিকার নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিলেন যে, শনিবারেই সমুদ্রোপকূলে মাছের প্রাচুর্য দেখা দিত। পক্ষান্তরে অন্যান্য দিন মাছের দেখাই পাওয়া যাইত না।

এমতাবস্থায় একদল তো আল্লাহর হুকুম পালনে অবিচল থাকিল। কিন্তু অন্যরা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়াই শনিবারেও মৎসশিকার করিতে লাগিল। অন্য বর্ণনামতে শনিবারে তাহারা বিশেষ কৌশলে মাছ ঘেরাও দিয়া রাখিত এবং পরবর্তী দিন উহা ধরিত, এইভাবে তাহারা

আল্লাহ্র সহিত প্রতারণা করিত। এইভাবে গোটা সম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। সৎ লোকেরা অপরাধীদিগকে বাধা দিলেন। কিন্তু তাহারা বাধা মানিল না। ফলে তাহারা ইহাদের সহিত যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। এমন কি উভয় দলের বসবাসের এলাকাও আলাদা হইয়া গেল। এই প্রেক্ষিতে হযরত দাউদ (আঃ) তাহাদের জন্য উপরোল্লেখিত বদ দু'আ করিলেন। একদিন সৎ লোকেরা অপরাধীদের বস্তিতে অস্বাভাবিক নিরবতা লক্ষ করিয়া সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, সকলে বানরে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রূপান্তরিত বানরেরা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনকে চিনিত এবং তাহাদিগকে দেখিয়া নির্বাক অবস্থায় অশ্রু বর্ষণ করিত। তিনদিন পরে ইহারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

(কুরতুবী)

অন্যদিকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর অভিশাপ ছিল দস্তরখানওয়ালাদের প্রতি। বনী ইসরাঈলীরা একবার হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট আসমান হইতে খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ দস্তরখান নাযিল হইবার আবদার করিল। কোরআন শরীফে এই ঘটনা সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে–

اذ قال الحواريون يعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء *

(ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন হাওয়ারী (বা শিষ্যবর্গ) বলিল, হে মরয়ম পুত্র ঈসা! আপনার প্রতিপালক কি আমাদের উপর আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ দস্তরখান নাযিল করিতে পারেন?

তিনি তাহাদিগকে এই ধরনের আবদার হইতে বিরত থাকিবার উপদেশ দিয়া বলিলেন, দেখ, যদি তোমরা সত্যিকার মুমিন হইয়া থাক তবে আল্লাহকে ভয় কর।

কিন্তু তাহারা তাহাদের আবদার বজায় রাখিয়া বলিল, আসলে আমরা আল্লাহ্র নেয়ামত খাইতে চাহিতেছি। ইহাতে আমাদের হৃদয় আশ্বস্ত হইবে আর আমরা বুঝিতে পারিব যে, আপনি আমাদের সহিত সত্য বলিয়াছেন। আর আমরা এই ঘটনার সাক্ষী হইয়া থাকিব।

তখন হযরত ঈসা (আঃ) দস্তরখান নাযিল করিবার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীর দু'আ মঞ্জুর করিয়া দস্তরখান নাযিল করিলেন। তবে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, যাহারা হুকুম অমান্য করিবে তাহাদিগকে এমন কঠিন শাস্তি দিব যাহা বিশ্বজগতের আর কাহাকেও দিব না। আদেশ ছিল এই যে, ঐ দস্তরখানের কোন খাবার পরবর্তী দিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইবে না।

তিরমিযি শরীফে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ হইতে জানা যায় যে, ঐ দস্তরখানে রুটি ও গোশত নাযিল হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের কিছু সংখ্যক আদেশ অমান্য করিয়া পরবর্তী দিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। তখন হযরত ঈসা (আঃ) বদ দু'আ করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! তাহাদিগকে লানত দান করুন এবং তাহাদিগকে শুকরে রূপান্তরিত করুন। ফলে আল্লাহ পাক তাহাদিগকে শুকরে পরিণত করিলেন। পরে তাহারা মৃত্যু মুখে পতিত হইল।

কোন কোন আলিমের মতে, হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা (আঃ) তাহাদের সম্প্রদায়কে হযরত মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন। আর যাহারা তাঁহাকে অস্বীকার করিবে তাহাদের প্রতি অভিশাপ দিয়াছিলেন। এই ব্যাখ্যানুসারে লানতপ্রাপ্তরা হইল হযরত মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার এবং পরবর্তী যামানার বনী ঈসরাঈলীগণ।

(সীমা লংঘন করিত) অর্থাৎ আল্লাহর দুইজন বিশিষ্ট নবীর যবানীতে তাহাদের অভিশপ্ত হইবার কারণ ছিল তাহাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘন। অতঃপর সীমালংঘনের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া বলা হইল যে, তাহারা অন্যায় কাজে একে অপরকে বাধা দিত না।

হাদীছসমূহ

১৮৭। অসৎ কাজে বাধা দানের তিন স্তর

فَالأَوَّلُ: عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «مَنْ رَأى مِنكم مُنْكرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانه، فَإن لم يستطِعْ فَبِقَلْبِه وَذٰلك أَضْعَفُ الإيمانِ» رواه مسلم .

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের কেহ যখন কোন অন্যায় কাজ হইতে দেখে তখন সে যেন উহা হাত দ্বারা বন্ধ করে। যদি সে (উহা করিতে) না পারে তবে যেন মুখের কথা দ্বারা উহা বন্ধ করে। যদি সে (ইহাও) না পারে তবে (যেন) অন্তর দ্বারা (উহাকে ঘৃণা করে।) আর ইহা হইল ঈমানের দুর্বলতম স্তর।

ফায়দা ঃ

(যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ হইতে দেখে) অন্যায় কাজ রোধ করিবার জন্য স্বচক্ষে দেখা জরুরী নহে। যে কোন নির্ভরযোগ্য উপায়ে অন্যায় সম্পর্কে অবহিত হওয়াই যথেষ্ট। সুতরাং অন্যায় কাজ হইতে দেখিবার অর্থ অন্যায় সম্পর্কে অবগত হওয়া। যেমন নির্ভরযোগ্য লোক মারফত বা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানা গেল।

(তোমাদের মধ্যে যে কেহ) ইহা কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী গোটা উম্মতের প্রতি সম্বোধন। উপস্থিত ছাহাবা কেরাম ছিলেন এই আদেশের সরাসরি সম্বোধন-পাত্র। আর পরবর্তী যুগের উম্মত সম্বোধন-পাত্র হইয়াছে ছাহাবা কেরামের মাধ্যমে। যেমন বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক খোতবায় ইরশাদ হইয়াছে– فليبلغ الشاهد الغائب সাবধান! উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিত লোকদের নিকট (আমার যাবতীয় বাণী) পৌঁছাইয়া দেয়।

(সে যেন বাধা দেয়) যদি বিষয়টি একাধিক লোকের গোচরে আসে তবে বাধাদান করা ওয়াজিবে কিফায়া হইবে। অর্থাৎ উহা রোধ করিতে সক্ষম পর্যাপ্ত সংখ্যক লোক বাধা দিলে সকলে দায়িত্বমুক্ত হইবে। পক্ষান্তরে যদি শুধু একজনের গোচরে আসে তবে তাহার জন্য বাধাদান করা ফরযে আইন হইবে। আর ইহা কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সুপ্রমাণিত। তাহার

বাধাদান যদি যথেষ্ট না হয় কিংবা যদি সে বাধাদানে অক্ষম হয় তবে যাহাদের পক্ষে বাধাদান করা সম্ভব তাহাদিগকে বিষয়টি অবহিত করিতে হইবে।

(হাত দ্বারা) অর্থাৎ ঐ অন্যায়ের দমন যদি শক্তি প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল হয় আর শক্তি প্রয়োগের সামর্থ্য যদি তাহার থাকে তবে শক্তি প্রয়োগ করিয়া বাধা দিতে হইবে। মদপাত্র, বাদ্যযন্ত্র, সিনেমাহল, এবং যাত্রা প্যান্ডেল ইত্যাদি ভাংগিয়া ফেলা, ধর্মবিরোধী বইপত্র জ্বালাইয়া ফেলা পাপাচারের সমাবেশ ছত্রভংগ করিয়া দেওয়া ইত্যাদি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে এই সকল পদক্ষেপ শর্তসাপেক্ষ। সামনে উহার আলোচনা আসিতেছে।

(যদি না পারে) অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাধা দিতে যদি সক্ষম না হয়; যেমন শক্তি প্রয়োগ করিতে গেলে তাহার শারীরিক, আর্থিক বা ইজ্জত আবরুর ক্ষতি হইবার আশংকা দেখা দেয়। অবশ্য অমূলক ভীতি ও আশংকা গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা ইহা শয়তানী ওয়াসওয়াসা যাহার উদ্দেশ্য হইল নাহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব হইতে পলায়ন।

তিরমিযি শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছে এই দিকেই ইংগিত করা হইয়াছে–

الا لا يمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول بحق اذا علمه *

সাবধান, মানুষের ভয় (বা প্রভাব) যেন কাহাকেও সত্য কথা জানিবার পর উহা বলা হইতে বিরত না রাখে।

(তবে মুখ দ্বারা) কিংবা কলম দ্বারা কিংবা অর্থ ব্যয় করিয়া কিংবা অন্য যে কোন বৈধ উপায়ে। এইগুলি সবই দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অন্যায় ও পাপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিকে স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে অনুরোধ-উপরোধ, অনুনয়-বিনয় ও তিরস্কার দ্বারা এবং আল্লাহর আযাব-গজব ও মওতের ভয় দেখাইয়া কখনো নরমে কখনো গরমে অবস্থার উপযোগী ভাষায় বাধা দিতে হইবে।

বাধাদানকারী ব্যক্তি নিজে আমল করে কি করে না, নিজে মানিয়া চলে কি চলে না, ইহার কারণে বাধাদান ওয়াজিব হইবার বিষয়ে কোন তারতম্য হইবে না। অর্থাৎ সে নিজে আমল না করিলেও বাধাদান করা তাহার জন্য ওয়াজিব হইবে। কেননা নিজে আমল না করা এক গোনাহ। আর বাধাদান না করা ভিন্ন গোনাহ। অবশ্য ইহা ঠিক যে, নিজে আমল না করিয়া বাধা দিতে গেলে উহার বিশেষ আছর হইবে না।

সুতরাং মানুষকে যে কাজের আদেশ করিবে আগে নিজে উহা আমল করিবে। তদ্রূপ যে অন্যায় হইতে মানুষকে বাধা দিবে আগে নিজে উহা পরিহার করিবে। তখন তাহার কথায় আছর হইবে। তবে এই কারণে বলা বন্ধ করিবে না। কেননা বলিতে বলিতে নিজের মধ্যেও আমল আসিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য নিজের অন্তরে একটি অপরাধবোধ জাগ্রত রাখিয়া অতঃপর যাহা বলিবার বলিবে। যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে তাহার প্রতি সহানুভূতি পোষণ করিবে। কিছুতেই তাহাকে ঘৃণা করিবে না। তবেই বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের ফায়দা হইবার আশা করা যায়।

তদ্রূপ তাহার কথায় আছর হইবে কি হইবে না, ইহা বিবেচ্য বিষয় নহে। বরং উভয় অবস্থায়ই তাহাকে বলিয়া যাইতে হইবে। কথার মধ্যে আছর পয়দা করিবার মালিক তো স্বয়ং আল্লাহ্ পাক।

তবে কর্তৃপক্ষীয় অনুমতি ছাড়া বাধা দিতে গেলে যদি ফিতনার আশংকা দেখা দেয়, তখন পূর্ব-অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে।

বাধা প্রদান জায়েয হইবার জন্য আরেকটি শর্ত হইল সংঘর্ষ ও অস্ত্রবাজির আশংকা যেন না থাকে। যদি সংঘর্ষ বা অস্ত্রবাজির আশংকা থাকে তবে সাধারণ লোকের উহাতে হস্তাক্ষেপ করা জায়েয হইবে না। বরং বিষয়টি শাসকবর্গের দায়িত্বভুক্ত হইবে। সাধারণ লোকের দায়িত্ব হইবে বিষয়টিকে প্রশাসনের গোচরে আনয়ন করা এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করা কিংবা চাপ প্রয়োগ করা।

যাহারা বলেন যে, পরিণতি যাহাই ঘটুক এবং পরিস্থিতি যে দিকেই মোড় নেউক, সর্বাবস্থায় অন্যায়ের প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করিতে হইবে তাহাদের এই বক্তব্য আলোচ্য হাদীছের স্বাভাবিক অর্থের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে। কেননা এখানে অক্ষমতার বিষয়টিকে বিবেচনায় আনা হইয়াছে। তাহাছাড়া শরীয়তের মাসআলা এই যে, জান মালের ক্ষতির আশংকা দেখাদিলে কিংবা বল প্রয়োগ ও নির্যাতনের সম্মুখীন হইলে অন্তরে ঈমান পোষণ করিয়া মুখে কুফুরি কথা বলা জায়েয আছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে–

الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان *

(তবে যাহাকে বাধ্য করা হইল এমন অবস্থায় যে, তাহার অন্তর ঈমানের ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত রহিয়াছে।)

সুতরাং অনুরূপ পরিস্থিতিতে অন্যায়ের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ পরিহার করা আরও সহজেই জায়েয হইবে। কেননা জঘন্যতার ক্ষেত্রে ভালকাজ না করা মন্দকাজ করিবার চাইতে লঘু। মুখে কুফুরি শব্দ উচ্চারণ করিবার অর্থ মন্দ কাজ করা। আর মন্দকাজে বাধাদান না করিবার অর্থ ভাল কাজ না করা। সুতরাং যেখানে মন্দ কাজ জায়েয হইল সেখানে ভাল কাজ করা হইতে বিরত থাকা জায়েয হইবেনা কেন।

তদ্রূপ যদি তাহার প্রবল ধারণা হয় যে, নিষেধ বা বাধাদানের কারণে অন্যায়ে লিপ্ত ব্যক্তির জিদ আরও বাড়িয়া যাইবে এবং উক্ত অন্যায় কর্ম আরও বেশী করিয়া করিবে সেইক্ষেত্রে বাধাদান করিতে যাওয়া ঠিক হইবে না।

বাধাদানের জন্য আরেকটি শর্ত এই যে, বিষয়টি সকল ইমামের মতেই অন্যায় হইতে হইবে। যদি কোন ইমামের মতে জায়েয আর কোন ইমামের মতে হারাম হয় তবে প্রথম ইমামের অনুসারী ব্যক্তি দ্বিতীয় ইমামের অনুসারী ব্যক্তিকে বাঁধা দিতে পারিবে না।

কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা তো অন্যায় কর্মে বাধাদান ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয় না।

عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم *

তোমরা নিজেদের ব্যাপারে যত্নবান হও। তোমরা যদি হিদায়াত গ্রহণ কর তবে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

এই প্রশ্ন ঠিক নহে। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন–

ائتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنكر، فاذا رايت شحا مطاعا و هوى متبعا و دنيا موثرة و اعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك *

তোমরা নেক কাজের আদেশ করিতে থাক এবং অন্যায় কাজ হইতে একে অপরকে নিষেধ করিতে থাক। কিন্তু যখন চরম কৃপণতা এবং প্রবল প্রবৃত্তিপরায়ণতা এবং দুনিয়ার প্রতি অগ্রাধিকার দেখিতে পাও এবং প্রত্যেককেই নিজ নিজ মতামত লইয়া সন্তুষ্ট দেখিতে পাও তখন তুমি নিজের ব্যাপারে যত্নবান হও। (অন্যকে লইয়া চিন্তা করিও না)

এই হাদীছে পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে, আলোচ্য আয়াত শুধু ঐ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন অন্যায় কাজে বাধা দান সম্ভব না হয়। কিংবা বাধা দিলেও কাজ হইবার কোন সম্ভাবনা না থাকে। তখন বাধ্যবাধকতা রহিত হইবার ব্যাপারে অবশ্য দ্বিমত নাই।

তদুপরি গবেষক আলিমগণের মতে আয়াতের আসল অর্থ এই যে, তোমাদিগকে যাহা আদেশ করা হইয়াছে তাহা যখন তোমরা পালন করিবে তখন অন্যদের ত্রুটি অবহেলা তোমাদের কোন ক্ষতি করিবে না। আর আমাদিগকে যে সকল আদেশ করা হইয়াছে তন্মধ্যে অন্যতম হইল আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার। প্রতিপক্ষ যখন আদেশ বা নিষেধ মান্য করিবে না তখন আমাদের কোন ক্ষতি হইবে ন। কেননা আমাদের দায়িত্ব হইল আদেশ বা নিষেধ করা মান্য করানো আমাদের দায়িত্ব নহে।

(তবে অন্তর দ্বারা) অর্থাৎ উহাকে ঘৃণা করিবে এবং পাক্কা নিয়ত রাখিবে যে, যখনই হাতে বা মুখে বাধা দানের সামর্থ্য হইবে তখনই আমি বাধা দিব। কেননা পাপ ও নাফরমানির প্রতি অসন্তুষ্টি পোষণ করা ওয়াজিব। ইহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবার অর্থ অন্যায়কারীর সহিত নিজেও শরীক থাকা। কেননা হাদীছ শরীফে আছে–

من شهدها و كرهها كان كمن غاب عنها و من غاب عنها و رضى بها كان كمن شهدها *

যে কোন অন্যায় কাজে উপস্থিত থাকিয়াও উহার প্রতি ঘৃণা পোষণ করিবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে উহা হইতে অনুপস্থিত ছিল। পক্ষান্তরে যে অনুপস্থিত থাকিয়াও উহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হইবে যে, উহাতে উপস্থিত (ও শরীক) ছিল।

ঈমানের দুর্বলতম স্তর অন্য বর্ণনায় আছে–

و ليس و راء ذلك من الايمان حبة خردل *

ইহার পরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও আর নাই।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্যায়ের প্রতি অন্তরে অসন্তুষ্টি না থাকা অন্তর হইতে ঈমান বাহির হইয়া যাইবার আলামত। এই কারণেই হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন–

هلك من لم يعرف بقلبه المعروف و المنكر *

যে ব্যক্তি তাহার অন্তরে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য অনুভব করে না সে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

কেননা ইহা তো এমন ফরয যাহা কোন অবস্থাতেই রহিত হয় না। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী স্তর দুইটি অবস্থাবিশেষে রহিতও হইতে পারে।

ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন যে, এই হাদীছটিকে দ্বীনের এক তৃতীয়াংশ বলিয়া আখ্যায়িত করা যাইতে পারে। কেননা শরীয়তের আহকাম মোট ছয় প্রকার। যথা, ওয়াজিব (ও ফরয), সুন্নত (ও মুস্তাহাব) এবং মুবাহ (বা জায়েয) তদ্রূপ বিপরীতে অনুত্তম (বা খেলাফে আওলা) মাকরূহ ও হারাম। তন্মধ্যে আলোচ্য হাদীছে দুই প্রকার আহকামের কথা জানা গেল। প্রথমতঃ যাবতীয় ওয়াজিব ও ফরয কাজ সম্পর্কে আদেশ করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ যাবতীয় হারাম কাজ হইতে নিষেধ করা জরুরী।

কাহারও কাহারও মতে এইখানে পূর্ণ দ্বীন বয়ান করা হইয়াছে। কেননা শরীয়তের আহকাম গুলি হয় নেক কাজসংক্রান্ত কিংবা মন্দকাজসংক্রান্ত। আর আলোচ্য হাদীছের সারকথা এই যে, মানুষকে নেক কাজের আদেশ করিতে হইবে এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিতে হইবে।

হাদীছের শিক্ষা ঃ প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হইল নিজেও সৎকাজ করা এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকা। অতঃপর সাধ্যমত নেক কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করা।

১৮৮। বে-আমল ও বদ আমলদের বিরুদ্ধে জিহাদ

الثاني : عَنِ ابْنِ مسعودٍ رضي الله عنه، أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَا مِنْ نَبيٍّ بَعَثَه الله في أمةٍ قَبْلِي إلاَّ كانَ له مِنْ أُمَّتِه حَوَارِيُّونَ وَأَصْحابٌ يَأْخُذونَ بِسُنَّتِه وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِه، ثُمَّ إنها تَخْلُفُ مِنْ بعدِهم خُلُوفٌ يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يُؤْمَرون، فَمَنْ جاهَدَهم بِيَدِه فهو مؤمِنٌ، وَمَنْ جاهَدَهم بِقَلْبِه فهو مُؤْمِنٌ، ومن جاهَدَهُمْ بِلِسَانِه فَهو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وراءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ» رواه مسلم(٧).

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার পূর্বে আল্লাহ যে কোন নবীকেই তাঁহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছেন, তাঁহার জন্য উম্মতের মধ্য হইতে একদল হাওয়ারী ও ছাহাবী থাকিতেন যাহারা তাঁহার তরীকা গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার আদেশ অনুসরণ করিতেন। অতঃপর তাহাদের পরবর্তীতে এমন একদল নিকৃষ্ট স্থলবর্তী (তাহাদের) স্থান গ্রহণ করিত যাহারা এমন কথা বলিত যাহা করিত না। আর এমন কাজ করিত যাহা করিবার আদেশ তাহাদিগকে করা হইত না। (আমার উম্মতেও এই ধরণের লোক পয়দা হইবে।) সুতরাং যে তাহাদের বিরুদ্ধে হাত দ্বারা (শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে) জিহাদ করিবে সে (পূর্ণ) মুমিন। তদ্রূপ যে ব্যক্তি তাহাদের বিরুদ্ধে মুখ দ্বারা জিহাদ করিবে সেও মুমিন। তদ্রূপ যে ব্যক্তি তাহাদের বিরুদ্ধে অন্তর দ্বারা জিহাদ করিবে সেও মুমিন। ইহার পরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও নাই। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(হাওয়ারী) বিখ্যাত আভিধানিক আল্লামা আল-আযহারী ও অন্যান্যরা বলেন, হাওয়ারী বলা হয় নবীর একান্ত আস্থাভাজন ও বিশিষ্ট শিষ্যকে, যাহারা যাবতীয় দোষত্রুটি হইতে সংশোধনপ্রাপ্ত। অন্যদের মতে হাওয়ারী অর্থ নবী বা রাসূলগণের সাহায্যকারী দল যাহারা রিসালত ও নবুয়তের দায়িত্ব পালনে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। কাহারও কাহারও মতে হাওয়ারী অর্থ ঐ সকল লোক যাহারা নবীগণের ইন্তিকালের পরে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত রূপে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতার অধিকারী।

(এমন কথা বলিত যাহা করিত না।) তাহাদের কর্মে বা জীবনাচরণে দ্বীনদারী ও ধার্মিকতা ছিল না। নবীর তরীকা ও শরীয়তের অনুসরণ তাহারা করিত না। কিন্তু মুখে ধর্মের কথা, ঈমান একীনের কথা ও তাকওয়া পরহেযগারির কথা খুব বলিত এবং দ্বীন ও শরীয়তের নামে এমন সকল বিদ'আতি আমল করিত যাহার নির্দেশ শরীয়তে ছিল না বরং সকলই ছিল তাহাদের মনগড়া। যেমন, বর্তমানে দেখা যায় যে, নামাযের ইহতিমাম নাই। যাকাত আদায়ের গরজ নাই। হজ্জের খেয়াল নাই। গানবাজনা ও যাবতীয় হারাম কাজ হইতে তাওবা করিবার তাগিদ নাই। অনুতাপ অনুশোচনা নাই। কিন্তু মিলাদ, কিয়াম, ওরস, কবর পূজা ও মাজার পূজা, নযর নিয়ায, শিন্নি মান্নত ইত্যাদি শরীয়তের সহিত সম্পর্কহীন ও সুন্নতবিরোধী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে আগ্রহের কোন কমতি নাই। বরং এইগুলিকেই দ্বীনের জরুরী বিষয় বলিয়া চালানো হইতেছে। ইহাদের বিরুদ্ধেই (শরীয়তসম্মত উপায়ে) জিহাদ করিবার প্রতি হাদীছে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে এবং ইহাকে ঈমানের আলামত রূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

(যেতাহাদের বিরুদ্ধে হাত দ্বারা জিহাদ করিবে) অর্থাৎ যদি ঐ অন্যায় কাজ দূর করা শক্তি প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল হয় এবং উহা দূর করিতে গিয়া উহার চাইতে বড় অনিষ্ট দেখা না দেয়। যেমন শাসকবর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে উম্মাহর ঐক্যে ফাটল ধরানো।

(জিহ্বা দ্বারা) ইহার আলোচনা পূর্ববর্তী হাদীছে করা হইয়াছে।

(ইহার পরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও নাই।) অর্থাৎ অন্তরে উক্ত অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা পোষণের চাইতেও নীচের স্তরে ঈমানের কোন অস্তিত্ব নাই। কেননা সর্বোচ্চ নাফরমানি হইল কুফুরি। সুতরাং ইহার প্রতি সন্তুষ্টি কুফুরির অন্তর্ভুক্ত হইবে। পক্ষান্তরে শাহওয়াতের প্রবলতা হইতে সৃষ্ট সাধারণ নাফরমানির প্রতি সন্তুষ্টি ঈমানের মধ্যে বিরাট নোকছান সৃষ্টিকারী। আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এইখানে ঈমানের অর্থ ইসলাম। অর্থাৎ কলবে বিদ্যমান ঈমান ও আকীদার ফল রূপে প্রকাশিত আমল ও আচরণ উদ্দেশ্য। সুতরাং হাদীছের অর্থ হইল আমল ও আচরণের আকারে ঈমানের যতগুলি গুণ ও ফল প্রকাশ পাইতে পারে তন্মধ্যে সর্বশেষ হইল অন্যায়ের প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ। ইহার পরে ঈমানের আলামত রূপে অন্য কোন গুণ নাই।

আল্লামা কুরতুবী (রঃ)-এর বক্তব্যের খোলাসা এই যে, এই কথা দ্বারা মূল ঈমানের ক্ষীণতম অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় নাই। বরং ঈমানের আলামতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে। (আল্লাহই উত্তম জানেন।)

হাদীছের ইলমী ব্যাখ্যা ও তত্ত্বীগত বিশ্লেষণ যাহাই হউক অন্যায় ও শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতি সামান্যতম ঘৃণা না থাকা যে ঈমানের অস্তিত্বের জন্য কত বড় খাতরা তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু প্রশ্ন হইল যে, এই হাদীছখানা হৃদয়ংগম করিবার পরও কি আমাদের হুঁশ হইবে না? ইহার পরও কি নিজ নিজ ঈমানের হিফাযতের ফিকির হইবে না? বুকে হাত দিয়া আমরা কতজন বলিতে পারিব যে, অন্যায় ও নাফরমানির কাজের প্রতি আমাদের অন্তরে ঘৃণা রহিয়াছে?

হাদীছের শিক্ষা ঃ হাতে বা মুখে অন্যায় ও মন্দের প্রতিরোধ করিতে না পারিলে অন্তত অন্তরে উহাকে ঘৃণা করিতে হইবে। অন্যথায় ঈমানের অস্তিত্ব খাতরায় পড়িয়া যাইবে।

১৮৯। সত্যপ্রকাশে নিন্দার ভয় না করা

الثالثُ: عَنْ أبي الوَليدِ عُبادَةَ بْنِ الصامِتِ رضي الله عنه قال: «بَايَعْنا رسولَ اللهِ ﷺ على السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في العُسْرِ وَاليُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أثَرَةٍ عَلَيْنا، وَعَلَى أنْ لا نُنازِعَ الأمْرَ أهْلَهُ إلاَّ أنْ تَرَوْا كُفْراً بَواحاً عِنْدَكم مِنَ اللهِ تعالى فيه بُرْهانٌ، وَعَلَى أنْ نقولَ بِالْحَقِّ أيْنَما كُنا لا نَخافُ في اللهِ لَوْمَةَ لائِمٍ» متفق عليه[১].

হযরত আব্দুল ওয়ালীদ ওবাদা ইবনে ছামিত (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাই'আত হইয়াছি এই শর্তের উপর যে, সংকটে ও সহজ সময়ে এবং আরামে ও কষ্টের সময়ে মুসলমানদের শাসকবর্গের পূর্ণ আনুগত্য করিব এবং শাসকবর্গ কর্তৃক আমাদিগকে অনগ্রাধিকার প্রদান বরদাশ্‌ত করিব এবং এই শর্তের উপর যে, শাসনক্ষমতার প্রশ্নে তাহাদের সহিত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইব না। যতক্ষণ না তোমরা (তাহাদের আকীদা বা আচরণে) প্রকাশ্য কুফুরি দেখিতে পাও, যাহার ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে স্পষ্ট কোন দলিল-প্রমাণ রহিয়াছে এবং এই শর্তের উপর যে, আমরা যেখানেই থাকি হক কথা বলিব। আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরওয়া করিব না। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(বাই'আত হইয়াছি) পিছনে বাই'আত সংক্রান্ত আলোচনা গিয়াছে।

(অনগ্রাধিকার প্রদান বরদাশ্‌ত করিব) অর্থাৎ শাসকবর্গ যদি আমাদের হক আদায় না করে বরং নিজেদিগকে কিংবা অন্যদিগকে আমাদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে তবে আখিরাতে আল্লাহর নিকট উহার বিনিময় লাভের নিয়তে ছবর করিব। তবু অধিকার আদায়ের দাবীতে আন্দোলন ও গোলযোগ করিয়া কেন্দ্রীয় ঐক্য বিনষ্ট করিব না।

বস্তুতঃ রাষ্ট্রীয় পর্যায় ছাড়া ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ পর্যায়েও ইহাই ইসলামের শিক্ষা যে, আমার উপর অন্যের যে সকল হক রহিয়াছে সেইগুলি আমি আদায় করিব আর আমার যে সকল হক অন্যের উপর রহিয়াছে সেইগুলির ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিব। বর্তমান মুসলিম সমাজগুলিতে যে অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে উহার পিছনে অন্যতম কারণ

ইহাই যে, সকল পক্ষ অধিকার আদায়ের মরণপণ সংগ্রামে নিয়োজিত। অধিকার প্রদানের চিন্তা কাহারও অন্তরে নাই। বলাবাহুল্য যে, যাহার অন্তরে আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা বদ্ধমুল হইয়াছে এবং আখিরাতে প্রতিদান লাভের সুদৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে তাহার জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতি ও শিক্ষা অনুসরণ করিয়া চলা খুবই সহজ। আর কোন সমাজে যখন এই ধরনের আদর্শ লোকের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে তখন উহা সুখ শান্তি ও সম্প্রীতির পুষ্প-উদ্যানে পরিণত হয়।

অবশ্য ইহা হইল ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর। পক্ষান্তরে কেহ যদি অন্যের হক আদায় করিবার পর নিজের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে চেষ্টা করে তবে শরীয়তে উহার পূর্ণ অবকাশ রহিয়াছে।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, হাদীছের অর্থ এই যে, যে সকল বিষয় শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ এবং আল্লাহর নাফরমানি নহে সেই সকল ক্ষেত্রে শাসকবর্গের আনুগত্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি। নফসের জন্য ইহা মানিয়া চলা সহজ হউক কিংবা কঠিন। কিন্তু যদি উহাতে আল্লাহর নাফরমানি হয় তবে কোন আনুগত্য নাই। কেননা বিভিন্ন হাদীছে এই বিষয়ে স্পষ্ট নিষেধ আসিয়াছে। সুতরাং বাহ্যতঃ নিঃশর্ত হাদীছকে শর্তযুক্ত অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন এক হাদীছে ইরশাদ হইয়াছে–

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق *

খালিকের নাফরমানি করিয়া মাখলূকের আনুগত্য বৈধ নহে।

ইমাম নববী (রহঃ) আরও বলেন, আলোচ্য সকল ক্ষেত্রে আনুগত্যের সুফল হইল মুসলমানদের ঐক্য বজায় থাকা যাহাকে ইসলামী শরীয়ত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান করিয়াছে। কেননা অনৈক্য হইল দ্বীন নষ্ট হইবার কারণ।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, ইহা সম্ভবতঃ আনসারদের সহিত সম্পর্কিত কথা। আনছারদের নিকট হইতে এই শপথ গ্রহণের কারণ হোনায়ন যুদ্ধের দিন প্রকাশ পাইয়াছিল। উক্ত যুদ্ধে কোরায়শের বহু সংখ্যক নওমুসলিম মুসলমানদের পক্ষে শরীক হইয়াছিল, যাহারা হোনায়ন যুদ্ধের সামান্য পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের মনোরঞ্জনের জন্য যুদ্ধলব্ধ গনীমতের সিংহভাগ তাহাদের মাঝেই বন্টন করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সীমাহীন মুহব্বতের কারণে আনছারদের অন্তরে আশংকা উপস্থিত হইল যে, আল্লাহর রাসূল মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আপনজনদিগকে ফিরিয়া পাইয়া আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। হয়ত বা এখন তিনি মদীনার পরিবর্তে মক্কাতেই বাস করিবেন। এই ভাবনা তাহাদিগকে ভীষণভাবে ব্যথা দিল এবং তাহারা মনমরা হইয়া বিভিন্ন আলোচনা করিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে যখন এই আলোচনা পৌঁছিল তখন তিনি তাহাদিগকে একত্র করিয়া বলিলেন, তোমাদের পক্ষ হইতে ইহা কি কথা আমার কানে আসিল? তখন আনছারদের মধ্যে যাহারা প্রাজ্ঞ তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাহারা বিচক্ষণ তাহারা কিছু বলেন নাই। তবে আমাদের অল্পবয়স্করা বলাবলি করিয়াছে, 'আল্লাহ তাঁহার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষমা করুন। আমাদিগকে বাদ দিয়া তিনি কোরায়শকে দিতেছেন অথচ এখনও

আমাদের তরবারি হইতে তাহাদের রক্ত ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে।' তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আনছারগণ! আমি কি তোমাদিগকে ভ্রষ্ট অবস্থায় পাই নাই। অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদিগকে সত্য পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আর আমি কি তোমাদিগকে অভাবগ্রস্ত অবস্থায় পাই নই। অতঃপর আল্লাহ তোমাদিগকে আমার মাধ্যমে সচ্ছল করিয়াছেন। আর আমি কি তোমাদিগকে শতধাবিভক্ত অবস্থায় পাই নাই। অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদিগকে একতাবদ্ধ করিয়াছেন?

তাঁহারা (প্রতিটি কথার উত্তরে) বলিতেছিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই অধিক অনুগ্রহকারী। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি আমার কথার প্রতি-উত্তর করিবে না? তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই অধিক অনুগ্রহকারী। তিনি বলিলেন, শোন; তোমরা যদি এই এই কথা বলিতে চাহিতে তবে বলিতে পারিতে। (কিন্তু ভদ্রতা, উদারতা ও ধার্মিকতার কারণে তাহা বল নাই।) অতঃপর তিনি বলিলেন, দেখ; আমি এমন কিছু লোককে অধিক পরিমাণে দান করিতেছি যাহাদের কুফুরিকাল অতিসাম্প্রতিক। ইহা দ্বারা আমি তাহাদের মনোরঞ্জন করিতেছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, اما ..... ترضون আচ্ছা, তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নহ যে, লোকেরা উট ছাগল লইয়া ফিরিয়া যাইবে আর তোমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাদের বাড়ীতে লইয়া যাইবে? আনছারগণ হইল আমার অন্তর্বাস আর অন্য লোকেরা হইল বহির্বাস। হিজরতের আলাদা মর্যাদা না থাকিলে আমি তো আনছারগণেরই একজন হইতাম। আনছারগণ যদি এক উপত্যকা এবং এক পাহাড়ী পথ দিয়া চলে আর অন্য লোকেরা আরেক উপত্যকা ও অন্য পাহাড়ী পথ দিয়া চলে তবে আমি অবশ্যই আনছারগণের উপত্যকা ও পাহাড়ী পথে চলিতাম।

অতঃপর তিনি বলিলেন–

انكم ستلقون بعدى اثرة شديدة فاصبروا حتى تلقونى على الحوض *

আমার পরে তোমরা (নিজেদের প্রতি) ভীষণ অনগ্রাধিকার (ও অবিচার) দেখিতে পাইবে। তখন তোমরা হাউযে কাওছারের পারে আমার দেখা পাওয়া পর্যন্ত ছবর করিবে।

তাহারা বলিলেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আমরা অবশ্যই ছবর করিব।

তিনি তখন তাঁহাদের তিন প্রজন্মকে এই বলিয়া দু'আ দিলেন–

اللهم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار *

হে আল্লাহ! আনছারদিগকে, আনছার-পুত্রদিগকে এবং আনছার-পুত্রদের পুত্রদিগকে আপনি রহম করুন।

(প্রকাশ্য কুফুরি) আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, কুফুরি দ্বারা এইখানে আমলের নাফরমানি উদ্দেশ্য। আকীদাগত কুফুরি উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং হাদীছের অর্থ হইল, শাসকদের শাসনবিষয়ে তোমরা দ্বন্দ্ব করিও না। তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামিও না। তবে যদি তাহাদের পক্ষ হইতে এমন সুস্পষ্ট অন্যায় প্রকাশ পাইতে দেখ যাহার অন্যায় হওয়া ইসলামের বুনিয়াদি দলিল প্রমাণাদি দ্বারা তোমরা সুনিশ্চিতভাবে জানিতে পার তখন তোমরা তাহাদের বিপক্ষে উহার প্রতি অসমর্থন জানাইবে এবং যেখানেই থাক সত্যের পক্ষে থাকিবে। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

করা এবং তাহাদের সহিত লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া সর্বসম্মতভাবেই হারাম। যদিও তাহারা ফাসিক ফাজির হয়। শরীয়তের অসংখ্য বাণী সুস্পষ্টভাবে ইহাই প্রমাণ করে।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) অবশ্য 'কুফুরি'কে বাহ্য অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বলেন, হাদীছের অর্থ এই যে, যদি তোমরা এমন কুফুরি দেখিতে পাও যাহার কুফুরি হইবার ব্যাপারে তোমাদের নিকট শরীয়তের অকাট্য দলিল প্রমাণ রহিয়াছে; যাহা অস্বীকার করিবার কোন অবকাশ নাই তখন বাই'আত ও আনুগত্য ছুঁড়িয়া ফেলা অবশ্যকর্তব্য।

(হক কথা বলিব) অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ করিব এবং অসৎ কাজে নিষেধ করিব। তবে প্রয়োজনীয় শর্তাদির অবশ্যই রেয়ায়েত করিতে হইবে যাহা পূর্ববর্তী দুই হাদীছের ব্যাখ্যায় বয়ান করা হইয়াছে।

(তিরস্কারের ভয় করিব না) অর্থাৎ এই বিষয়ে কাহাকেও তোষণ করিব না। বিত্তশালীদের বিত্ত কিংবা শাসকদের রক্তচক্ষু ও নিন্দা অপবাদ কোন কিছু দ্বারাই প্রভাবিত হইব না। কেননা হাদীছের এরশাদ হইল—

افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر *

জালিম শাসকের সামনে সত্য ভাষণই হইল সর্বোত্তম জিহাদ।

এই সর্বোত্তম জিহাদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিছ ও নায়েবে নবী হিসাবে ওলামায়ে হক কিভাবে পালন করিয়াছেন, তাহার দুই একটি নমুনা আমরা এইখানে তুলিয়া ধরিতেছি। হয়ত ইহা দ্বারা আমাদের অন্তরও সত্যভাষণে অনুপ্রাণিত হইবে।

প্রসিদ্ধ জালিম হজ্জাজ বিন ইউসুফের সামনে যখন অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী হযরত সাঈদ বিন জোবায়র (রহঃ)-কে জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হইবার অপরাধে গ্রেফ্‌তার করিয়া আনা হইল তখন তিনি অতি নির্ভীক চিত্তে তাহার প্রতিটি কথার দাঁতভাংগা জওয়াব দিয়াছিলেন। যেমন, হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, আলী সম্পর্কে তোমার কি মতামত? সে কি জান্নাতে না জাহান্নামে? (উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিকের পক্ষ হইতে নিযুক্ত শাসক হাজ্জাজ ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি চরম বিদ্বেষী) হযরত সাঈদ বিন জোবায়র (রহঃ) বলিলেন, জান্নাতে ও জাহান্নামে যদি যাওয়া সম্ভব হইত এবং জান্নাত ও জাহান্নামের সকল অধিবাসীকে দেখা যদি সম্ভব হইত তবে বলিতে পারিতাম। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কিভাবে হত্যা করা তোমার পছন্দ? তিনি বলিলেন, হে হাজ্জাজ! তোমার নিজের ব্যাপারে পছন্দ কর। কেননা আল্লাহর কসম! আজ তুমি আমাকে যেভাবে হত্যা করিবে কিয়ামতের দিন তোমাকে ঠিক সেইভাবে হত্যা করা হইবে।

হযরত ইমাম মালিক (রহঃ)-এর একটি ফতোয়া আব্বাসী খলীফার অপছন্দ হইলে তাঁহাকে এই ফতোয়া প্রত্যাহার করিতে বলা হইল। কিন্তু তিনি এই অন্যায় আবদার প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফলে তাঁহাকে চাবুক লাগানো হইল এবং শহর প্রদক্ষিণ করানো হইল। তিনি সমস্ত নির্যাতন ও অপমান আল্লাহর ওয়াস্তে বরদাশত করিলেন। কিন্তু সত্যভাষণ হইতে সরিলেন না।

ভ্রান্ত ফিরকা মুতাজিলীদের দাবী হইল কোরআন আল্লাহর সৃষ্টি। পক্ষান্তরে গোটা উম্মত তথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আকীদা এই যে, আল্লাহ যেমন কাদীম বা অনাদি তদ্রূপ

আল্লাহর কালাম কোরআনও কাদীম বা অনাদি। মুতাজিলী সম্প্রদায়ের এই ভ্রান্ত আকীদা এক সময় 'খালকে কোরআন' ফিতনা নামে গোটা ইসলামী বিশ্বে মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে খলীফা আল মুতাছিমও এই ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে ওলামায়ে হকের উপর নির্যাতনের এক ভয়াবহ পরীক্ষা নামিয়া আসিয়াছিল। তাঁহাদের মাঝে বিশিষ্টতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)। তাঁহাকে প্রতিদিন দোররা লাগানো হইত আর তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার আকীদায় অবিচল ছিলেন।

পরবর্তী জীবনে তিনি খলীফা আল-মুতাছীমের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করিতেন। এই সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিতেন, দেখ, মুতাছীম হইলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার বংশধর। আমি চাহি না যে, কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হইব যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খান্দানের কাহারো সহিত আমার কোন বিরোধ থাকিবে।

ঐতিহাসিক আর-রাযী সমসাময়িক বুযুর্গ শায়খুল ইসলাম ইযযুদ্দীন বিন আব্দুস সালামের একটি ঘটনা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

একবার তিনি সুলতানের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কিল্লায় প্রবেশ করিলেন, শান শওকতপূর্ণ দরবারে সকলের সামনেই সুলতানকে তিনি নাম ধরিয়া বলিলেন—

হে আইয়ুব! তোমার অন্তরে কি আল্লাহর ভয় নাই? রোয হাশরে সর্বশক্তিমান আল্লাহ যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাকে আমি মিশরের ক্ষমতায় বসাইয়াছিলাম। অথচ তথায় তুমি অবাধে মদপানের অনুমতি দিয়াছ। হে আইয়ুব! একবারও কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, তখন তুমি কি জওয়াব দিবে? অমুক অমুক দোকানে প্রকাশ্যে মদ বিক্রয় হইতেছে আর তুমি হে মিশর-অধিপতি! হারেমের ভোগ বিলাসে ডুবিয়া আছ। এইভাবে আমাদের শায়খ বেশ উচ্চঃস্বরে একেকটি শব্দ বলিয়া যাইতেছিলেন আর উপস্থিত দরবারীরা রুদ্ধশ্বাসে উহা শুনিয়া যাইতেছিল। শায়খের অভিযোগ শেষ হইলে সুলতান কিঞ্চিৎ কৈফিয়তের সুরে বলিলেন, কিন্তু ইহা তো আমার পিতার আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমার দোষ কোথায়? শায়খ সংগে সংগে আল কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত করিলেন—

قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآئَنَا *

(তুমি কি তাহাদের দলভুক্ত হইতে চাও) যাহারা বলিত যে, আমরা তো আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এই পথেই চলিতে দেখিয়াছি?

শায়খের জলদগম্ভীর কণ্ঠে আল কোরআনের এই আয়াত শুনিবামাত্র সুলতানের মনে অপরাধবোধ জাগ্রত হইল। ফলে সেই মুহূর্তেই তিনি মদের দোকান উচ্ছেদ এবং উহার মালিকদের গ্রেফতারের নির্দেশ জারি করিলেন।

এইদিকে কিল্লা হইতে শায়খের ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই সর্বত্র এই চাঞ্চল্যকর খবর ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই আশংকা করিতেছিল যে, এখনই হয়ত কিল্লার ফটক দিয়া শায়খের শহিদী লাশ বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু শায়খকে নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া উৎফুল্ল জনতা আল্লাহর শোকর আদায় করিল। আমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, প্রিয় বন্ধু! যখন আমি দরবারের শান শওকত এবং সুলতানের পুলকিত ভাব লক্ষ করিলাম তখন আমার ধারণা হইল যে, মৃদু তিরস্কারের মাঝেই তাঁহার মংগল নিহিত। অন্যথায় হয়ত তাহার নফস তাহার ক্ষতি করিতে উদ্যত হইবে।

আমি বলিলাম, আপনার মনে কি তখন কোন ভয় ভীতি জাগ্রত হয় নাই? উত্তরে শায়খ বলিলেন, সুলতানের রাজকীয় শান শওকত ও বিলাস প্রাচুর্যের মুকাবিলায় আমি যখন আল্লাহর অসীম কুদরত ও ক্ষমতার সীমাহীন ব্যাপ্তির কথা কল্পনা করিলাম তখন আমার মনে হইতেছিল যেন, সিংহাসনে একটি মাটির পুতুল বসিয়া আছে। (তাবাকাতে শাফেইয়া ৫খঃ)

নিকট অতীতে হিন্দুস্তানের সিংহ পুরুষ মাওলানা সৈয়দ হোসায়ন আহমদ মদনী (রহঃ)ও জালিমের সামনে হক কথা বলিবার নমুনা পেশ করিয়াছেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেনাবাহিনীতে কোন মুসলমান সৈনিকের চাকুরী গ্রহণ করা হারাম এই ফতোয়া জারি করিবার অপরাধে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হইয়াছিল। বৃটিশরাজের ইচ্ছা ছিল, যে কোন উপায়ে তাঁহার বিরুদ্ধে ফাঁসির হুকুম জারি করা। আদালতে মামলা শুরু হইল। মাওলানা মদনী (রহঃ) আদালতে তাঁহার জবানবন্দীতে পরিষ্কার ঘোষণা করিলেন যে, আমি মুসলমান এবং একজন আলিমে দ্বীন হিসাবে আমার কর্তব্য হইল মুসলমান জনগণকে শরীয়তের আহকাম জানাইয়া দেওয়া। মহারাণীর কোন আদেশ যদি আল্লাহর আদেশের বিরোধী হয় তবে আল্লাহর আদেশই আমি পালন করিব। মহারাণীর আদেশ নহে।

বলাবাহুল্য যে, জালিম শাসকের সামনে ওলামায়ে হকের সত্যভাষণের এই সিলসিলা কোন না কোনভাবে কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ অব্যাহত থাকিবে। এমন কি হাদীছ শরীফে আছে, শেষ যামানায় দাজ্জাল যখন একজন আলিমকে হত্যা করিয়া পুনরায় জীবিত করিবে এবং তাহাকে খোদা রূপে স্বীকার করিবার কথা বলিবে তখন ঐ আলিম নির্ভীক চিত্তে ঘোষণা করিবেন যে, এখন তো আমার আরও দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, তুমি মিথ্যাবাদী দাজ্জাল। কেননা হাদীছ শরীফে তোমার সম্পর্কে এইরূপই আমি পড়িয়াছি যে, মানুষকে হত্যা করিয়া পুনরায় তুমি তাহাকে জিন্দা করিবে।

হাদীছের শিক্ষা ঃ কুফর বা প্রকাশ্য শরীয়ত বিরোধী কাজ না হওয়া পর্যন্ত শাসকবর্গের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া যাইবে না। তবে কোন ভয়ভীতির কারণে সত্যভাষণ হইতে বিরতও থাকা চলিবে না।

১৯০। অসৎ কাজের নিষেধ বন্ধ হইলে ব্যাপক আযাব আসে

الرابع : عَنِ النُّعمانِ بْنِ بشيرٍ رضي الله عنهما عَنِ النبيِّ ﷺ قال: «مَثَلُ القائِمِ في حُدودِ الله، وَالوَاقِعِ فيها كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفينَةٍ، فَصارَ بَعْضُهُم أَعْلاها وَبَعْضُهُم أَسْفَلَها، وَكانَ الذين في أَسْفَلِها إذا اسْتَقَوا مِنَ الماءِ مَرُّوا على مَنْ فَوْقَهُم فَقالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنا في نَصِيبِنا خَرْقًا وَلم نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنا، فَإِنْ تَرَكُوهم وَمَا أَرادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلى أَيدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَميعًا» رواه البخاري(٢).

হযরত নোমান বিন বশীর (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী এবং সীমালংঘনকারীর উদাহরণ এই যে, একদল লোক লটারী করিয়া একটি (সামুদ্রিক) জাহাজে উঠিল, ফলে তাহাদের একদল জাহাজের উপরতলায় আর অপরদল নীচতলায় স্থান লাভ করিল। যাহারা নীচের তলায় ছিল তাহারা যখন পানি সংগ্রহ করিত তখন উপর তলার লোকদের পাশ দিয়া আসা যাওয়া করিত। (ইহাতে উপরতলার লোকেরা বিরক্তি বোধ করিত।) তখন নীচতলার লোকেরা বলিল, আমরা যদি আমাদের হিস্যায় একটি ফুটা করিয়া লই আর উপরের লোকদিগকে কষ্ট না দেই (তবে ভাল হয়)।

এখন যদি (উপরের) লোকেরা (নীচের) লোকদিগকে তাহাদের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেয় তবে সকলেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর যদি তাহাদের হাত ধরিয়া (এই আত্মঘাতী কাজ হইতে তাহাদিগকে) নিবৃত্ত করে তবে নিজেরাও রক্ষা পাইবে। আবার তাহাদিগকেও রক্ষা করিবে। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

এই হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি আশ্চর্য সুন্দর একটি উদাহরণের সাহায্যে মানব জাতির অস্তিত্বের জন্য সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের উদাহরণ দিয়াছেন। কারণ জাহাজকে যেমন সমুদ্রের তরঙ্গবিক্ষোভ ও ঝড়তুফান এবং বিপরিত স্রোতের মোকাবেলা করিয়া নিরাপদ বন্দরের উদ্দেশ্যে সফর করিতে হয় এবং প্রতিমুহূর্তে অতল সমুদ্রে তলাইয়া যাওয়ার বিপদ-ঝুঁকি সম্পর্কে সদাসতর্ক থাকিতে হয়, তেমনি আমাদের জীবন-তরীকেও সমাজ-সমুদ্রের শত প্রতিকূলতা এবং বিপরীত স্রোতের মোকাবেলা করিয়া চলিতে হয়। পক্ষান্তরে মুহূর্তের অসতর্কতায় জীবন-তরী গোমরাহির আবর্তে ডুবিয়া যাওয়ার আশংকা থাকে।

সমাজে যাহারা দ্বীনদাররূপে পরিচিত, যাহারা মোটামুটি দ্বীনের উপর চলিতে চেষ্টা করেন তাহারা সাধারণত নিজেদের দ্বীনদারির উপরই সন্তুষ্ট থাকেন। সমাজের মন্দাচার ও পাপাচার সম্পর্কে তাহারা এই ভাবিয়া নির্লিপ্ত থাকেন যে, তাহাদের পাপাচারের কুফল তাহারা ভোগ করিবে, আমাদের নেক আমলের সুফল আমরা ভোগ করিব। অথচ বাস্তব সত্য এই যে, সমাজে যখন পাপাচার ছড়াইয়া পড়ে এবং বাধাহীন অবস্থায় সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করে তখন মুষ্টিমেয় সৎ লোকেরাও বাঁচিতে পারে না। তাহারা না হোক, তাহাদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততি ধর্মহীনতার স্রোতে অবশ্যই ভাসিয়া যায়। আমাদের দেশের বহু বিখ্যাত দ্বীনী ও ইলমী পরিবার আছে যাহাদের অধঃস্তন পুরুষ আজ ধর্মহীন চিন্তাধারার ধারক-বাহক ও প্রচারক রূপে পরিচিত। কারণ সমাজ জীবনে একই নৌকার যাত্রী হইয়াও তাহারা নিজেদের ধর্মকর্মেই তুষ্ট ছিলেন, সহযাত্রীদিগকে বরবাদির পথ হইতে বিরত রাখার কোন চেষ্টাই তাহারা করেন নাই। আলোচ্য উদাহরণে এ সম্পর্কেই উম্মতকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করিয়াছেন।

উক্ত উদাহরণে এদিকেও ইংগিত রহিয়াছে যে, মানুষকে মন্দকাজ হইতে ফিরাইতে হইলে সৎ লোকদিগকে কিছু না কিছু ক্ষতির, কষ্টের এবং উপদ্রবের সম্মুখীন হইতে হয়, তবে বৃহৎ কল্যাণ অর্জনের এবং সামগ্রিক অকল্যাণ দমনের উদ্দেশ্যে অম্লান বদনে উহা বরদাশত করাই

দ্বীনের তাকাযা। যেমন জাহাজের নীচের তলার যাত্রীদের কারণে উপর তলার যাত্রীদের যে কষ্ট হইতেছিল তাহা বরদাশত করিয়া লওয়াই তাহাদের কর্তব্য ছিল।

হাদীসের আরেকটি ইংগিত এই যে, অনেক সময় মানুষ না বুঝিয়া ভালো নিয়তেও মন্দ কাজে লিপ্ত হইয়া পড়ে, যেমন নীচের তলার যাত্রীরা উপর তলার যাত্রীদিগকে কষ্ট না দিবার নিয়তে নীচের তলায় ফুটা করিবার মতলব করিয়াছিল। তাহাদের বুদ্ধিতে ইহা ধরা পড়ে নাই যে, এই কাজে পুরা জাহাজের ধ্বংস অনিবার্য। এইরূপ ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হইল— উদ্দেশ্যের সাধুতা ও সততার বিষয়টি বিবেচনায় রাখিয়া কোমলতা ও হামদর্দির সাথে তাহাদিগকে সুপথে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করা। পক্ষান্তরে যাহাদের স্বভাবই মন্দ তাহাদের কথা ভিন্ন।

(লটারী করিয়া) এই হাদীছে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে লটারী করার বৈধতা প্রমাণ হয়। কোরআন শরীফের দুটি স্থানে এবং হাদীছ শরীফের ছয়টি স্থানে লটারী করার কথা আসিয়াছে। আল্লামা ইবনে রজব (রহঃ) তাহার القواعد الفقهيه কিতাবে লটারীর বৈধতা-অবৈধতা সম্পর্কে একটি ফিকহী মূলনীতি উল্লেখ করিয়াছেন।

হাদীছের শিক্ষা ঃ

সৎকাজে ব্রতী লোকদের কর্তব্য হইল অসৎকাজে লিপ্ত লোকদিগকে অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করা, ইহাতে উভয়েরই কল্যাণ, অন্যথায় উভয়েরই অকল্যাণ।

(১৯১) **ধর্মহীন শাসকের অধীনে করণীয় ঃ**

الخامس : عَنْ أُمِّ المؤمنين أُمِّ سَلَمَةَ هِنْدٍ بِنْتِ أَبي أُمَيَّةَ حُذَيْفَةَ رضي اللهُ عنها، عَنِ النبيِّ ﷺ أَنَّه قال: «إِنَّه يُسْتَعْمَلُ عليكم أُمَراءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِىءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلٰكِن مَنْ رَضِيَ وَتابَعَ» قالوا: يا رسولَ اللهِ ألا نُقاتِلهم؟ قال: «لا، مَا أَقامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ» رواه مسلم

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, (ভবিষ্যতে) তোমাদের উপর কতিপয় শাসক নিযুক্ত হইবে, আর তোমরা তাহাদের (কিছু) সৎকর্ম এবং (কিছু) অসৎকর্ম দেখিতে পাইবে। সুতরাং (অসৎকর্মের ক্ষেত্রে) যে ব্যক্তি ঘৃণা পোষণ করিবে সে (গোনাহ হইতে) দায়মুক্ত থাকিবে। আর যে ব্যক্তি প্রতিবাদ করিবে সে (আখেরাতের জিজ্ঞাসাবাদ হইতে) নিরাপদ থাকিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি (আচরণে বা উচ্চারণে) সম্মতি প্রকাশ করিল সে (ঐ অসৎ কাজে তাহাদের) অনুগমন করিল। ছাহাবা কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিব না ? তিনি বলিলেন, না, যতক্ষণ তাহারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করিবে (ততক্ষণ তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা যাইবে না)। —মুসলিম

ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি হাতে কিংবা মুখে প্রতিবাদ করিতে অক্ষম হইয়া শুধু অন্তরে ঘৃণা পোষণ করিল সে গোনাহ হইতে দায়মুক্ত হইয়া গেল এবং (শরীয়তের পক্ষ হইতে তাহার উপর অর্পিত) দায়িত্ব সে আদায় করিল। তদ্রূপ যে ব্যক্তি সাধ্যমত (হাতে বা মুখে) প্রতিবাদ জানাইল সেও এই নাফরমানি কাজের দায়দায়িত্ব হইতে নিরাপদ থাকিল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাহাদের অন্যায় কাজে সন্তুষ্ট থাকিল এবং তাহাদের অনুগমন করিল সেই হইল গোনাহগার।

ফায়দা ঃ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন তন্মধ্যে ইহা একটি। বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার সুস্পষ্ট একটি মু'জিযা। কেননা পরবর্তীকালে ইহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

(নিযুক্ত করা হইবে) অর্থাৎ খলীফা বা বাদশাহ বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রশাসক নিযুক্ত করিবেন।

(নামায কায়েম করে) নামায হইল ইসলামের প্রধান বিষয় এবং কুফর ও ইসলামের মাঝে পার্থক্যকারী আমল। যতক্ষণ তাহারা নামায কায়েম করিবে ততক্ষণ তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে নিষেধ করিবার কারণ হইল ব্যাপক ফেতনা মাথাচাড়া দিবার এবং মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট হইবার আশংকা। কেননা ইহার ক্ষতি তাহাদের অপকর্মসমূহ বরদাশত করিয়া লইবার ক্ষতির চাইতে ভয়াবহ। সুতরাং اهون البليتين (বা অপেক্ষাকৃত লঘু বিপদ) হিসাবে আল্লাহর পক্ষ হইতে ফায়সালা আসিবার পূর্ব পর্যন্ত তাহাদের অন্যায় বরদাশত করিয়াই যাইতে হইবে।

যাহারা নিজেরা নামায পড়ে না তবে সাধারণ মানুষকে নামায পড়িতে বাধাও দেয় না সম্ভবতঃ তাহাদের ক্ষেত্রে একই হুকুম হইবে।

হাদীছের শিক্ষা ঃ শাসকবর্গের অন্যায় কাজ সমর্থন করা জায়েয নহে। বরং সামর্থ্য থাকিলে উহার প্রতিবাদ করিতে হইবে। কিংবা অন্তত উহার প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতে হইতে। কিন্তু নামায (তথা শরীয়তি আহকাম) আদায়ে বাধা না দিলে তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যাইবে না।

১৯২। পাপের বৃদ্ধি ব্যাপক আযাবের কারণ

السادس: عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِين أُمِّ الْحَكَمِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها أَنَّ النبيَّ ﷺ دَخَلَ عليها فَزِعًا يقول: «لا اله الا الله، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليومُ مِنْ رَدْمِ ياجوجَ وَمَاْجُوجَ مِثْلُ هذه» وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الابهامِ وَالتي تَلِيها. فَقلتُ: يا رسولَ اللهِ أَنَهْلَكُ وفينا الصالحون؟ قال: «نَعم إذا كَثُرَ الخُبْثُ» متفق عليه

উম্মুল মুমিনীন উম্মুল হাকাম যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার 'ভয়ার্ত' অবস্থায় তাঁহার হুজরায় এই বলিতে বলিতে প্রবেশ করিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আরবের সর্বনাশ হউক ঐ অনিষ্টের কারণে

যাহা আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আজ ইয়াজুজ মাজুজের বন্দী প্রাচীর এই পরিমাণ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। (ইহা বলিয়া) তিনি আপন বৃদ্ধাংগুলি ও তর্জনী দ্বারা বৃত্ত রচনা করিলেন। (হযরত যায়নাব বলেন,) আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মাঝে নেককার লোকেরা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কি আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, যখন অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাইবে'। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবার উদ্দেশ্য হইল পরবর্তী বিষয়টি সম্পর্কে আশ্চর্য প্রকাশ করা এবং উহার গুরুতরতা বুঝানো। سبحان শব্দটিও একই উদ্দেশ্যে বলা হয়। যেমন, 'ইসরা'-এর ঘটনা প্রসংগে ইরশাদ হইয়াছে–[১]

سبحان الذى اسرى بعبده *

(সর্বনাশ হউক) ইহা মূলতঃ অভিশাপমূলক শব্দ হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্ষোভ বা দুঃখ প্রকাশক। বিশেষভাবে আরবদের কথা বলিবার কারণ এই যে, ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ তাহাদের দিকেই অভিমুখী হইবে।

(ইয়াজুজ মাজুজ) ইয়াজুজ মাজুজ সম্পর্কে বহু ইসরাঈলী কাহিনী ও ঐতিহাসিক গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় অতটুকুই যতটুকু কোরআন ও হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত যে সকল কাহিনী ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ভুলও হইতে পারে আবার নির্ভুলও হইতে পারে। তাহাতে কোরআন ও হাদীছের বক্তব্যের উপর কোন প্রভাব পড়ে না।

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে কোরআন হাদীছের বর্ণনা হইতে এতটুকু নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, সাধারণ মানুষের মত তাহারাও মানব সম্প্রদায়ভুক্ত। অধিকাংশ হাদীছ বিশারদ ও ইতিহাস বিশারদগণ তাহাদিগকে ঈয়াফেস ইবনে নূহ-এর বংশধর সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাহারা উত্তরের পর্বতমালার পশ্চাতে বসবাস করিত। তাহারা ছিল ভীষণ বর্বর ও রক্তপিপাসু। দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথ পার হইয়া তাহারা পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে লুটতরাজ ও রক্তপাত ঘটাইত। তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ বাদশাহ যুলকারনাইনকে গিরিপথে একটি প্রাচীর তুলিয়া দিবার অনুরোধ জানাইয়াছিল। বাদশাহ যুলকারনাইন তাহাদের অনুরোধে উভয় পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথটি লৌহ প্রাচীর তুলিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

কোরআন শরীফের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, যুলকারনাইন একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহ তাঁহাকে বিশ্ব জয় করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দান করিয়াছিলেন। যুলকারনাইন বিশ্বজয়ে বাহির হইয়া পৃথিবীর শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। পশ্চিমের শেষ প্রান্তে। পূর্বের শেষ প্রান্তে এবং উত্তরে পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। এইখানে আসিয়াই তিনি ইয়াজুজ-মাজুজের জুলুম অত্যাচার এবং স্থানীয় লোকদের দুর্দশার কথা জানিতে পারেন এবং

১। ইসরা অর্থ মিরাজের রাত্রে মসজিদুল হারাম হইতে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈশ অভিযাত্রা। তথা হইতে শুরু হইয়াছিল তাহার উর্ধ্ব-জাগতিক মহা-অভিযাত্রা। ইহাকে বলা হয় মিরাজ।

স্থানীয় লোকদের অনুরোধে তিনি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথে প্রাচীর তুলিয়া দেন। ফলে ইয়াজুজ মাজুজের অত্যাচার হইতে মানুষ চিরদিনের জন্য রেহাই পায়। প্রাচীর তৈয়ারির কাজে ইট পাথরের পরিবর্তে লৌহখণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে কোরআনে বলা হইয়াছে–

فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا اٰتُوْنِىْ زُبَرَالْحَدِيْدِ حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا حَتّٰى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا قَالَ اٰتُوْنِىْ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا *

অতএব তোমরা আমাকে শ্রম দিয়া সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাহাদের মাঝে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিব। তোমরা আমাকে লৌহখন্ড আনিয়া দাও। এমন কি যখন দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হইয়া গেল তখন তিনি বলিলেন, তোমরা আগুনে ফুঁক দাও। এমন কি যখন ঐ লৌহখণ্ড তিনি আগুনে পরিণত করিলেন তখন বলিলেন, তোমরা আমাকে গলিত তামা আনিয়া দাও; আমি তাহা উহার উপর ঢালিয়া দিব।

কোরআন শরীফ যেহেতু ইতিহাসগ্রন্থ নহে; উপদেশগ্রন্থ, তাই উপদেশ গ্রহণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ঘটনাই তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণেই যুলকারনাইন ও ইয়াজুজ মাজুজের পরিচয় সম্পর্কে অতিরিক্ত আলোচনা কোরআনে করা হয় নাই। তবে ওলামায়ে কেরাম সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, তিনজন ইয়ামানী সম্রাটের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম এবং তিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সমসাময়িক ছিলেন। এমন কি ইবনুল কাছীর ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহিত একত্রে মক্কা শরীফে বাইতুল্লাহর তাওয়াফও করিয়াছেন এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাহাকে মক্কার উপকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন এবং দু'আ ও উপদেশ দান করিয়াছেন।

ছহীহ্ হাদীছ হইতে ইয়াজুজ মাজুজের সংখ্যা সম্পর্কে জানা যায় যে, তাহাদের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চাইতে অনেকগুণ বেশী হইবে। যেমন, ছহী বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনই জাহান্নামী; একজন শুধু জান্নাতী। ছাহাবায়ে কেরাম ইহা শুনিয়া ভীষণ চিন্তিত হইলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন, চিন্তা করিও না; জাহান্নামীরা তোমাদের মধ্য হইতে হাজারে একজন এবং ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায় হইতে নয়শত নিরানব্বই জন হইবে।

ইয়াজুজ মাজুজের আগমন সম্পর্কে মুসলিম শরীফের ছহী হাদীছে বলা হইয়াছে যে, কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)-এর হাতে দাজ্জালের নিধনের পর ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব হইবে। আল্লাহ পাক তাহাদের রাস্তা খুলিয়া দিবেন তখন তাহারা অগণিত সংখ্যায় একযোগে পাহাড় হইতে অতি দ্রুত গতিতে নামিয়া আসিবে এবং সীমাহীন বর্বরতায় পৃথিবীব্যাপী গোটা মানব সম্প্রদায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। হযরত ঈসা (আঃ) তখন দুনিয়াতে থাকিবেন। তিনি মুসলমানদের লইয়া তূর পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। কেহ কেহ দূর্গে ও নিরাপদ স্থানে গিয়া প্রাণ রক্ষা করিবে। অবশিষ্ট সকল মানুষ তাহাদের হাতে ধ্বংস হইবে এমন কি নদ-নদীর পানিও তাহারা নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিবে।

অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর দু'আয় পংগপালের মত অগণিত সংখ্যার এই সম্প্রদায় মহামারীর মাধ্যমে মারা যাইবে এবং তাহাদের মৃতদেহের কারণে পৃথিবীর আধাহাত জায়গাও

খালি থাকিবে না। আর দুর্গন্ধের কারণে পৃথিবীতে বাস করা অসম্ভব হইয়া যাইবে। তখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর দু'আয় ঝাঁকে ঝাঁকে বিরাট পাখী আসিয়া তাহাদের মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া যাইবে। অতঃপর সমস্ত পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষিত হইবে। ফলে সমগ্র ভুপৃষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

যুলকারনাইনের প্রাচীর ও ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে হাদীছ ও কোরআনে এই পর্যন্তই জানা যায়। সুতরাং এইগুলি বিশ্বাস করা জরুরী এবং অস্বীকার করা কুফুরী। পক্ষান্তরে উক্ত প্রাচীরের স্থান নির্ধারণসংক্রান্ত ভৌগলিক আলোচনার উপর ইসলামের কোন আকীদা নির্ভরশীল নহে। তবে অমুসলিম লেখকদের জওয়াব দিবার উদ্দেশ্যে ওলামায়ে কেরাম এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

আল্লামা ইবনে খালদুন তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থের মুকাদ্দামায় লিখিয়াছেন–

সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে পশ্চিম দিকে তুর্কীদের কাজ্জাক ও চর্কস গোত্রসমূহ বাস করে। পূর্বদিকে ইয়াজুজ-মাজুজের বসতি বিদ্যমান। উভয় বসতির মধ্যস্থলে ককেসাস পর্বতমালা অবস্থিত। এই পর্বতমালা চতুর্থ ভূখন্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত ভূমধ্য সাগর হইতে শুরু হইয়া এই ভূখণ্ডেরই শেষ উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। অতঃপর ভুমধ্য সাগর হইতে পৃথক হইয়া উত্তর পশ্চিম দিকে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং পঞ্চম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ করিয়াছে। এখান হইতে পুনরায় তাহা প্রথম দিকে মোড় লইয়া সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ করিয়াছে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই পর্বতমালার মাঝখানে সিকন্দরী প্রাচীর (যুলকারনাইনের প্রাচীর) অবস্থিত, যাহার উল্লেখ কোরআন শরীফে আসিয়াছে।

আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ্ সিকান্দরী প্রাচীর পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁহার প্রতিনিধি রূপে সালামকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া প্রাচীরের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলেন। (ইবনে খালদুনের মুকাদ্দামা পৃঃ ৭৯)।

সালামের বিবরণে দেখা যায় যে, উক্ত প্রাচীর লৌহনির্মিত এবং তাহাতে বড় বড় তালাবদ্ধ দরওয়াজাও আছে। একটি দরওয়াজা উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই প্রাচীর পরিদর্শন করিয়া যে ফিরিয়া আসিতে চায় গাইড তাহাকে সমরখন্দের বিপরীত দিকের ঊষর প্রান্তরে আনিয়া ছাড়িয়া দেয়। (তাফসীরে কবীর ৫ম খণ্ড ৫১ পৃঃ)

মাওলানা হিফযুর রহমান সিহারবী (রহঃ) বলেন, ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংসলীলা বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। ককেশিয়ার পাদদেশীয় জনবসতি যেমন তাহাদের জুলুম নির্যাতনের শিকার ছিল তেমনি তিব্বত ও চীনের জনসাধারণও ছিল দিশাহারা। ইহাদের অনাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে একাধিক প্রাচীর নির্মাণ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে চীনের মহাপ্রাচীর হইল সর্ববৃহৎ। দ্বিতীয় প্রাচীরের অবস্থান হইল মধ্য এশিয়ার বুখারা ও তিরমিযের নিকটে। এই প্রাচীর বিখ্যাত মোগল সম্রাট তৈমুরের আমলে বিদ্যমান ছিল।

তৃতীয় প্রাচীরটি রাশিয়ার দাগিস্তান এলাকায় অবস্থিত। চতুর্থ প্রাচীরটি ককেশিয়ার উচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। সেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে দারিয়ান নামে একটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ রহিয়াছে। ইহারই নিকটে আরও পশ্চিমদিকে একটি প্রাচীর রহিয়াছে।

চীনের মহাপ্রাচীর ছাড়া উল্লেখিত অন্য সকল প্রাচীর উত্তর দিকে অবস্থিত। আর কোরআনের ইংগিত দ্বারা বোঝা যায় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীর উত্তরে অবস্থিত। সুতরাং চীনের মহাপ্রাচীর প্রথমেই বাদ গেল। কেননা উহা উত্তরে নহে, দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) সহ অনেকের মতে ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীরই যুলকারনাইনের প্রাচীর।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন আসে যে, যুলকারনাইনের প্রাচীর এখনও বিদ্যমান আছে কি না। ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিশেষজ্ঞরা অবশ্য ইহার অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ)-এর সুচিন্তিত জওয়াব এই যে, ইউরোপীয়দের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নহে যে, তাহরা সমগ্র ভূপৃষ্ঠ তন্নতন্ন করিয়াও কোথাও এই প্রাচীরের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পায় নাই। কেননা তাহারাই বলিয়া থাকে যে, প্রযুক্তির এত উন্নতি এবং অনুসন্ধানমূলক সফরের এত ব্যাপকতা সত্ত্বেও বহু অরণ্য, সমুদ্র ও দ্বীপ এখনও তাহাদের অজানা রহিয়া গিয়াছে। ইহাছাড়া এমন হওয়াও তো বিচিত্র নহে যে, উক্ত প্রাচীর বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পাহাড়সমূহের পতন ও বিভিন্ন ভৌগলিক পরিবর্তনের কারণে উহা একটি পাহাড়ের আকার ধারণ করিয়া ফেলিয়াছে। আরও কত বিচিত্র কারণ থাকিতে পারে। এই তো কয়েক বৎসর পূর্বে সমূদ্রের প্রায় ১৯ হাজার ফুট নীচে গোটা শহর আবিষ্কৃত হইল। ধারণা করা যাইতেছে যে, প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয়ের ফলে এই শহর সমুদ্রগর্ভে চলিয়া গিয়াছে। হিমালয়ের তুষার এলাকায় পাওয়া যাইতেছে অদ্ভুত সমস্ত পদচিহ্ন। সুতরাং আল্লাহর কুদরতে ইয়াজুজ-মাজুজ-এর অবস্থান এবং প্রাচীরের সন্ধান মানুষের অজ্ঞাত থাকা কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে।

আর কোরআনে পরিষ্কার আছে যে, প্রাচীর নির্মাণ শেষে যুল কারনাইন বলিয়াছেন–

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّاءَ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا *

তিনি বলিলেন, ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। আর যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত সময় আসিবে তখন তিনি ইহাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবেন। আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি চিরসত্য।

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যহ যুলকারনাইনের প্রাচীর খুঁড়িতে থাকে। খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাহারা লৌহ প্রাচীরের প্রান্তসীমার এতটা কাছাকাছি চলিয়া আসে যে, অপর পার্শ্বের আলো দেখা যাইতে থাকে। কিন্তু তাহারা বাকী কাজ আগামীকালের জন্য রাখিয়া চলিয়া যায়। এইদিকে আল্লাহর কুদরতে প্রাচীরটি আগের অবস্থায় ফিরিয়া আসে। পরের দিন ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। এই ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে যতদিন ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধ রাখা আল্লাহর ইচ্ছা রহিয়াছে। যেইদিন আল্লাহ তাহাদিগকে মুক্ত করিবার ইচ্ছা করিবেন সেইদিন কাজ শেষে তাহারা বলিবে, ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল আমরা বাকী অংশ খুঁড়িয়া অপর পার্শ্বে চলিয়া যাইব। ইনশাআল্লাহ বলিবার কারণে পরের দিন তাহারা প্রাচীরকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইবে যেই অবস্থায় আগের দিন সন্ধ্যায় রাখিয়া গিয়াছিল। তখন বাকী অংশটুকু তাহারা খুঁড়িয়া ফেলিবে এবং প্রাচীর ভেদ করিয়া অপরপারে চলিয়া আসিবে।

এই হাদীছের ভিত্তিতে আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, ইয়াজুজ-মাজুজের কিছু অংশ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। নতুবা তাহারা ইনশাআল্লাহ কেন বলিবে? তবে এমনও হইতে পারে যে, বিশ্বাস ছাড়াই আল্লাহ পাক তাহাদের মুখ হইতে এই বাক্যটি উচ্চারণ করাইবেন, যাহাতে পরবর্তী দিন তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

তবে যেহেতু তাহাদের জন্য জাহান্নামের আযাবের কথা বলা হইয়াছে সেহেতু ইহা প্রমাণিত হয় যে, নবী রাসূলগণের দাওয়াত তাহাদের নিকটও পৌঁছিয়াছে। কেননা কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী–

و ما كنا معذبين حتى نبعث رسو لا *

আমি রাসূল প্রেরণ না করিয়া (কোন কাওমকে) আযাব দেই না।

সুতরাং ইহা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলের দাওয়াত লাভ করা সত্ত্বেও তাহারা কুফুরের উপর অবিচল রহিয়াছে। কিছু সংখ্যক লোক হয়ত বা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী আছে। কিন্তু রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া ঈমান গ্রহণযোগ্য নহে।

(এই পরিমাণ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে) পরিমাণ বর্ণনা করিতে গিয়া রিওয়ায়াত বিভিন্ন রকম আসিয়াছে। আলোচ্য হাদীছমতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃদ্ধাংগুলি ও তর্জনী দ্বারা বৃত্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। তোহফাতুল কারী কিতাবে ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, তর্জনীকে বৃদ্ধাংগুলির গোড়ায় রাখিয়া উভয়কে এমনভাবে সংযুক্ত করিয়াছেন যাহাতে উভয়ের মাঝখানে খুবই সামান্য ফাঁক থাকে। গণনায় ইহাকে নব্বই-এর প্রতীক ধরা হয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত বুখারী শরীফের অন্য রিওয়ায়াতে এইরূপই আসিয়াছে–

فتح الله من ردم ياجوج و ماجوج مثل هذه و عقد بيده تسعين *

আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজ-এর প্রাচীর হইতে এই পরিমাণ খুলিয়া দিয়াছেন। আর তিনি হাত (এর আংগুল) দ্বারা নব্বই-এর আকৃতি বানাইলেন।

পক্ষান্তরে মুসলিম শরীফের বর্ণনায় সুফয়ান ছাওরী তাঁহার হাত দ্বারা দশ এর আকৃতি বানাইয়া দেখাইলেন। সুতরাং মুসলিম শরীফের এই বর্ণনা, কিতাবে উল্লেখিত হাদীছের বর্ণনা এবং বুখারী শরীফের অপর বর্ণনা হইতে ভিন্ন হইল। কেননা নব্বই-এর আকৃতি দশ-এর আকৃতি হইতে সংকীর্ণ। আল্লামা নববী (রহঃ) কাযী ইয়াযের বরাত দিয়া বলেন যে, সম্ভবতঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনাটি পূর্ববর্তী। তখন খোলার পরিমাণ কম ছিল। তাই নব্বই-এর আকৃতি করিয়া দেখানো হইয়াছে। পক্ষান্তরে পরবর্তীতে ফাটল বৃদ্ধি পাওয়ায় দশ-এর আকৃতি করিয়া দেখানো হইয়াছে।

কাযী ইয়ায বলেন, কিংবা দুই বর্ণনার মাঝে এইভাবেও সমন্বয় হইতে পারে যে, এখানে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্দেশ্য নহে বরং সামান্য পরিমাণ বুঝানো উদ্দেশ্য। তাহাছাড়া ফাটল সৃষ্টি হওয়া প্রকৃত অর্থেও হইতে পারে; আবার প্রাচীরটি দুর্বল হইয়া যাইবার রূপক অর্থেও হইতে পারে।

ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন যেহেতু মানব সম্প্রদায়ের জন্য বিপর্যয়কর সেহেতু তাহাদের প্রাচীরে ফাটল সৃষ্টি হওয়াকেই ধ্বংসের সূচনা বলা হইয়াছে। আরবদিগকে বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, ইয়াজুজী ফিতনার সিংহভাগ তাহাদের উপর দিয়াই যাইবে।

(যখন অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাইবে) হাদীছ শরীফে خبث শব্দটি আসিয়াছে। অধিকাংশ আলিমের মতে ইহার অর্থ অধর্ম ও পাপাচার। কাহারও কাহারও মতে ইহার অর্থ যিনা ও ব্যভিচার। অন্যমতে এইখানে অবৈধ সন্তানের আধিক্য বুঝানো হইয়াছে। যেমন, ইতিমধ্যেই ইউরোপ-আমেরিকায় যিনা ও ব্যভিচারের মাত্রা এমনই পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, ইহাকে এখন আর সামাজিক দোষ হিসাবেই দেখা হয় না। অপরদিকে পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, তাহাদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সন্তানই জারয। অভিশপ্ত পাশ্চাত্য সমাজের সংস্পর্শের কারণে মুসলিম বিশ্বেও এই সর্বনাশা সামাজিক ব্যাধি মহামারী আকারে ছড়াইয়া পড়িতেছে। যেন নববী যবানে উচ্চারিত আমাদের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার যাবতীয় আয়োজন আমাদের আমল দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদিগকে আপন কুদরতে হিফাযত করুন। আমীন।

হাদীছের শিক্ষা ঃ আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, শব্দটি দ্বারা সাধারণ অন্যায় ও নাফরমানিই উদ্দেশ্য মনে হয়। যাহাই হউক, হাদীছের শিক্ষা এই যে, নেককারদের সংখ্যা যতই অধিক হউক পাপাচারের আধিক্যের কারণে ব্যাপক ধ্বংস নামিয়া আসিবে। সুতরাং নেককারদের কর্তব্য হইল নিজেদের নেক আমলের উপর সন্তুষ্ট না থাকিয়া সমাজের সকলকে নেক ও হকের পথে দাওয়াত দেওয়া এবং সমাজ হইতে যাবতীয় অন্যায় দূর করিবার জন্য শরীয়তসম্মত সর্বাত্মক চেষ্টা গ্রহণ করা। অন্যথায় পাপাচার ও নাফরমানির আম আযাব হইতে তাহারাও রেহাই পাইবে না।

১৯৩। পথের হক কি কি?

السابع : عَنْ ابي سَعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه عَنِ النبيِّ ﷺ قال: «إيَّاكُمْ وَالجُلوسَ في الطُّرُقَاتِ» فقالوا: يا رسولَ اللهِ مَالَنا مِنْ مَجالِسِنا بُدٌّ؛ نَتَحَدَّثُ فيها! فقالَ رسولَ اللهِ ﷺ: «فَاذا اَبَيْتُمْ اِلاَّ المَجْلِسَ فَاَعْطُوا الطريقَ حَقَّه» قالوا: وما حقُّ الطريقِ يا رسولَ اللهِ ؟ قال: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الاَذىٰ، وَرَدُّ السلامِ ، وَالْاَمْرُ بالْمعروفِ، والنهيُ عَنِ المُنْكَرِ» متفق عليه .

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা রাস্তার উপর বসা হইতে বিরত থাক। ছাহাবা কেরাম আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (রাস্তায়) বসা ছাড়া তো আমাদের উপায় নাই। (কেননা) তথায় (বসিয়া) আমরা (বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে) আলোচনা করি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, একান্তই যদি বসিতে চাহ তবে রাস্তার হক আদায় করিও। তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাস্তার হক কি? তিনি বলিলেন, (রাস্তার হক হইল) দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বিষয় হইতে বিরত থাকা, সালামের জওয়াব দেওয়া এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(রাস্তার উপর বসা) এই নিষেধ মাকরূহে তানযীহী বা অনুত্তমতা জ্ঞাপক। এই নিষেধের উদ্দেশ্য হইল, মানুষ যেন পথের হক আদায় করিবার ব্যাপারে অসাবধান না হয়। দ্বিতীয়তঃ রাস্তায় বসিবার যে হুকুম হাটে বাজারে, দোকানপাটে এবং রাস্তার পার্শ্ববর্তী খোলা জানালার সামনে বসিবারও সেই হুকুম।

(বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করি) আলোচনা দ্বারা দ্বীনী বা দুনিয়াবী কল্যাণমূলক আলোচনা উদ্দেশ্য। কেননা ছাহাবা কেরামের মজলিসসমূহ নিষ্প্রয়োজনীয় মোবাহ আলোচনা হইতেও মুক্ত থাকিত। অর্থাৎ যে সমস্ত আলোচনা না জায়েয নহে কিন্তু প্রয়োজনীয়ও নহে সেইগুলিও তাঁহারা পরিহার করিয়া চলিতেন। সুতরাং চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, পথে ঘাটে বসিয়া আমাদের হাসিতামাশা ও গল্প গুজবের কি হুকুম হইতে পারে?

(পথের হক সমূহ কি কি) যাহা পথে বসা অবস্থায় আদায় করা আমাদের উপর ওয়াজিব?

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে সংক্ষেপে মূল কথাটুকু বলিলেন, যাহাতে ছাহাবা কেরামের অন্তরে জানিবার কৌতুহল সৃষ্টি হয় এবং তাঁহারা প্রশ্ন করিয়া বিশদ বিবরণ জানিয়া লন। ইহাতে উপদেশ অন্তরে অধিক রেখাপাত করে এবং স্থায়ী হয়। উপদেশদানের ইহাই উত্তম পন্থা। ছাহাবা কেরামকে উপদেশদানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণভাবে এই তরীকাই অবলম্বন করিতেন। অর্থাৎ প্রথমে ছাহাবা কেরামের মাঝে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিতেন। অতঃপর বক্তব্য পেশ করিতেন।

(দৃষ্টি অবনত রাখা) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীছে পথের চারিটি হকের কথা বলা হইয়াছে, যাহা আমল করিলে পূরা সমাজ আদর্শ সমাজে পরিণত হইতে পারে। প্রথম হক হইল দৃষ্টি অবনত রাখা। ইহা দ্বারা মানুষ পথে চলাচলকারী পরস্ত্রী এবং অন্যান্য হারাম জিনিস দেখিবার ফিতনা হইতে নিরাপদ থাকিবে। ফলে শয়তান তাহার উপর প্রভাব বিস্তারের কোন সুযোগ পাইবে না। কেননা মানুষের অন্তরে শয়তানের প্রবেশের প্রধান পথ হইল তাহার দৃষ্টি।

দ্বিতীয় হক হইল কষ্টদায়ক বিষয় হইতে বিরত থাকা। যেমন পথ চলাচলকারী মানুষের গীবত ও দোষচর্চা করা, তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করা এবং তাহাদের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। এই সমস্ত কাজ হইতে বিরত থাকা দ্বারা মুসলমানকে কষ্টদানের গোনাহ হইতে বাঁচা যায়। ফলে হিংসা বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য সৃষ্টির সুযোগ হইতে শয়তান বঞ্চিত হয়।

তৃতীয় হক হইল সালামের জওয়াব দেওয়া। ইহা দ্বারা ইকরামুল মুসলিম-এর বিরাট ছাওয়াব হাছিল হইবে। ফলে পরস্পর মুহব্বত পয়দা হইবে।

চতুর্থ হক হইল সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ। বস্তুতঃ ইহা ব্যাপক বিষয়। ইহা দ্বারা শরীয়তের যাবতীয় আদেশ নিষেধ জিন্দা হইবে। মুসলমানদের বাহিরের জীবনই সাধারণতঃ অমুসলমানদের চোখে পড়িয়া থাকে। সুতরাং পথের হকসমূহ ঠিক মত আদায় হইলে তাহাদের উপরও ইহার প্রভাব পড়িবে এবং তাহাদের হিদায়াত লাভের পথ সহজ হইবে।

আল্লামা আলকামী (রহঃ) বলেন, আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় পথের আরও দুইটি হকের কথা বলা হইয়াছে। যথা– পথিককে পথ বলিয়া দেওয়া এবং হাঁচিদাতা আলহামদুলিল্লাহ বলিলে উহার জওয়াবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।

ছাঈদ বিন মানছূরের বর্ণনায় বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করিবার কথাও বলা হইয়াছে। মুসনাদে বাযযারে আছে– و اعينوا على الحمولة এবং বোঝা উঠাইতে সাহায্য কর।

তাবরানীতে আছে–

و اعينوا المظلوم و اذكروا الله كثيرا *

মযলুমকে সাহায্য কর এবং আল্লাহর যিকির অধিক পরিমাণে কর।

আবু তালহা (রাঃ)-এর হাদীছে বর্ণিত আছে যে, মানুষের সহিত উত্তম কথা বলাও পথের একটি হক।

ইমাম তিরমিযি (রহঃ)-এর বর্ণনায় আছে–

و افشوا السلام *

ছালামের অধিক প্রচলন ঘটাও।

কিতাবে বর্ণিত হাদীছে শুধু সালামের জওয়াব দিবার কথা বলা হইয়াছে। আর তিরমিযি শরীফের বর্ণনায় সালম দেওয়া এবং সালামের জওয়াব দেওয়া উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 'অধিক প্রচলন' কথাটা দ্বারা বোঝা যায় যে, পরিচিত অপরিচিত সকলকেই সালাম দেওয়া পথের হক। ইহাছাড়া হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে আছে–

على من عرفت و على من لم تعرف *

অর্থাৎ যাহাকে চিন এবং যাহাকে চিন না–উভয়কেই সালাম করিতে হইবে।

তাবরাণীর বর্ণনায় আছে–

و اهدوا الاغبياء *

এবং হাবাগোবা মানুষকে পথ দেখাইয়া দিও।

এই সকল হাদীছে পথের মোট চৌদ্দটি হক বর্ণিত হইয়াছে, আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) এইগুলিকে চারিপংক্তির এক কবিতায় একত্রিত করিয়াছেন। দেখুন–

جمعت آداب من رام الجلوس على الـ + الطريق من قول خير الخلق انسانا

যে ব্যক্তি রাস্তার উপর বসিতে চায় তাহার জন্য শ্রেষ্ঠ রাসূলের বাণী হইতে কতিপয় আদব আমি সংগ্রহ করিয়াছি।

افش السلام و احسن فى الكلام و شمـ + ت عاطسا و سلاما رد احسانا

১। সালামের প্রচলন কর। ২। উত্তম কথা বল। ৩। হাঁচিদাতার আলহামদুলিল্লাহর জওয়াবে ইয়ারহামকাল্লাহ বল। ৪। সালামের সুন্দর করিয়া উত্তর দাও।

في الحمل عاون و مظلوما ما اعن و اغث + لهفان هد سبيلا و اهد حيرانا

৫। বোঝা বহনে সহায়তা কর। ৬। মযলুমকে সাহায্য কর। ৭। বিপদগ্রস্তকে উদ্ধার কর। ৮। পথ দেখাইয়া দাও ৯। এবং দিশাহারা মানুষকে সুবুদ্ধি দাও।

بالعرف تروانه عن منكره و كف اذى + و غض طرفا و اكثر ذكر مولانا

১০। সৎকাজের আদেশ কর ১১। অসৎকাজে নিষেধ কর। ১২। কষ্টদায়ক বিষয় হইতে বিরত থাক। ১৩। দৃষ্টি অবনত রাখ। ১৪। এবং আমাদের মনিব আল্লাহ পাকের বেশী বেশী যিকির কর।

পুনশ্চ ঃ অনেকে চলাচলের পথে ময়লা ফেলিয়া রাখে। পানের পিচকি ফেলে। কলার খোসা ফেলে। যত্রতত্র গাড়ী পাকিং করে। ফুটপাথে দোকান সাজাইয়া বসে। কিংবা ফুপটাতের দোকান হইতে কেনাকাটা করে। এইগুলিও পথের কষ্টদায়ক বিষয়। এইগুলি হইতেও বিরত থাকা কর্তব্য।

তদ্রূপ অন্যদের ফেলিয়া রাখা কষ্টদায়ক জিনিস পথ হইতে সরাইয়া ফেলাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। হাদীছ শরীফে ইহাকে ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

সালাম দেওয়া সুন্নত। কিন্তু সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব। যদি সুনির্দিষ্টভাবে কোন একজনকে সালাম করা হয় তবে তাহাকেই জওয়াব দিতে হইবে। অপরকেহ জওয়াব দিলে তাহার উপর হইতে ওয়াজিব আদায় হইবে না। পক্ষান্তরে কোন জামা'আতকে সালাম করা হইলে জওয়াব দেওয়া ওয়াজিবে কিফায়া হইবে। অর্থাৎ কোন একজন জওয়াব দিলে সকলের ওয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু কেহই যদি জওয়াব না দেয় তবে সকলেই গোনাহগার হইবে।

মযলুমকে সাহায্য করা সামগ্রিকভাবে আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকারের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ফরযে কিফায়া এবং ঐ ব্যক্তির উপর ফরয যাহার মযলুমকে সাহায্য করিবার ক্ষমতা আছে এবং নিজের জান-মালের ক্ষতি হইবার আশংকা নাই।

১৯৪। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির প্রতি ছাহাবা কেরামের লক্ষ্য

الثامن: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رَأى خاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ في يَدِ رَجُلٍ ، فَنَزَعَه فَطَرَحَه وقال: «يَعْمِدُ أَحَدُكم الى جَمْرَةٍ مِنْ نارٍ فَيَجْعَلُها في يَدِه!» فقيل للرجلِ بعدَ ما ذَهَبَ رسولُ اللهِ ﷺ: خُذْ خاتَمَكَ؛ اِنْتَفِعْ به. قال: لا واللهِ لا آخذُه أبداً وقد طَرَحَه رسولُ اللهِ ﷺ. رواه مسلم

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক ছাহাবীর হাতে স্বর্ণের একটি আংটি দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি (তাহার হাত হইতে) উহা খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের কেহ কি ইচ্ছাকৃতভাবে আপন হাতে জ্বলন্ত অংগার রাখা পছন্দ করে?

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিয়া যাইবার পর লোকটিকে বলা হইল, তোমার আংটিটি তুমি উঠাইয়া লও এবং (বৈধ কাজে) উহা দ্বারা উপকৃত হও। উক্ত ছাহাবী বলিলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুঁড়িয়া ফেলিবার পর আমি কখনই উহা উঠাইব না। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(একবার এক ছাহাবীর হাতে) কোন সূত্র হইতে উক্ত ছাহাবীর নাম জানা যায় নাই। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি খুবই সাধারণ পর্যায়ের কেহ ছিলেন।

সুবহানাল্লাহ! চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় যে, সাধারণ হইতে সাধারণ ছাহাবীরও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি জযবায়ে মুহব্বত কি পরিমাণ ছিল!

(ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন) কেননা পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহার করা, তদ্রূপ রেশমী বস্ত্র পরিধান করা জায়েয নহে।

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রে পানাহার করা, চামচ, সুরমাদানি, আতরদানি, আগরদানি, দীপাধার ইত্যাদি যে কোন রূপে স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহার করা সর্বসম্মতভাবে নারী-পুরুষ সকলের জন্যই হারাম। কেননা হাদীছ শরীফে বলা হইয়াছে–

هى لهم فى الدنيا و لكم فى الاخرى *

এই সমস্ত স্বর্ণ-রৌপ্য কাফিরদের জন্য দুনিয়াতে আর তোমাদের জন্য আখিরাতে।

পক্ষান্তরে শুধু স্ত্রীলোকদের জন্য স্বামীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে অলংকার রূপে ব্যবহার করিবার অনুমতি রহিয়াছে। রেশমী বস্ত্রের ব্যাপারেও একই কথা। কেননা হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

ان هذين حرام على ذكور امتى حل لاناثها *

স্বর্ণ-রৌপ্য ও রেশমী-বস্ত্র এই দুইটি বস্তু আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং স্ত্রীলোকদের জন্য হালাল।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, পুরুষের স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা স্বাস্থ্যগত দিক হইতে ক্ষতিকর। বিশেষতঃ ইহা যৌন শক্তিকে দুর্বল করিয়া দেয়। সুতরাং যাহারা নিজেদিগকে উম্মতী দাবী করিয়াও স্বর্ণের আংটি বা চেইন ব্যবহার করিতেছে তাহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, নিজেদের অজান্তেই তাহারা কাফিরদের কাতারে শামিল হইয়া পড়িতেছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার ঘোষণা করিয়াছেন যে, দুনিয়াতে এইগুলি কাফিরদের জন্য আর আখিরাতে মুসলমানদের জন্য। অন্য হাদীছে আছে–

من تشبه بقوم فهو منهم *

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সহিত সাদৃশ্য রক্ষা করে সে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

আল্লাহ আমাদের সকলকে হিফাযত করুন। আমীন।

(জ্বলন্ত অংগার রাখা পছন্দ করে) কোরআন ও হাদীছে ব্যবহৃত এই ধরনের শব্দগুলিকে প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করাই উত্তম। অর্থাৎ আখিরাতে এই আংটি সত্য সত্যই জ্বলন্ত অংগারে পরিণত হইবে। তদ্রূপ যে সকল স্ত্রীলোক অলংকারের যাকাত আদায় করে না তাহাদের অলংকার সত্য সত্যই আগুন হইয়া তাহাদিগকে আযাব দিবে। যেমন হাদীছ শরীফে আসিয়াছে যে, দুই স্ত্রীলোককে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেন তোমরা তোমাদের অলংকারের যাকাত আদায় কর না। তোমরা কি চাও যে, কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে আগুনের বালা পরানো হউক!

তদ্রূপ যাহারা এতিমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তাহা আখিরাতে তাহাদের উদরে অগ্নিতে পরিণত হইবে– যেমন কোরআন শরীফে আসিয়াছে–

الذين ياكلون اموال اليتمى ظلما انما ياكلون فى بطونهم نارا *

যাহারা অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভক্ষণ করে তাহারা নিজেদের উদরে শুধু অগ্নি ভক্ষণ করিতেছে।

অবশ্য কেহ কেহ ইহাকে রূপক অর্থেও গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ এইগুলি তাহাদের জন্য জাহান্নামের আগুনে আযাব ভোগ করিবার কারণ হইবে। যেই অর্থই গ্রহণ করা হউক জাহান্নামের আগুনের শাস্তিভোগ করা তো অনিবার্য হইয়া গেল।

(এবং উহা দ্বারা উপকৃত হও) যেমন তোমার স্ত্রীকে ব্যবহার করিতে দাও কিংবা কাহাকেও দান কর কিংবা বিক্রয় করিয়া উহার অর্থ নিজের কাজে লাগাও ইত্যাদি। তাহাদের পক্ষ হইতে তাহাকে এই পরামর্শদানের কারণ এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল উহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করা। ফেলিয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। যেমন অন্য এক হাদীছে আছে–

عن سالم عن رجل من قومه من اشجع قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم و على خاتم من ذهب فاخذ جريدة فضرب بها في كفى فقال: اطرح هذا فطرحته ثم دخلت عليه بعد ما القيته فقال لى: ما فعل الخاتم قلت طرحته قال لم آمرك ان تطرحه انما امرتك ان تنتفع به و لا تطرحه * (رواه ابو بكر بن ابى شيبه و ابن حنبل)

হযরত সালিম (রহঃ) তাঁহার স্বগোত্রীয় জনৈক আশজায়ী ছাহাবী হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইলাম। আমার হাতে একটি স্বর্ণের আংটি ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুরের ডাল লইলেন এবং উহা দ্বারা হাতের তালুতে আঘাত করিয়া বলিলেন, ইহা ফেলিয়া দাও। তখন আমি উহা ফেলিয়া দিলাম। উহা ফেলিয়া দিবার পরে এক সময় আমি তাঁহার খিদমতে হাযির হইলা।ম তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আংটি কি হইল? আমি বলিলাম, উহা ফেলিয়া দিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমি তো তোমাকে ফেলিয়া দিতে আদেশ করি নাই। ফেলিয়া না দিয়া উহা দ্বারা (অন্যভাবে) উপকৃত হইতে বলিয়াছিলাম।

মোটকথা, আংটিটি তুলিয়া লওয়া এবং বৈধভাবে উহা দ্বারা উপকৃত হওয়া তাহার জন্য জায়েয ছিল। কিন্তু পরম নবীভক্তি ও পরহেযগারির কারণে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের ফেলিয়া দেওয়া জিনিস তিনি আর গ্রহণ করেন নাই। বরং কোন অভাবী ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিবে, এই জন্য ছাদাকার নিয়তে তিনি উহা ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন।

(কখনই আমি উহা উঠাইব না) সুবহানাল্লাহ্! এমনই ছিল ছাহাবা কেরামের নবীপ্রেমের শান যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফেলিয়া দেওয়া জিনিস তুলিয়া লওয়া তিনি বরদাশত করিলেন না। অথচ উহার অবকাশ ছিল। ছাহাবা কেরাম তো জায়েয থাকা সত্ত্বেও উহার সুযোগ গ্রহণ করিলেন না। বরং নবীজীর ফেলিয়া দেওয়া জিনিস পড়িয়াই থাকিতে দিলেন। অথচ আমাদের অবস্থা তো এই যে, সুস্পষ্ট নিষেধবাণী শ্রবণ করিয়াও বিভিন্ন বাহানা খুঁজিতে থাকি যে, হয়ত ইহার উদ্দেশ্য এই। হয়ত ইহা হারাম নহে মাকরূহ মাত্র। অথচ নবীপ্রেমের লম্বা চওড়া দাবী করিবার ব্যাপারে আমাদের কোন কার্পণ্য নাই। মিলাদ মাহফিলে উৎসাহের কমতি নাই। কিন্তু বুকে হাত রাখিয়া বলুন দেখি–

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب و لا صورة *

এই হাদীছ শুনিবার পর আমরা কতজন কুকুর পালা কিংবা ঘরে ছবি রাখা বন্ধ করিয়াছি।

তদ্রূপ–

لا تتخذوا القبور مساجد انى انهاكم عن ذلك *

তোমরা কবরকে সিজদার স্থান বানাইও না আমি তোমাদিগকে ইহা হইতে নিষেধ করিতেছি।

এমন সুস্পষ্ট নিষেধবাণী শুনিবার পর আমরা কতজন মাজারপূজা এবং মাজারে বিভিন্ন শিরকী বিদ'আতী আমল বন্ধ করিয়াছি!

তদ্রূপ–

اعفوا اللحى و احفوا الشراب *

তোমরা দাড়ী লম্বা কর এবং মোচ খাট কর এই নির্দেশ শুনিবার পর কতজন আমরা দাড়ী রাখা শুরু করিয়াছি!

তদ্রূপ–

من تمسك بسنتى عند فسادى امتى فله اجر مئة شهيد *

আমার উম্মতের ফাসাদের সময় যে ব্যক্তি আমার সুন্নত আকড়াইয়া ধরিবে তাহার জন্য রহিয়াছে একশত শহীদের ছাওয়াব।

এই হাদীছ শুনিবার পর কতজন আমরা নবীজীর সুন্নত তালাশ করিয়া করিয়া উহার উপর আমল শুরু করিয়াছি।

সুতরাং আমল ছাড়া শুধু মৌখিক মুহব্বতের দাবীর কি মূল্য থাকিতে পারে?

অথচ সুন্নাতের ইত্তেবা করিবার উপর আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে কত সুসংবাদ আসিয়াছে! দেখুন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ *

আপনি বলুন যে, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসিয়া থাক তবে আমাকে অনুসরণ কর তখন আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন।

উপরোক্ত ঘটনার ন্যায় শত শত ঘটনা ছাহাবা কেরামের সীরাতে দেখা যায়। নমুনা স্বরূপ আরও দুইটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি–

এক সফরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ছাহাবীর দেহে জাফরানী চাদর দেখিয়া একটু বাঁকা চোখে তাকাইলেন, যাহাতে কিছুটা অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ পাইল। ছাহাবী সফর হইতে ফিরিয়া সোজা বাড়ীতে গিয়া উক্ত চাদর চুলায় দিয়া দিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার চাদর কি করিয়াছ? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহা আমি চুলায় ফেলিয়া দিয়াছি। তিনি বলিলেন, জ্বালাইতে গেলে কেন। স্ত্রীলোকদিগকে দিয়া দিলে না কেন?

একদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবা কেরামের এক জামা'আতের সহিত কোথাও যাইতেছিলেন। পথে একটি পাকা ভবন দেখিতে পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কাহার ঘর? ছাহাবা কেরাম আরয করিলেন, ইহা অমুক আনছারী ছাহাবীর ঘর। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কিছু না বলিয়া আগে চলিয়া গেলেন।

পরে একদিন ঐ ছাহাবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন না। কথাও বলিলেন না। ছাহাবী খুবই পেরেশান হইলেন এবং মজলিসে উপস্থিত অন্যান্য ছাহাবাকে তাঁহার প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার পাকা বাড়ী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহা কাহার বাড়ী? ইহাছাড়া আর কোন কারণ আমাদের জানা নাই। ছাহাবী ইহা শুনিবামাত্র ফিরিয়া গিয়া বাড়ী ভাংগিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহা জানাইলেন না।

কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তখন বাড়ীটি না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীর কি হইল? ছাহাবা কেরাম আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার অসন্তুষ্টির কথা জানিতে পারিয়া বাড়ীওয়ালা তাহার বাড়ী ভাংগিয়া ফেলিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,

যে কোন পাকাভবন মানুষের জন্য বিপদের কারণ তবে যাহা অতি প্রয়োজনে নির্মাণ করা হয়। (উহা বিপদের কারণ নহে।)

১৯৫। সকল ছাহাবী ন্যায়পরায়ণ

التاسع : عَنْ ابي سَعيدٍ الْحَسَنِ البصرِيِّ اَنَّ عائذَ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنه دَخَلَ على عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زيادٍ فقال : اَيْ بُنَيَّ، إني سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «إنَّ شَرَّ الرعاءِ الحُطَمَةُ» فَإيَّاكَ ان تكونَ منهم. فقال له : اِجْلِسْ فَاِنَّما انتَ مِنْ نُخالَةِ اَصْحابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فقال: وَهلْ كانَتْ لهم نُخالَةٌ، اِنَّما كانتِ النُّخالَةُ بعدَهم وفي غَيْرِهم! رواه

مسلم

হযরত হাসান বছরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত যে, হযরত 'আঈইয বিন ওমর (রাঃ) (জালিম প্রশাসক) ওবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ-এর নিকট (তাহাকে উপদেশদানের নিয়তে) গমন করিলেন এবং বলিলেন, হে প্রিয় বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, সে-ই নিকৃষ্ট রাখাল যে (পশুপালের প্রতি) নির্দয়। তুমি সতর্ক থাকিও যেন তাহাদের অন্তর্ভুক্ত না হও। ওবায়দুল্লাহ্ তাহাকে বলিয়া উঠিল, চুপচাপ বসিয়া থাকুন, আপনি তো মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবাগণের মাঝে আটায় ভুসির সমতুল্য (অর্থাৎ অতি তুচ্ছ ব্যক্তি) তিনি বলিলেন, ছাহাবা-জামা'আতের কেহ কি তুচ্ছ ভুসি হইতে পারেন? ভুসি তো দেখা দিয়াছে তাঁহাদের পরে অন্যদের মাঝে। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

بنى শব্দটি ابن এর পরিবর্তিত রূপ। ইহা স্নেহ প্রকাশক শব্দ। ইবনুন অর্থ পুত্র। ওবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদকে তিনি স্নেহবশতঃ বৎস বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন যাহাতে তাহার স্বভাব-ঔদ্ধত্য কিছুটা নমনীয় হয় এবং তাহার অন্তর উপদেশ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। বস্তুতঃ উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্র বিচারে উপযুক্ত কোমল সম্ভাষণ অতি জরুরী, যাহাতে শ্রোতা বক্তার আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়।

(তাহাদের অন্তর্ভুক্ত না হও) প্রকৃতপক্ষে একজন শাসক রাখালতুল্য। রাখালের দায়িত্ব হইল পশুপালের হিফাযত ও যত্ন-পরিচর্যা করা। পশুপালের জন্য সেই রাখালই সর্বোত্তম যাহার অন্তরে দয়ামায়া, দায়িত্বসচেতনতা ও বিচক্ষণতা রহিয়াছে। তদ্রূপ প্রজাসাধারণের জন্যও সেই শাসকই সর্বোত্তম যাহার মাঝে উপরোল্লিখিত গুণাবলী রহিয়াছে। পক্ষান্তরে নির্দয় নিষ্ঠুর রাখালের হাতে যেমন পশুপালের দুর্ভোগ ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নাই। তদ্রূপ নিষ্ঠুর ও নির্দয় স্বভাবের শাসকের হাতেও প্রজাসাধারণের দুর্ভোগ ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নাই। এইরূপ শাসকের প্রতি আল্লাহর রাসূল অভিসম্পাত করিয়াছন। সুতরাং প্রত্যেক শাসকের কর্তব্য হইল প্রজাসাধারণের প্রতি কোমল ও সদয় হওয়া। নচেৎ নিকৃষ্ট শাসক হিসাবে আখিরাতে তাহার হাশর হইবে।

তবে মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা শুধুমাত্র দেশ ও রাষ্ট্রপরিচালকের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে। বরং প্রত্যেকেই তাহার অধীনস্থদের শাসক রূপে গণ্য। যেমন হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته *

তোমাদের প্রত্যেকেই শাসক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তাহার 'শাসিত'দের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। সুতরাং আলোচ্য হাদীছের নিন্দাবাদ হইতে মুক্ত থাকিতে হইলে প্রত্যেকের কর্তব্য হইবে তাহার অধীনস্থদের প্রতি কোমল ও সদয় হওয়া। অবশ্য সংশোধনের নিয়তে, প্রয়োজনে কঠোর হওয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

(কেহ কি তুচ্ছ ভুসি হইতে পারেন) অর্থাৎ প্রত্যেক ছাহাবী পরবর্তীদের জন্য আদর্শ। ছাহাবা-পরবর্তী যুগে অবশ্য ভাল ও মন্দ দুই শ্রেণীর লোকই রহিয়াছে। সুতরাং নির্বিচারে তাহাদের সকলে আদর্শ ও অনুসরণীয় হইতে পারে না। কিন্তু ছাহাবা জামা'আত তেমন নহে।

তাঁহাদের সকলেই উত্তম আদর্শের অধিকারী এবং অনুসরণীয়। তাঁহাদের মাঝে মর্যাদাগত তারতম্য থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকের সততা, সত্যবাদিতা, ধার্মিকতা, ন্যায়পরায়ণতা ও অনুসরণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। কেননা তাঁহাদের প্রত্যেককে আল্লাহ্ পাক তাঁহার প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোহবত ও সান্নিধ্যের জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন। যেমন হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم *

আমার ছাহাবাগণ তারকাতুল্য, তোমরা তাহাদের যাহারই অনুসরণ করিবে হেদায়াতপ্রাপ্ত হইবে।

আল্লামা মোহাম্মদ বিন আল্লান (রহঃ) বলেন, হাদীছটির সনদগত দুর্বলতা স্বীকার করিয়া লইলেও এই ক্ষেত্রে তাহা আমলযোগ্য হওয়াতে কোন বাধা নাই।

সুতরাং সেই যুগের ফাসিক ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের ন্যায় বর্তমান কালেও যদি কেহ বিভিন্ন খোঁড়া যুক্তি তুলিয়া এবং ভেজাল ইতিহাসের উপর ভর করিয়া কোন ছাহাবীর চরিত্র হননে লিপ্ত হয় তবে তাহার ভ্রষ্টতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এমন লোকের সহিত বিবাদ বিতর্ক না বাড়াইয়া আমরা শুধু হযরত আইয বিন আমর (রাঃ)-এর ভাষায় তাহাকে বলিব–

و هل كانت لهم نخالة، انما كانت النخالة بعدهم و فى غيرهم *

তাহাদের কেহ কি তুচ্ছ ভুসি হইতে পারেন? ভুসি তো দেখা দিয়াছে তাহাদের পরে অন্যদের মাঝে।

হাদীছের শিক্ষা ঃ অধীনস্থদিগকে শাসনের ক্ষেত্রে সদয় ও কোমল মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে।

সকল ছাহাবা কেরামের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা পোষণ করিতে হইবে। কেননা তাঁহারা সকলেই মাগফিরাতও সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত

১৯৬। মন্দকাজে নিষেধ না করা দু'আ কবুল না হইবার কারণ

العاشر: عَنْ حُذيفةَ رضي الله عنه عَنِ النبيِّ ﷺ قال: «وَالذي نَفْسي بِيَدِهِ لَتَأمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عنِ المُنْكَرِ، اَوْلَيُوْشِكَنَّ اللهُ ان يبعثَ عليكم عِقابًا منه، ثم تَدْعُونه فلا يُستجابُ لكم» رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

হযরত হোযায়ফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ যাতের কসম যাঁহার কুদরতি কব্জায় আমার জান! হয় তোমরা সৎ কাজের আদেশ করিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করিবে কিংবা অচিরেই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাঁহার পক্ষ হইতে আযাব পাঠাইবেন। অতঃপর তোমরা (আযাব দূর করিবার জন্য) তাঁহার নিকট দু'আ করিবে কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল করা হইবে না।

ফায়দা ঃ

আল্লাহর রাসূল হিসাবে তাঁহার সকল কথাই সমান সত্য। সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁহার জন্য কোন কথা কসম করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু উম্মতের যেহেনে পরবর্তী বিষয়টির গুরুত্ব বদ্ধমূল করিবার জন্যই তিনি কসম করিয়া বলিয়াছেন। তদুপরি সাধারণ কসমের পরিবর্তে এইভাবে কসম করিয়াছেন– "ঐ যাতের কসম যাঁহার কুদরতি কব্জায় আমার জান!" বলাবাহুল্য যে, ইহাতে পরবর্তী বিষয়টির অপরিসীম গুরুত্বই শুধু প্রকাশ পাইতেছে।

(তোমাদের দু'আ কবুল করা হইবে না।) আলোচ্য হাদীছের এবং এই জাতীয় অন্যান্য হাদীছের প্রত্যক্ষ সম্বোধন-পাত্র তো হইলেন উপস্থিত উম্মত তথা ছাহাবায়ে কেরাম। তবে ছাহাবা কেরামের উত্তরসূরী হিসাবে পরবর্তী যুগের উম্মতও এই হাদীছের সম্বোধন-পাত্র। বরং তাহারাই এই হাদীছের আসল লক্ষ্য। কেননা ছাহাবা কেরামের যামানায় দ্বীনের কোন অংশেই কোন ত্রুটি ছিল না। গাফলতি ছিল না। সুতরাং এমন কঠোর হুঁশিয়ারিরও প্রয়োজন ছিল না। আমাদের কারণেই ছাহাবা কেরাম এমন কঠোর হুঁশিয়ারি ও সতর্কবাণী শুনিয়াছেন।

جزاهم الله عنا احسن الجزاء (আল্লাহ পাক আমাদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন)

যাহাই হউক, আলোচ্য হাদীছ হইতে বোঝা গেল যে, আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার তরক করিবার শাস্তি দুইটি। একটি জাগতিক অন্যটি আধ্যাত্মিক। জাগতিক শাস্তি এই যে, তাহাদিগকে বিভিন্ন বিপদ-দুর্যোগের সম্মুখীন করা হইবে। যেমন, তাহাদের উপর জালিম শাসক চাপাইয়া দেওয়া হইবে। তাহাদের উপর শত্রু জাতির আধিপত্য কায়েম করা হইবে। ব্যাপক রোগ-ব্যাধি কিংবা অর্থনৈতিক বিপর্যয় দ্বারা তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করা হইবে। (যতক্ষণ না তাহারা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধের অর্পিত দায়িত্ব পালনে পুনঃ উদ্যো[illegible] হয়।)

আধ্যাত্মিক শাস্তি এই যে, আল্লাহর সহিত তাহাদের সম্পর্ক অতি দুর্বল হইয়া যাইবে। ফলে যেই উম্মতে মরহুমার সাহায্যের জন্য আসমান হইতে ফিরিশতাগণ নামিয়া আসিতেন। বনের হিংস্র প্রাণী পর্যন্ত যাহাদের কথা শুনিত এবং যাহাদের সৈন্যবাহিনী অকুল দরিয়া হাঁটিয়া পার হইত তাহাদের দু'আ আসমান পর্যন্ত পৌঁছিবে না এবং তাহাদের কোন রোনাজারি আহাজারি কবুল করা হইবে না।

আলোচ্য হাদীছের আলোকে উম্মতে মুহম্মদিয়ার বর্তমান করুণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন। এমন কোন জাগতিক শাস্তি নাই যাহা আমাদের উপর চাপিয়া বসে নাই। দেশে দেশে জালিম শাসকদের শাসন শোষণে আমরা নিপতিত, যাহাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র দয়া-মায়া নাই। আল্লাহ ও আখিরাতের ভয় নাই। ফলে অসহায় মানুষের উপর জুলুম শোষণে তাহাদের কোন পরওয়া নাই।

তদ্রূপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শত্রুদের হাতে আমরা বিপর্যস্ত। সর্বত্র মুসলমানদের রক্ত ঝরিতেছে। ইজ্জত আবরু লুণ্ঠিত হইতেছে এবং الكفر ملة واحدة (কুফুর অভিন্ন জাতি) হিসাবে সকল অমুসলিম জাতি উম্মতে মুহম্মদিয়াকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার জন্য নিজেদের যাবতীয়

মতবিরোধ ও স্বার্থ-ভিন্নতা সত্ত্বেও একজোট হইয়া তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। এক কথায় পৃথিবী আজ উহার বিশাল ব্যাপ্তি সত্ত্বেও উম্মতের জন্য সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। উম্মতের সৎ লোকেরা বিপদমুক্তির জন্য দু'আ করিতেছেন। আহাজারি রোনাজারি করিতেছেন। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হইতেছে না। চারিদিক হইতে আর্ত চিৎকার উঠিতেছে– متى نصر الله (কখন আসিবে আল্লাহর সাহায্য?!) তবু আল্লাহর 'চূড়ান্ত' সাহায্য আসিতেছে না। কিন্তু কেন আমাদের এই অবস্থা হইল? কি ইহার মূল কারণ?

আলোচ্য হাদীছেই উক্ত প্রশ্নের জওয়াব নিহিত রহিয়াছে। আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকারের যে মহান দায়িত্ব আল্লাহ এই উম্মতের উপর অর্পণ করিয়াছেন উম্মত তাহা হইতে সরিয়া গিয়াছে বরং সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। ফলে হাদীছের ভবিষৎদ্বাণী বাস্তবরূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং উম্মতের মুক্তির একমাত্র পথ হইল আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকারের আমল উম্মতের মাঝে পুনরায় ব্যাপকভাবে শুরু হওয়া এবং ঐ তরীকায় শুরু হওয়া যাহা নবুয়তের যুগে এবং ছাহাবা কেরামের যুগে চালু ছিল। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফিক দান করুন। আমীন।

১৯৭। শ্রেষ্ঠ জিহাদ

الحادي عشر: عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النبيِّ ﷺ قال:

«افْضَلُ الجهادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطانٍ جائِرٍ» رواه ابو داود، والترمذي

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ হইল জালিম শাসকের সামনে ন্যায়পূর্ণ কথা বলা।

(আবু দাউদ ও তিরমিযি শরীফ)

ফায়দা ঃ

শ্রেষ্ঠ অর্থ ছাওয়াব হিসাবে অধিক হওয়া।

(ন্যায়পুর্ণ কথা) সামনের হাদীছের শব্দ হইল كلمة حق বা হক কথা। তবে উভয়ের উদ্দেশ্য অভিন্ন। অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা, মজলুমের পক্ষ সমর্থন করা, সত্য সাক্ষ্যদান করা ইত্যাদি।

ক্ষমতাধর ও প্রতাপশালী ব্যক্তি যাহার সামনে সত্য কথা বলা বিপজ্জনক সেও জালিম বাদশাহর অন্তর্ভুক্ত হইবে। অর্থাৎ তাহার সামনে সত্য কথা বলাও শ্রেষ্ঠ জিহাদ হইবে। কেননা শ্রেষ্ঠত্বের কারণ উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান অর্থাৎ ভয়ভীতি এবং লোভ ও প্রলোভনের উর্ধ্বে থাকিয়া সত্য কথা বলা।

হাদীছের শিক্ষা ঃ আল্লাহ পাকের আযাব গযব ও পরীক্ষা হইতে বাঁচিতে হইলে এবং দু'আ কবুল না হইবার অভিশাপ হইতে নাজাত পাইতে হইলে আমাদিগকে অতি অবশ্যই শরীয়তসম্মত উপায়ে আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের মহা দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

১৯৮। শ্রেষ্ঠ জিহাদ

الثاني عشر: عَنْ اَبِي عَبدِ اللهِ طارقِ بْنِ شِهابٍ البَجَلِيِّ الْاَحْمَسِيِّ رضي الله عنه اَنَّ رجلاً سَأَلَ النبيَّ ﷺ، وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَه في الغَرْزِ: اَيُّ الجهادِ اَفْضَلُ؟ قال: «كَلِمَةُ حقٍّ عِندَ سُلْطانٍ جائرٍ» رواه النسائي بإسناد صحيح .

হযরত আবু আব্দুল্লাহ্ তারিক বিন সিহাব বাজালী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, (একবার) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সওয়ারির) রিকাবিতে পা রাখিয়াছেন মাত্র, এমন সময় এক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বলিলেন, জালিম শাসকের সামনে হক কথা বলা। (নাসাঈ ছহী সনদে)

ফায়দা ঃ

(জালিম বাদশাহর সামনে) ইহা শ্রেষ্ঠ জিহাদ হইবার কারণ এই যে, ইহা আল্লাহর প্রতি তাহার ঈমান ও বিশ্বাসের পূর্ণতা এবং আল্লাহর শক্তি ও কুদরতের উপর অবিচল আস্থার প্রমাণ। কেননা জালিম বাদশাহর সামনে তাহার ইচ্ছার বিপরীত কথা বলা সাধারণতঃ জান-মালের উপর বিপদ ডাকিয়া আনে এবং এমন নির্যাতন বরদাশত করিতে হয় যাহা মানুষের পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব নহে। যেমন, হযরত ইবরাহীম (আঃ) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। হযরত যাকারিয়া (আঃ) করাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছেন, হযরত ইয়াহয়া (আঃ) যবেহ হইয়াছেন। কিন্তু আল্লাহর এই বান্দা জুলুম নির্যাতনের এত সমস্ত লোমহর্ষক নযির থাকা সত্ত্বেও জালিম বাদশাহর জুলুম নির্যাতনের কোন ভয় করে নাই। বরং আল্লাহর হুকুমকে এবং আল্লাহর হককে নিজের জান-মালের হকের উপর অগ্রাধিকার দিয়াছে। এইভাবে ঐ সকল আম্বিয়া কেরামের সহিত তাহার সাদৃশ্য সাব্যস্ত হইয়াছে যাঁহারা মাখলূকের শক্তিকে ভয় না করিয়া খালিকের শক্তির উপর ভরসা করিয়া হক কথা বলিয়াছেন।

ইহাছাড়া যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্রধারী মুজাহিদ তো আঘাত করে আবার আঘাত খায়। সুতরাং তাহার মজলুমিয়ত ঐ ব্যক্তির মত নহে যে, অসহায় অবস্থায় জালিমের হাজারো রকমের অকথ্য নির্যাতন ছবরের সহিত ভোগ করে।

১৯৯। বনী ইসরাঈলের অধঃপতনের সূচনা

الثالث عشر: عَنِ ابْنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اَوَّلَ ما دَخَلَ النقصُ على بني اِسْرائيلَ انه كان الرجلُ يَلْقَى الرجلَ فيقولُ: يا هذا اتَّقِ اللهَ وَدَعْ ما تَصْنَعُ فَإنَّه لا يَحِلُّ لك، ثُمَّ يلقاه مِنَ الغدِ وَهُوَ على حالِه، فلا يَمْنَعُه ذلك اَنْ يكونَ اَكِيلَه وشَرِيبَه وَقَعِيْدَه، فَلَمَّا فعلوا ذلك ضَرَبَ اللهُ قلوبَ بَعْضِهِم بِبَعْضٍ» ثم قال: ﴿لُعِنَ الذينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي اِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داودَ وعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِما عَصَوْا وَكانوا يَعْتَدُون. كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوه لَبِئْسَ ما كانوا يَفعلون. تَرٰى كثيرًا مِنهُم يَتَوَلَّوْنَ

الذين كَفَرُوا لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ الى قوله: ﴿ فَاسِقُون ﴾ [المائدة: ٧٨، ٨١] ثمّ قال: «كَلَّا، وَاللهِ لَتَأْمُرُنَّ بالمَعْروفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ على يَدِ الظَالِمِ، وَلَتَاطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اِطرًا، وَلَتقْصُرُنَّه على الحَقِّ قَصْرًا، اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلوبِ بَعْضِكُم عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُم كَما لَعَنَهم» رواه ابو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

هذا لفظ ابي داود، ولفظ الترمذي: قال رسول الله ﷺ: «لَمَّا وَقَعَتْ بَنو اِسْرائيلَ في الْمَعاصِيْ نَهَتْهُمْ عُلَماؤُهم فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَجالَسُوهم في مَجَالِسِهِم وَوَاكَلُوهم وَشارَبُوهم، فَضَرَبَ اللهُ قُلوبَ بَعْضِهم بِبَعْضٍ، وَلَعَنَهم عَلَى لِسانِ داودَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِما عَصَوْا وَكانوا يَعْتَدُون» فَجَلَسَ رسولُ اللهِ ﷺ، وَكانَ مُتَّكِئًا فقال: «لا وَالذي نَفسِي بِيَدِهِ حَتّى تَأْطِرُوهم عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا».

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বনী ইসরাঈলের মাঝে প্রথম যে (দ্বীনী) দোষ দেখা দিল তাহা এই যে, একজন লোকের সহিত আরেকজন লোকের দেখা হইত। তখন সে বলিত, হে লোক! আল্লাহকে ভয় কর এবং যাহা করিতেছ তাহা ছাড়িয়া দাও। ইহা তোমার জন্য জায়েয নহে। অতঃপর আগামী দিন তাহার সহিত দেখা হইত এমন অবস্থায় যে, লোকটি তাহার নাফরমানির হালতেই বহাল রহিয়াছে। কিন্তু এই সুরতেহাল তাহাকে তাহার সহিত একত্রে পানাহার ও উঠা-বসা করা হইতে বিরত রাখিত না। যখন তাহারা এইরূপ করিল তখন আল্লাহ্ একদলের অন্তরকে অপরদলের অন্তর দ্বারা প্রভাবিত করিয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন—

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ * كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ * تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ فِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ * وَ لَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ النَّبِىِّ وَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَاءَ وَ لٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ *

বনী ইসরাঈলের মাঝে যাহারা কুফুরি করিয়াছে তাহাদিগকে দাউদ (আঃ) ও ঈসা ইবনে মারয়াম (আঃ)-এর যবানীতে অভিসম্পাত করা হইয়াছে। উহা এই জন্য যে, তাহারা নাফরমানি করিত এবং সীমালংঘন করিত। তাহারা যে অন্যায় কাজ করিত তাহা হইতে একে অপরকে নিষেধ করিত না। অতি নিকৃষ্ট কাজই তাহারা করিত। তাহাদের অনেককেই তুমি দেখিতে পাইতেছ যে, তাহারা কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে। খুবই মন্দ জিনিস তাহারা নিজেদের জন্য অগ্রবর্তী করিয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টি। আর তাহারা চিরকাল আযাবে থাকিবে। যদি তাহারা আল্লাহর উপর, নবীর

উপর এবং যাহা তাহার উপর নাযিল করা হইয়াছে উহার উপর ঈমান আনিত তবে তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই পাপাচারী।

অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের আদেশ করিতে থাক এবং মন্দকাজে নিষেধ করিতে থাক এবং জালিমের হাত ধরিয়া রাখ এবং তাহাকে হকের পথে টানিয়া আন এবং তাহাকে হকের উপর আবদ্ধ রাখ। অন্যথায় আল্লাহ্ পাক তোমাদের একদলের অন্তরকে অপরদলের অন্তর দ্বারা প্রভাবিত করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে অভিসম্পাত করিবেন যেমন তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন।

(আবু দাউদ শরীফ)

তিরমিযি শরীফের বর্ণনা এইরূপ– রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বনী ইসরাঈল যখন বিভিন্ন পাপে লিপ্ত হইল তখন তাহাদের আলিমগণ তাহাদিগকে নিষেধ করিল কিন্তু তাহারা নিষেধ মানিল না। ইহার পরও আলিমগণ তাহাদের সহিত উঠা-বসা ও পানাহার অব্যাহত রাখিল। ফলে আল্লাহ্ তাহাদের সকলের অন্তর অভিন্ন করিয়া দিলেন এবং দাউদ ও ঈসা বিন মারয়ামের যবানীতে তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিলেন। উহা এই জন্য যে, তাহারা নাফরমানি করিয়াছিল এবং সীমালংঘন করিতেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দেওয়া অবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, ঐ যাতের কসম! যাঁহার হাতে আমার জান, কিছুতেই তোমরা রেহাই পাইবে না, যতক্ষণ না তোমরা তাহাদিগকে হকের দিকে টানিয়া আন।

ফায়দা ঃ

(কিন্তু এই সুরতেহাল তাহাকে তাহার সহিত উঠাবসা করা হইতে বিরত রাখিত না।) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করিবার পর যদি সে উহার উপর আমল না করে (এবং সংশোধন হইবার কোন আশাও দেখা না যায়) তখন শরীয়তের হুকুম হইল তাহার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং উঠা-বসা ও মিলা-মিশা বন্ধ করিয়া দেওয়া। যেমন ছাহাবা কেরাম অতি সামান্য ক্ষেত্রেই এই রূপ করিয়াছেন। এমন কি আপন পুত্রের সহিতও কথা বন্ধ ও সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। কিন্তু বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাহা করিত না। ফলে উভয় পক্ষই শরীয়তের হুকুম অমান্যকারী হইয়া যাইত।

উল্লেখ্য যে, যদি নাফরমানের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের কারণে তাহার পক্ষ হইতে অনিষ্টের আশংকা দেখা দেয় তবে বাহ্যিক সৌজন্য রক্ষা করিয়া চলিবে। কিন্তু তাহার সহিত দিলখোলা ও অন্তরংগ আচরণ করিবে না।

(উহা এই জন্য যে, তাহারাা নাফরমানি করিত।) অভিসম্পাতের কারণ বর্ণনা করা হইতেছে। অর্থাৎ তাহাদের নাফরমানির কারণে তাহাদিগকে অভিসম্পাত করা হইয়াছে। ইহা নিছক তাকীদ ও জোর প্রদানের জন্য বলা হইয়াছে। কেননা كفروا শব্দ দ্বারাই তাহাদের প্রতি অভিসম্পাতের কারণ জানা গিয়াছে। (যাহারা কুফুরি করিয়াছে তাহাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হইয়াছে।) অর্থাৎ কুফুরি করাই অভিসম্পাতের কারণ। যেমন বলা হয়, চোরের হাত কাটা হইয়াছে। অর্থাৎ চুরি করাই হাত কাটা যাইবার কারণ।

(একে অপরকে নিষেধ করিত না) অর্থাৎ অনাচার করিত এবং প্রকাশ্যেই করিত। তদুপরি কেহ কাহাকেও বাধা দিত না। অন্যায় কাজ যখন বান্দার দ্বারা সংঘটিত হইয়াই যায় তখন বান্দার উচিত অন্ততঃ লোকচক্ষুর আড়ালে করিবার চেষ্টা করা। কেননা প্রকাশ্যে করিবার অর্থ চরম নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা এবং অন্যদিগকেও পাপাচারে উৎসাহিত করা। আর নিষেধ না করিবার অর্থ উহার প্রতি সামাজিক স্বীকৃতি দান করা। এই ত্রিবিধ অন্যায়ের একত্র সমাবেশের কারণে তাহাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হইয়াছে।

আল্লামা যমখশরী (রহঃ) তাফসীরুল কাশশাফে এই আয়াত প্রসংগে বলেন–

'মুসলমানদের অবস্থার উপর হায় আফসোস, অন্যায় কাজে পরস্পরকে নিষেধ করিবার বিষয়ে তাহারা এমন চরম অবহেলা প্রদর্শন করিতেছে, যেন ইসলামের সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই। অথচ আল্লাহর কিতাবে (এবং রাসূলের সুন্নায়)। এই বিষয়ে কত তাকীদপূর্ণ আয়াত (ও হাদীছ) তাহারা তিলাওয়াত করিতেছে।

বস্তুতঃ ইসলামের এই মহান আহকামের প্রতি অবহেলার কারণেই আজ তাহাদের এত দুর্গতি। জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, এই একটি আয়াতের উপর আমল না করিবার কারণেই মুসলিম জাহানের উপর তাতারী জাতির মাধ্যমে ধ্বংসের সয়লাব নামিয়া আসিয়াছিল। এমন কি অনেকেই ভাবিতে শুরু করিয়াছিল যে, ইহারাই বুঝি কোরআন ও হাদীছে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজ। আবার এই একটি আয়াতের উপর আমল করিবার বরকতেই ধ্বংসের বার্তাবাহক তাতারী জাতি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।'

(পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে) কাহারও কাহারও মতে এইখানে মদীনার ইহুদী সরদার কা'আব ইবনুল আশরাফ ও তাহার অনুগামীদের প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে, যাহারা মুশরিকদিগকে প্ররোচিত করিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাইয়াছিল।

(নবীর উপর) যদি আলোচ্য আয়াত ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হইয়া থাকে তবে নবী দ্বারা তাহাদের নবী উদ্দেশ্য এবং 'যাহা তাহার উপর নাযিল হইয়াছে' দ্বারা তাওরাত উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে মুনাফিকদের সম্পর্কে হইলে যথাক্রমে আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কোরআন উদ্দেশ্য।

(মুশরিকদিগকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করিত না) কেননা কোরআন বা তাওরাত কোন কিতাবই মুশরিকদিগকে বন্ধু রূপে গ্রহণ অনুমোদন করে না।

(তাহাদের অনেকেই ফাসিক বা পাপাচারী) অর্থাৎ তাহারা (ইহুদীরা) তাহাদের ধর্ম হইতে বিচ্যুত। কিংবা তাহারা (মুনাফিকরা) চরম মুনাফেকিতে লিপ্ত। অর্থাৎ পাপাচার দ্বারা এইখানে মুমিনদের নাফরমানি উদ্দেশ্য নহে। কুফুরি বা মুনাফেকি উদ্দেশ্য।

(প্রভাবিত করিয়া দিবেন) অর্থাৎ ধীরে ধীরে অন্যায়কারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এমন কি এক সময় সকলেই পাপাচারে লিপ্ত হইয়া যাইবে ফলে সকলের অন্তর অভিন্ন হইয়া যাইবে এবং ইহুদীদের মত তোমাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ নামিয়া আসিবে। মোটকথা;

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ তরক করিবার পরিণতি হইল পাপাচারের সর্বব্যাপকতা এবং আল্লাহর লানত নাযিল হওয়া। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

(উঠিয়া বসিলেন) পরবর্তী বিষয়টির গুরুতরতা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া বসিবেন, যাহাতে শ্রোতা তাঁহার কথাকে পূর্ণ মনোযোগ ও গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করে।

(হকের দিকে টানিয়া আন) অর্থাৎ যদি শক্তি প্রয়োগ করিয়া বাধা দিবার প্রয়োজন হয়। আর উহার সামর্থ্যও থাকে তবে শুধু মৌখিক প্রতিবাদ উপরোক্ত শাস্তি হইতে রেহাই পাইবার জন্য যথেষ্ট হইবে না। বরং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হকের পথে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

২০০। নিজের সততাই যথেষ্ট নহে।

الرابع عشر: عَنْ أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رضي الله عنه، قال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكم لَتَقْرَؤُونَ هذه الآيةَ: ﴿ يا ايها الذين آمَنُوا عَليكم أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: وَإِني سَمِعتُ رسولَ الله، ﷺ، يقول: «إِن النَّاسَ إِذا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا على يَدَيْهِ أَوْشَكَ أن يَعُمَّهم اللهُ بِعِقابٍ منه» رواه ابو داود، والترمذي، والنسائي باسانيد صحيحة.

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, হে লোকসকল! তোমরা এই আয়াত পড়িয়া থাক–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ *

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ব্যাপারে যত্নবান হও। যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, যদি তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।

আর আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, মানুষ যখন কাহাকেও জুলুম করিতে দেখিয়াও তাহার হাত ধরিয়া না রাখে তখন আল্লাহ্ পাক অচিরেই তাহাদের সকলকে তাহার পক্ষ হইতে আযাব দ্বারা পাকড়াও করিবেন।

(ছহী সনদে আবু দাউদ, তিরমিযি ও নাসাঈ শরীফ)

ফায়দা ঃ

অর্থাৎ এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা তোমরা (হয়ত) এমন ধারণা করিতেছ যে, তোমরা যদি নিজেদের দ্বীনদারীর ব্যাপারে যত্নবান হও এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধ মানিয়া চল এবং হিদায়াতের উপর অবিচল থাক তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। অন্যদিগকে গোমরাহীর উপর চলিতে দেখিয়া তাহাদিগকে সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা জরুরী নহে। কেননা তাহাদের গোমরাহী আমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। অথচ আয়াতের প্রকৃত অর্থ ইহা নহে।

অন্য রিওয়ায়াতে এই অংশটুকু বর্ধিত আছে–

و تضعونها على غير موضعها *

এই আয়াতকে তোমরা ভুল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া থাক। বরং আয়াতের প্রকৃত অর্থ এই

যে, অতি অবশ্যই আমর বিল মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার করিতে হইবে। ইহার পরও যদি কেহ গোমরাহীতে লিপ্ত থাকে তবে উহা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর হইবে না। কেননা তোমরা তোমাদের উপর অর্পিত কর্তব্য পূর্ণ করিয়াছ। আলোচ্য আয়াতের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, মানুষ যখন কাহাকেও জুলুম করিতে ....

(তাহার হাত ধরিয়া না রাখে) ইহার ছুরত এই যে, সামর্থ্য থাকিলে এবং প্রয়োজন হইলে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাহাকে বাধা দিবে। আর সামর্থ্য না থাকিলে কিংবা প্রয়োজন না হইলে মৌখিকভাবে অর্থাৎ উপদেশ বা তিরস্কার বা অনুরোধ ও অনুনয়ের মাধ্যমে বাধা দিবে। এতটুকু করিতেও যদি অপারগ হয়; যেমন জান-মালের ক্ষতির আশংকা দেখা দেয় কিংবা বিদ্যমান অন্যায়ের চাইতে গুরুতর অন্যায় আত্মপ্রকাশ করিবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে বাধা দিবার প্রয়োজন নাই। এমতাবস্থায় শুধু অন্তরে ঘৃণা পোষণই যথেষ্ট হইবে এবং মাযুর হিসাবে আল্লাহর রহমতে সে উপরোক্ত শাস্তি হইতে নিরাপদ থাকিবে। কেননা আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন–

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا *

আল্লাহ কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার দেন না।

অধ্যায় – ২৪

অন্যকে আদেশ-নিষেধ করা অথচ নিজে উহা মান্য না করিবার কঠিন শাস্তি।

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَتَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ *

তোমরা কি মানুষকে নেক কাজের আদেশ কর আর নিজেদের কথা ভুলিয়া যাও? অথচ তোমরা 'কিতাব' পড়িয়া থাক। আচ্ছা, তোমরা কি বুদ্ধি রাখ না?

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ *

হে ঐ লোকেরা যাহারা ঈমান আনিয়াছ, কেন তোমরা ঐ কথা বল যাহা (নিজেরা) কর না। আল্লাহর নিকট ইহা বড়ই ঘৃণার বিষয় যে, যাহা তোমরা করিবে না তাহা বলিবে।

হযরত শো'আইব (আঃ)-এর বক্তব্য তুলিয়া ধরিয়া আল্লাহ বলেন–

و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه *

তোমাদিগকে যে কাজ হইতে নিষেধ করিতেছি সেই বিষয়ে আমি তোমাদের বিপরীত করিতে চাহি না।

ফায়দা ঃ

(অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত কর) অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জীল তিলাওয়াত কর। অথচ ঐ দুই কিতাবে ইহার নিন্দা করা হইয়াছে।

(নিজেদের কথা ভুলিয়া যাও) অর্থাৎ অন্যদিগকে যে সকল নেককাজ করিতে বল নিজেরা উহা কর না।

(তোমরা কি বুদ্ধি রাখ না?) ইহা দ্বারা এই দিকে ইংগিত করা হইয়াছে যে, যাহার আকল ও বুদ্ধি আছে সে এইরূপ করিতে পারে না যে, অন্যকে তো ভাল কাজের আদেশ করিবে অথচ নিজে উহা করিবে না। বিশেষতঃ যদি ঐ কাজের উপর তাহার আখিরাতের কামিয়াবি নির্ভর করে।

(কেন তোমরা ঐই কথা বল যাহা নিজেরা কর না) আল্লামা বায়যাবী (রহঃ) বলেন, বর্ণিত আছে যে, মুসলমানগণ একদা বলিলেন, যদি আমরা জানিতে পারিতাম যে, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কি তবে অবশ্যই আমরা ঐ কাজে নিজেদের জান-মাল কোরবান করিতাম। তখন আল্লাহ পাক এই আয়াত নাযিল করিলেন–

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ *

আল্লাহ তাহাদিগকে ভালবাসেন যাহারা তাঁহার রাস্তায় এক কাতারে দাঁড়াইয়া লড়াই করে যেন তাহারা শিসাঢালা প্রাচীর।

অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই লড়াই হইতে পলায়ন করে না। অবিচলভাবে লড়াই করে। কিন্তু অহুদের যুদ্ধে প্রথম দিকে যখন মুসলমানদের জয় হইল আর তাহারা গনীমতের মাল জমা করিবার কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ঐ দিকে কাফিররা মুসলমানদের পশ্চাদ্দিক অর্থাৎ অহুদ পাহাড়ের দিক অরক্ষিত দেখিতে পাইয়া সেই পথে অকস্মাৎ হামলা করিয়া বসিল তখন মুসলমানগণ দিশাহারা হইয়া ময়দান ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। সেই প্রসংগে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইয়াছে।

(হযরত শোআইব) তাবারী বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

صلوا على انبياء الله فانهم ارسلوا كما ارسلت *

তোমরা আল্লাহর নবীগণের উপর দুরূদ পাঠ কর। কেননা আমি যেমন আল্লাহর প্রেরিত তেমনি তাঁহারাও আল্লাহর প্রেরিত।

এই হাদীছের উপর আমল করিয়া হযরত শোআইব (আঃ)-এর নামের সহিত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুক্ত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ অন্যান্য নবীর নামের সহিত عليه السلام যুক্ত করা হইয়া থাকে।

صلى الله على نبينا و علي سائر الانبياء *

হাদীছসমূহ

২০১। জাহান্নামে বে-আমল উপদেশদাতার পরিণাম

وَعَنْ اَبِي زَيْدٍ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حارِثَةَ، رضي الله عنهما، قال: سَمِعتُ رسولَ الله، ﷺ، يقول: «يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيامَةِ فَيُلْقَى في النارِ، فَتَنْدَلِقُ اَقْتابُ بَطْنِه، فَيَدُورُ بِها كَمَا يَدُورُ الحِمارُ في الرَّحَا، فَيَجْتَمِعُ إليه اَهْلُ النارِ فيقولون: يَا فُلانُ مَالَكَ؟ أَلَمْ تَكُ تَأمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فيقول: بَلىٰ، كنتُ اٰمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلا اٰتِيْهِ، وَاَنْهىٰ عَنِ المنكرِ وَاٰتِيه» متفق عليه .

হযরত ওসামা বিন যায়েদ বিন হারিছা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, এক (শ্রেণীর) লোককে কেয়ামতের দিন হাযির করা হইবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। তখন তাহার নাড়ি-ভূঁড়ি বাহির হইয়া আসিবে। অতঃপর সে উহা সহ এমনভাবে চক্কর খাইতে থাকিবে যেমন যাঁতার চারিপার্শ্বে গাধা ঘুরিতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তাহার নিকট সমবেত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে। হে অমুক! তোমার এই অবস্থা কেন? তুমি না মানুষকে সৎকাজের আদেশ করিতে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করিতে! তখন সে বলিবে, অবশ্যই আমি সৎ কাজের আদেশ করিতাম, কিন্তু নিজে তাহা পালন করিতাম না এবং অসৎ কাজে নিষেধ করিতাম, অথচ নিজে তাহা করিতাম। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(উহা সহ এমনভাবে চক্কর খাইতে থাকিবে) সম্ভবতঃ হাদীছের উদ্দেশ্য এই যে, লোকটি ঘুরপাক খাইতে থাকিবে। ফলে তাহার নাড়ীভূঁড়ি তাহাকে পেঁচাইয়া যাইবে। এইভাবে সেও ঘুরিতে থাকিবে আর তাহার সংগে তাহার নাড়ীভূঁড়িও ঘুরিতে থাকিবে। সম্ভবতঃ লোকটি নাড়ীভূঁড়ি বাহির হইবার কারণে ব্যথায় অস্থির হইয়া ঘুরিতে থাকিবে। اللهم ربنا قفنا عذاب النار। (হে আল্লাহ! আমাদিগকে জাহান্নামের আযাব হইতে হিফাযত করুন। আমীন)

(তুমি কি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করিতে না।) এই প্রশ্ন উত্তর লাভের জন্য নহে বরং আশ্চর্য প্রকাশ করিবার জন্য। কেননা বিষয়টি তাহাদের জানা আছে। সম্ভবতঃ দুনিয়াতে যাহারা তাহাকে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করিতে দেখিয়াছিল তাহারাই তাহার চারিপার্শ্বে জড়ো হইয়াছিল। কিংবা আল্লাহ পাক তাহাদিগকে তাহার বিষয় জানাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের বক্তব্যের খোলাসা এই যে, তুমি তো দুনিয়াতে সৎ কাজের আদেশ করিতে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করিতে। আর সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ যে করে তাহার নীতি হইল নিজে উহার উপর আমল করা। সুতরাং তুমিও নিশ্চয় সৎ কাজ করিয়াছ এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত থাকিয়াছ। আর আল্লাহর চিরসত্য ওয়াদা অনুযায়ী সৎ কাজ করা এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত থাকা মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করা হইতে বিরত রাখে। সুতরাং তোমার জাহান্নামে আসিবার এবং এই অদ্ভুত শাস্তি ভোগ করিবার কি কারণ থাকিতে পারে!

(নিষেধ করিতাম, কিন্তু নিজে উহা করিতাম) তাহার শাস্তি অধিকতর কঠিন হইবার কারণ এই যে, সে ইলম থাকা সত্ত্বেও নাফরমানি করিয়াছে। অথচ ইলমের দাবী ছিল আল্লাহকে ভয় করা এবং আদেশ-নিষেধ লংঘন হইতে বিরত থাকা।

অধ্যায় – ২৫

আমানত যথাযথভাবে আদায়ের আদেশ

امانة শব্দের অর্থ বিশ্বস্ততা। সাধারণতঃ امانة (আমানত) দ্বারা ঐ সমস্ত সম্পদ বুঝানো হয় যাহা কাহারো নিকট গচ্ছিত রাখা হয়। ইসলামী শরীয়ত আমানত যথার্থ মালিকের নিকট যথাযথভাবে প্রত্যার্পণ করিবার জোর তাকিদ দিয়াছে। আলোচ্য অধ্যায়ের আয়াত ও হাদীছ গুলি দ্বারা ইহা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এমন খুব কমই হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দান করিয়াছেন অথচ তখন এই কথা বলেন নাই যে,

لا ايمان لمن لا امانة له *

যাহার মধ্যে আমানতদারি নাই তাহার ঈমান নাই।

তবে শরীয়তের পরিভাষায় গচ্ছিত সম্পদকেই শুধু আমানত বলে না। বরং আমানতের আরও কিছু প্রকারভেদ রহিয়াছে। যেমন মজলিসে যে সকল গোপন কথা আলোচনা হয় সেইগুলি নিজেদের মাঝে সীমিত রাখা এবং অন্যত্র প্রকাশ না করাও আমানত। তদ্রূপ বিভিন্ন পদ ও দায়িত্ব যাহা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কাহাকেও দান করে উহাও আমানত। তদ্রূপ শরীয়তের হুকুম আহকামগুলিও আল্লাহর পক্ষ হইতে বান্দার উপর অর্পিত আমানতবিশেষ। আমানতের এই বিভিন্ন প্রকারভেদের প্রতি ইংগিত করিয়াই কোরআন শরীফে امانة শব্দকে বহুবচন রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا *

আল্লাহ তোমাদিগকে যাবতীয় আমানত উহার মালিকের নিকট আদায় করিবার আদেশ করিতেছেন–

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا *

আমি (এই) আমানতকে আসমান সমূহ, যমীন ও পাহাড় পর্বতের সামনে পেশ করিলাম। তাহারা তাহা বহন করিতে প্রস্তুত হইল না। বরং তাহাকে ভয় পাইল। অথচ মানুষ তাহা বহন করিল। নিঃসন্দেহে সে বড় অবিচারক ও মুর্খ।

ফায়দা ঃ

(প্রথম আয়াত) পূর্ণ আয়াতটি এইরূপ–

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ، إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا *

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে আদেশ করেন যেন তোমরা আমানত্সমূহ উহার প্রাপকদের নিকট পৌঁছাইয়া দাও এবং যখন তোমরা মানুষের মাঝে (কোন বিষয়) বিচার কর তখন যেন ইনছাফের সহিত বিচার কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদিগকে অতিউত্তম উপদেশ দান করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ববিষয় শ্রবণকারী, অবলোকনকারী।

শানেনুযূল

আলোচ্য আয়াতের শানেনুযূল এই যে, জাহেলিয়াতের যুগেও কাবা শরীফের খিদমতকে বিরাট সম্মান ও মর্যাদার বিষয় মনে করা হইত। তাই বাইতুল্লাহর বিভিন্ন খিদমত কোরায়শের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের যিম্মায় সোপর্দ ছিল। যেমন হাজীদিগকে যমযমের পানি পান করানো তথা 'সিকায়া'-এর খিদমত ছিল হাশেমী পরিবারের যিম্মায়। কাহারো যিম্মায় ছিল হাজীদের আপ্যায়ন বা 'রিফাদাহ'-এর দায়িত্ব। তদ্রূপ বাইতুল্লাহর চাবি রাখিবার দায়িত্ব ছিল ওছমান বিন তালহার উপর যিনি মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কাবাঘরে প্রবেশ করিবার জন্য তাহার নিকট চাবি চাহিয়াছিলেন। তাহার কর্তব্য ছিল চাবি দেওয়া। কিন্তু ওছমান চাবি তো দিলেনই না বরং আল্লাহর রাসূলের প্রতি কটূক্তি করিলেন। কিন্তু তিনি তাহার কটূক্তির কোন জওয়াব না দিয়া শুধু এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, হয়ত বাইতুল্লাহর এই চাবি এক সময় তুমি আমার হাতে দেখিতে পাইবে তখন এই চাবি যাহাকে ইচ্ছা দান করিবার অধিকার আমার থাকিবে।

ওছমান বিন তালহা বলেন, তখনই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হইল যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই সত্য হইবে। তাই আমি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু আমার কাওমের কঠোর তিরস্কারের কারণে তাহা সম্ভব হইল না।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত হইতে বাইতুল্লাহর চাবি লইলেন এবং সেখানে প্রবেশ করিয়া নামায আদায় করিলেন। অতঃপর বাহিরে আসিয়া আমার হাতে চাবি ফেরত দিয়া বলিলেন, এই লও। এখন হইতে কিয়ামত পর্যন্ত এই চাবি তোমার বংশধরদের হাতেই থাকিবে। যে কেহ ইহা তোমাদের হাত হইতে কব্জা করিতে চাহিবে সে হইবে জালিম।

ওছমান বিন তালহা বলেন, যখন আমি চাবি লইয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাক দিয়া বলিলেন, ওছমান! আমার ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হইল তো? সংগে সংগে হিজরত-পূর্ব ঘটনাটি আমার মনে পড়িল। আমি বলিয়া উঠিলাম। নিঃসন্দেহে আপনার কথা সত্য হইয়াছে। তখনই আমি কালিমা পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেলাম।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করিতেছিলেন (অর্থাৎ তখনই ইহা নাযিল হইয়াছিল)–

ان الله يامركم ان تؤدوا الامانت الى اهلها *

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের মতে এই আয়াত শাসকদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছিল যেন প্রজাসাধারণের প্রতিপালন ও শাসনের যে আমানত ও দায়িত্ব তাহাদের উপর আল্লাহ অর্পণ করিয়াছেন তাহা তাহারা যথাযথভাবে পালন করে।

তবে শানেনুযূল যাহাই হউক শব্দের ব্যাপকতার ভিত্তিতে এমন সকলেই আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য যাহাদের যিম্মায় যে কোন প্রকারের আমানত রহিয়াছে। সুতরাং সাধারণ মানুষ ও শাসকবর্গ সকলেই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

আমানত ও ন্যায় বিচার ঃ এখানে আল্লাহ পাক মুসলমানদিগকে দুইটি বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন, আমানত রক্ষা করা। ইহা প্রধানতঃ আত্মমুখী আমল। দ্বিতীয় হইল মানুষের প্রতি সুবিচার করা। ইহা পরমুখী আমল। যেহেতু প্রথমে আত্মসংশোধন করা এবং অতঃপর অন্যদের বিষয়ে মনোযোগী হওয়াই স্বভাবের দাবী সেহেতু প্রথমে আমানতের কথা এবং পরে ন্যায় বিচারের কথা বলা হইয়াছে।

কিংবা সম্ভবতঃ এই কারণে আমানতের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে যে, আমানতের গুণ অর্জন ছাড়া ন্যায় বিচারের গুণ অর্জন করা সম্ভব নহে।

ان الله يامركم **(আল্লাহ তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন)** দ্বারা আয়াত শুরু করিয়া এই দিকে ইংগিত করা হইয়াছে যে, আদেশ নিষেধের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা। শাসকবর্গ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ প্রয়োগ করিবে মাত্র। সুতরাং জনগণ বা সরকার কাহারই নিজেদের পক্ষ হইতে আইন তৈয়ার করিবার অধিকার নাই।

الى اهلها **(তাহার প্রকৃত হকদারের নিকট)** অর্থাৎ গচ্ছিত সম্পদের আমানত প্রকৃত মালিকের নিকট পৌঁছাইতে হইবে। নিজে আত্মসাৎ করা যেমন জায়েয নাই, তেমনি গরীব অভাবীকেও দান করিয়া দেওয়া জায়েয নাই।

তদ্রূপ সরকারী পদ ও দায়িত্বসমূহ আঞ্চলিকতা, আত্মীয়তা বা অন্য কারণে কাহারও হাতে ন্যাস্ত করিবার অধিকার নাই। বরং উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে ন্যাস্ত করিতে হইবে।

(ইনসাফের সহিত) অর্থাৎ ধর্ম, গোত্র, ভাষা, বর্ণ ইত্যাদি কোন কিছুর প্রতি লক্ষ্য যেন না হয়। যেমন হযরত কাযী শোরায়হ (রাঃ) স্বয়ং আমীরুল মুমিনীনের বিপক্ষে এক সাধারণ ইহুদীর পক্ষে রায় দিয়াছিলেন শুধু এই কারণে যে, আমীরুল মুমিনীন প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য পেশ করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় আয়াত

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানের সমষ্টিই হইল আমানত। তাফসীরে মাযহারীতেও একই মত প্রকাশ করা হইয়াছে।

(আমানত পেশ করিলাম) অর্থাৎ এই শর্তে যে, যদি যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালন কর তবে ছাওয়াব ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। আর যদি ত্রুটি কর তবে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, জড় পদার্থের সামনে আমানত পেশ করা এবং তাহাদের অপারগতা প্রকাশ করা এবং ভীত হওয়া কিভাবে সম্ভব? উত্তর এই যে, ইহা খুবই সম্ভব। কেননা আল্লাহ্ যে কোন সৃষ্টির মাঝে বোধ, বুদ্ধি ও বাকশক্তি স্থায়ীভাবে কিংবা সাময়িকভাবে সৃষ্টি করিতে পারেন। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযাসমূহের মধ্যে আছে যে, পাথর তাঁহার হাতে থাকা অবস্থায় তাসবীহ্ পড়িয়াছিল এবং মসজিদে নববীর খুটি তাঁহার বিচ্ছেদে কাঁদিয়াছিল। ইহাছাড়া প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড়জগত প্রত্যেকেরই রহিয়াছে নিজস্ব ভাষা। যেমন ইরশাদ হইয়াছে–

وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَ لٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ *

প্রতিটি বস্তু তাহার প্রশংসা সহ তাসবীহ্ পাঠ করে। কিন্তু তোমরা তাহাদের তাসবীহ্ বুঝিতে পার না।

এই কারণেই অধিকাংশ তাফসীর বিশারদের মতে আমানত পেশ করা, অপারগতা প্রকাশ করা ও ভীত হওয়া আক্ষরিক অর্থেই হইয়াছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন–

اعطيت الجمادات فهما و تمييزا فجيرت فى الحمل *

জড়পদার্থসমূহকে বোধ ও বিচারক্ষমতা দান করা হইয়াছিল। অতঃপর তাহাদিগকে (আমানত) বহন করিবারও না করিবার ইচ্ছা দান করা হইয়াছিল।

কেহ কেহ ইহাকে রূপক অর্থে গ্রহণ করিয়া এই ভাবে ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক তাঁহার আমানতের আযমত ও শান বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন, এই আমানত এমনই গুরুভার যে, যদি এই সকল বিশাল সৃষ্টিবস্তুর উপর উহা অর্পণ করা হইত আর তাহাদের বোধ, বুদ্ধি ও বাকশক্তি থাকিত তবে তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উহা বহনে অপারগতা প্রকাশ করিত।

বলাবাহুল্য যে, এই ধরনের রূপকতার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা বাস্তব ব্যাখ্যা এখানে অসম্ভব নহে।

ইহাছাড়া বিষয়টি রূপক অর্থে নিছক ধরিয়া লইবার পর্যায়ে হইলে لو (বা যদি) শব্দ দ্বারা বক্তব্য শুরু করা হইত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে–

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ *

(হে নবী) যদি আমি এই কোরআন কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করিতাম তাহা হইলে অবশ্যই আপনি উহাকে ভীত সন্ত্রস্ত এবং আল্লাহর ভয়ে ছিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাইতেন।

কিন্তু আলোচ্য আয়াতে لو এর ব্যবহার হয় নাই বরং একটি অতীত ঘটনা রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, আল্লাহর পেশকৃত আমানত গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা তাহাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব হইল? উত্তর এই যে, আল্লাহর পক্ষ হইতেই তাহাদিগকে গ্রহণ করিবার ও না করিবার ইখতিয়ার দেওয়া হইয়াছিল।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন আল্লাহ পাক যথাক্রমে আসমান, যমীন ও পর্বতমালার সামনে শাস্তি ও পুরস্কারের সংবাদসহ আমানত পেশ করিয়া গ্রহণ করিবার ও না করিবার ইচ্ছা দান করিলেন তখন তাহারা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা সর্বদা আপনার অনুগত। কিন্তু যেহেতু আমাদিগকে ইচ্ছা দান করা হইয়াছে সেহেতু আমরা অক্ষমতা প্রকাশ করিতেছি। আমাদের ছাওয়াবের প্রয়োজন নাই। শাস্তি গ্রহণেরও সাহস নাই।

(মানুষ তাহা বহন করিল) তাফসীরে কুরতুবীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (আসমান, যমীন ও পর্বতমালার অস্বীকার করিবার পর) আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আসমান, যমীন ও পর্বতমালা আমার আমানত বহন করিতে অপারগতা প্রকাশ করিয়াছে। এখন তুমি কি শাস্তি ও পুরস্কারের শর্তে এই আমানত বহন করিতে রাজী আছ?

আদম (আঃ) আল্লাহর অধিকতর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের আগ্রহে আমানতের গুরুভার বহন করিলেন। ইহার পর যোহর হইতে আসর পর্যন্ত যতটুকু সময় ততটুকু সময় পার হইবার পূর্বেই শয়তান তাহাকে প্ররোচিত করিয়া নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করাইল আর তিনি জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত হইলেন।

এখন প্রশ্ন হইল যে, এত বিশাল বিশাল সৃষ্টি যেখানে অক্ষমতা প্রকাশ করিল সেইখানে দুর্বল ইনসান কেন তাহা বহন করিতে গেল?

উত্তর এই যে, মানুষের মাঝে আল্লাহ ক্রমোন্নতি লাভের একটি চাহিদা ও যোগ্যতা নিহিত রাখিয়াছেন, যাহা বিশেষ স্তরের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। তাই মানুষ আমানত গ্রহণের মাধ্যমে তাহার বর্তমান স্থান হইতে উন্নতি ও নৈকট্যের উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হইতে চাহিয়াছে। পক্ষান্তরে অন্য সকল সৃষ্টির মাঝে এই চাহিদা ও যোগ্যতা নাই। তাই তাহারা (এমন কি ফিরিশতাগণও) আল্লাহর সহিত সম্পর্কের একই স্থানে অনড়। و ما منا الا له مقام معلوم আমাদের প্রত্যেকেরই রহিয়াছে একটি নির্ধারিত স্থান।

(নিশ্চয় সে জালিম, জাহিল) জালিম এই জন্য যে, আমানত আদায় না করিয়া নিজের উপর অবিচার করিতেছে। জাহিল এই জন্য যে, অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সে উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেছে। সুতরাং বোঝা গেল যে, এই নিন্দাবাদ আমানত বহন করিবার কারণে নহে। বরং বহন করিবার পর উহা আদায় না করিবার কারণে। তদ্রূপ এই নিন্দাবাদ সকল মানুষের জন্য নহে। বরং কাফির মুনাফিক ও ফাসিক মুসলমানদের জন্য। পক্ষান্তরে নেক বান্দাদের বিষয়ে তো আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাগণের মজলিসে গর্ব করিয়া থাকেন।

কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, শব্দ দুইটি এইখানে প্রকৃত অর্থে নহে বরং আদর ও স্নেহজ্ঞাপক। সেই ক্ষেত্রে সমগ্র মানব জাতি উদ্দেশ্য হইতে পারে।

হাদীছসমূহ

২০২। মুনাফিকের আলামত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ، ﷺ، قال: «آيَةُ المنافِقِ ثَلاثٌ[৩]: إِذا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذا اؤتُمِنَ خانَ» متفق عليه[৪].

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি। যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে এবং যখন ওয়াদা করে তখন ভংগ করে এবং যখন তাহার নিকট আমানত রাখা হয় তখন সে খেয়ানত করে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

অন্য বর্ণনায় আছে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান দাবী করে।

ফায়দা ঃ

হাদীছের দুইটি অর্থ হইত পারে। প্রথমতঃ তিনটি দোষের প্রতিটি মুনাফিক হইবার স্বতন্ত্র আলামত। দ্বিতীয়তঃ তিনোটি সম্মিলিতভাবে মুনাফিক হইবার আলামত। অর্থাৎ কাহারো মাঝে একটি দুইটি দোষ পাওয়া গেলে তাহার মাঝে মুনাফিকের পূর্ণ আলামত পাওয়া গিয়াছে বলা যাইবে না। কিন্তু ছহী আবু আওয়ানার বর্ণনায় প্রথমোক্ত অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। উহাতে আছে–

علامات المنافق ثلاث *

মুনাফিকের 'আলামত সমূহ' তিনটি। (অর্থাৎ এখানে প্রতিটিকে আলাদা আলামত ধরা হইয়াছে।)

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বাহ্যত মুনাফিকের আলামত তিনটিতে সীমাবদ্ধ বোঝা যায়। অথচ অপর এক হাদীছে আছে–

اربع من كن فيه كان منافقا خالصا *

চারিটি দোষ যাহার মাঝে বিদ্যমান সে নির্ভেজাল মুনাফিক।

উভয় হাদীছের এই সংখ্যা-বৈপরীত্য সম্পর্কে আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তিনটি আলামতের কথা জানিয়াছিলেন, পরবর্তীতে অহীর মাধ্যমে তাঁহাকে চতুর্থটি সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছে। ইহাছাড়া মুসলিম শরীফে আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর অন্য একটি বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুনাফিকের আলামত তিনে সীমাবদ্ধ নহে। কেননা উহাতে আছে–

من علامات المنافق ثلاث *

তিনটি দোষ মুনাফিকের আলামত সমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বলা যায় যে, একবার তিনি কিছু আলামত বলিয়াছেন। আর একবার অপর কিছু আলামত বলিয়াছেন।

চারি আলামত সম্পর্কিত পুর্ণ হাদীছটি এই–

اربع من كن فيه كان منافقا خالصا و من كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها اذا حدث كذب و اذا عاهد غدر و اذا وعد اخلف و اذا خاصم فجر *

যাহার মাঝে চারিটি দোষ আছে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যাহার মাঝে ঐ গুলির কোন একটি বিদ্যমান তাহার মাঝে মুনাফিকির একটি আলামত বিদ্যমান, যতক্ষণ না সে উহা ত্যাগ করে। যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে এবং যখন সে চুক্তিবদ্ধ হয় তখন বিশ্বাস ভংগ করে এবং যখন সে ওয়াদা করে তখন সে ওয়াদা খেলাফি করে এবং যখন সে বিবাদ করে তখন ন্যায় হইতে বিচ্যুত হয় (এবং অশালীন কথা বলে।)

(মিথ্যা বলে) ইহা সব চাইতে ঘৃণ্য দোষ। তাই ইহাকে প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ওয়াদা ভংগ করে) প্রথমটির সম্পর্ক কথার সহিত আর দ্বিতীয়টির সম্পর্ক কর্মের সহিত। যদি ওয়াদা করিবার সময়ই উহা ভংগ করিবার নিয়ত থাকে তবেই উহা মুনাফিকের আলামত হইবে। পক্ষান্তরে ওয়াদা করিবার সময় যদি উহা পূর্ণ করিবার নিয়ত থাকে কিন্তু পরে অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে উহা রক্ষা করিতে না পারে তবে মুনাফিকের আলামত রূপে গণ্য হইবে না। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) ও অন্যান্যরা এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

(আমানত রাখা হয়) আমানত মালের হইতে পারে, কথার হইতে পারে, আবরু ইজ্জতের হইতে পারে আবার পরামর্শের হইতে পারে। অর্থাৎ তাহাকে বিশ্বাস করিয়া কোন বিষয়ে তাহার নিকট সৎ পরামর্শ চাওয়া হইল আর সে তাহাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল পরামর্শ দিল। অথচ হাদীছ শরীফে আছে–

المستشار مؤتمن *

অর্থাৎ যাহার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয় তাহার কর্তব্য আমানতদারির পরিচয় দেওয়া।

(যদিও সে রোযা রাখে) অন্য বর্ণনায় আছে–

و ان صلى و صام و حج و اعتمر و قال انى مسلم *

যদিও সে নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজ্জ করে এবং ওমরা করে আর (দাবী করিয়া) বলে যে, আমি মুসলিম।

অর্থাৎ মুমিনদের মত যাবতীয় আমল ইবাদত করিলেও এবং মুখে ইসলামের দাবী করিলেও সে মুনাফিক হইবে।

আল্লামা নববী ও আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আলিমগণ এই হাদীছটিকে অতি কঠিন ও জটিল বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। কেননা সাদামাটা ও বাহ্যিক অর্থ তো এই যে, যাহার মাঝে এই সকল দোষ পাওয়া যাইবে সে মুনাফিক রূপে চিহ্নিত হইবে, যাহা কুফুরির সমার্থক এবং যাহার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম নির্ধারিত। অথচ কোরআন হাদীছের অকাট্য দলিল প্রমাণের আলোকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, কোন পাপের কারণে– উহা যতই জঘন্য হউক– মুমিন ঈমানের গণ্ডি হইতে বাহির হয় না বরং গোনাহের শাস্তি হিসাবে যত দীর্ঘকালই সে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করুক, একদিন না একদিন আল্লাহর ফযলে

ঈমানের বরকতে জাহান্নাম হইতে সে নাজাত পাইবে। এই কারণেই ওলামায়ে কেরাম একমত যে, যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস করিবে এবং মুখে স্বীকার করিবে অতঃপর এই সকল দোষের কোন একটিতে বা সমস্তগুলিতে লিপ্ত হইবে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী মুনাফিক হইবে না। কেননা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতৃদল এই সকল কয়টি দোষেই লিপ্ত ছিল অথচ তাহাদের মুমিন হইবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই।

মোটকথা যেহেতু হাদীছটির বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নহে সেহেতু ওলামায়ে কেরাম ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন এবং ইহাই বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা যে, হাদীছের অর্থ হইল, এই সকল চরিত্র মুনাফিকের চরিত্র। সুতরাং কোন মুসলমানের মাঝে এইগুলি দেখা গেলে এই সকল ক্ষেত্রে সে মুনাফিকের সমতুল্য হইল এবং মুনাফিকের চরিত্র গ্রহণকারী হইল। কেননা 'নেফাক'-এর হাকীকত হইল ভিতরে এক রকম পোষণ করা আর বাহিরে অন্যরকম প্রকাশ করা। আর এই হাকীকত উল্লেখিত চরিত্রে বিদ্যমান আছে।

ইমাম তিরমিযি (রহঃ) আহলে ইলমের সূত্রে যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার মর্মার্থ এই যে, এখানে ইসলামের ক্ষেত্রে নেফাক উদ্দেশ্য নহে, যাহা কুফুরির সমার্থক এবং যাহার পরিণতি হইল জাহান্নামের সর্বনিম্ন তলদেশে চিরস্থায়ী বাস।

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ *

নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন তলদেশে থাকিবে।

বরং এখানে উদ্দেশ্য হইল আমলের ক্ষেত্রে নেফাক।

একদল আলিমের বক্তব্য এই যে, এখানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার মুনাফিক দল উদ্দেশ্য। কেননা তাহাদের চরিত্রে এই দোষ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। আল্লামা খাত্তাবী (রহঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই হাদীছ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার নির্দিষ্ট একজন মুনাফিক সম্পর্কেই বলা হইয়াছে। নবীজীর পবিত্র অভ্যাস এই ছিল যে, কাহারও সম্পর্কে তিনি স্পষ্টভাবে বলিতেন না যে, অমুক ব্যক্তি মুনাফিক। বরং পরোক্ষভাবে ইংগিত করিতেন।

এই অভ্যাসগুলি তখন মুনাফিকদের মাঝেই শুধু ছিল। সকল ছাহাবা (রাঃ) এইগুলি হইতে পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তাহারা এই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইলেন। তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন।

مـا لكم و لهن انما خـصـصت بهـن المنافـقين، انهم من ذلك براء * (ذكر الحديث بطوله القاضى عياض)

এইগুলির সহিত তোমাদের কি সম্পর্ক! এইগুলিকে তো মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য রূপে সাব্যস্ত করা হইয়াছে। তোমরা এইগুলি হইতে মুক্ত।

কিন্তু পরবর্তী যুগে যেহেতু মুসলমানদের মাঝেও ইহার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে সেহেতু এখন ইহা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য নহে।

খাত্তাবী কোন কোন আলিমের বক্তব্য বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীছের উদ্দেশ্য হইল মুসলমানদিগকে হুঁশিয়ার করা যেন তাহারা এই সকল ঘৃণ্য দোষ হইতে আপনাদিগকে সর্বোতভাবে মুক্ত রাখে। কেননা এই গুলি ক্রমান্বয়ে অভ্যাসে পরিণত হইয়া এক সময় আসল নেফাক পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়, যাহার পরিণতি হইল চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

(নির্ভেজাল মুনাফিক) অর্থাৎ মুনাফিকদের সহিত অতিমাত্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ।

হাদীছের শিক্ষা ঃ প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হইল এই হাদীছের আলোকে নিজ নিজ অবস্থা যাচাই করিয়া দেখা এবং রক্তের অশ্রু বর্ষণ করিয়া নিজেদের অবস্থার উপর শোক প্রকাশ করা এবং আল্লাহ তাওফিক দিলে অতীত জীবনের উপর তাওবা করিয়া ভবিষ্যত জীবনের জন্য সতর্ক হওয়া এবং হাদীছে বর্ণিত মুনাফিকের আলামতগুলি হইতে পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাকা। আল্লাহ না করুন মুনাফিক অবস্থায় যেন কাহারো মৃত্যু না হয়।

২০৩। আমানত উঠিয়া যাওয়া

وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمانِ. رضي الله عنه، قال: حَدَّثَنا رَسولُ اللهِ ﷺ، حَديثَيْنِ قدْ رايتُ اَحَدَهُما، وَانا اَنْتَظِرُ الآخرَ: حَدَّثنا أن الأمانَةَ نَزَلَتْ في جَذْرِ قُلوبِ الرجالِ، ثُمَّ نَزَلَ القرانُ فَعَلِمُوا مِنَ القُرانِ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ، ثم حَدَّثَنا عَنْ رَفْعِ الأمَانَةِ فَقالَ: «يَنامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتقْبَضُ الأَمانَةُ مِنْ قَلْبِه، فَيَظَلُّ اَثَرُها مِثْلُ الوَكَتِ، ثُمَّ يَنام النَّومةَ فَتُقْبَضُ الأَمانَةُ مِنْ قَلْبِه، فَيَظَلُّ اَثَرُها مِثْلَ اَثَرِ المَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَه عَلٰى رِجْلِكَ، فَنَفِطَ فَتَراه مُنْتَبِرًا وَليس فيه شَيْءٌ» ثم اَخَذَ حَصاةً فَدَحْرَجَه على رِجْلِه «فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبايَعُونَ، يَكادُ اَحَدٌ يُؤَدِّي الأمانَةَ حتّٰى يقالَ: اِنَّ في بَنِي فُلانٍ رَجُلاً امينًا، حتّٰى يُقالَ للرجلِ: ما اَجْلَدَه مَا اَظْرَفَه، مَا اَعْقَلَه، وَما في قَلْبِه مِثْقالُ حَبَّةٍ مِن خَرْدَلٍ مِنْ ايمانٍ. وَلَقَدْ اَتٰى عَلَيَّ زَمانٌ وَما اُبالِيْ اَيُّكُمْ بايَعْتُ؛ لَئِنْ كانَ مُسلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دينُه، وَلئِنْ كانَ نَصْرانِيًّا اَوْيَهُودِيًّا لَيَرُدَّنَّه عَلَيَّ سَاعِيْه، وَاَمَّا اليومَ فَما كُنْتُ اُبايِعُ مِنكم إلاَّ فُلَانًا وَفلانًا» متفق عليه.

হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে দুইটি হাদীছ বলিয়াছিলেন। দুইটির একটি আমি দেখিতে পাইয়াছি। এখন দ্বিতীয়টির অপেক্ষা করিতেছি। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, 'আমানত' লোকদের অন্তরের অন্তস্থলে প্রবিষ্ট হইল। অতঃপর কোরআন নাযিল হইল। অতঃপর তাহারা কোরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে আমানত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিল।

অতঃপর তিনি আমাদিগকে (দুনিয়া হইতে) আমানত উঠাইয়া লওয়া সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন, মানুষ স্বাভাবিক (নিয়মে) একটা ঘুম দিবে। তখন তাহার অন্তর হইতে আমানত উঠাইয়া লওয়া হইবে। শুধু একটা হালকা ছাপ বিদ্যমান থাকিবে। অতঃপর (দ্বিতীয়বারের মত) ঘুম যাইবে। তখন (অবশিষ্ট) আমানতটুকুও অন্তর হইতে উঠাইয়া লওয়া হইবে এবং উহার চিহ্ন ফোস্কার চিহ্নের মত বিদ্যমান থাকিবে। যেমন তুমি

তোমার পায়ের উপর একটি স্ফুলিংগ রাখিলে। ফলে তাহাতে ফোস্কা পড়িল। বাহ্যত তুমি উহাকে ফোলা দেখিতে পাইবে। অথচ উহাতে কিছুই নাই।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কংকর লইয়া উহাকে নিজের পায়ের উপর গড়াইয়া দিলেন।

অতঃপর মানুষ সকালে উঠিয়া ক্রয় বিক্রয় করিবে। কিন্তু কেহ আমানত আদায় করিবার ধারে কাছেও যাইবে না। এমন কি বলা হইবে যে, অমুক গোত্রে একজন আমানতদার লোক আছে। এমন কি এক জন লোক সম্পর্কে বলা হইবে যে, সে (কাজে কর্মে) কত না দৃঢ়, চৌকশ ও বিচক্ষণ! অথচ তাহার অন্তরে সরিষার দানার পরিমান ইমানও থাকিবে না।

আমার উপর দিয়া এমন একটা সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে যখন আমি ভাবিয়া দেখিতাম না যে, তোমাদের কাহার সহিত বিক্রয়চুক্তি করিতেছি। কেননা সে মুসলমান হইলে তাহার দ্বিন আমাকে আমার হক (ও প্রাপ্য) প্রদান করিবে। আর যদি ইহুদী বা খৃষ্টান হয় তবে তাহার তত্ত্বাবধায়ক আমার হক আমাকে প্রদান করিবে। অথচ আজ আমি তোমাদের মধ্য হইতে অমুক অমুক ছাড়া অন্য কাহারো সহিত বেচাকিনা করিব না। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(আমাদিগকে দুইটি হাদীছ বলিয়াছেন) অর্থাৎ আমানত সম্পর্কে দুইটি হাদীছ বলিয়াছেন। সামগ্রিকভাবে শুধু মাত্র দুইটি হাদীছ বলা উদ্দেশ্য নহে। কেননা হযরত হোযায়ফা (রাঃ) হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম হাদীছটি হইল 'আমানত'-এর অবতরণ সংক্রান্ত আর দ্বিতীয়টি হইল আমানত উঠাইয়া লওয়া সংক্রান্ত।

'আমানত' এর অর্থ বাহ্যতঃ আল্লাহর পক্ষ হইতে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের দায়িত্ব আরোপ, যাহা আল্লাহ্ পাক আসমান-যমীন ও পর্বতমালার নিকট পেশ করিয়াছিলেন। আর তাহারা সভয়ে উহা বহনে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিল। অতঃপর মানুষ উহা বহন করিয়াছে। التحرير। কিতাবের লেখক বলেন, আলোচ্য হাদীছে কথিত আমানত এবং আল-কোরআনের আয়াত انا عرضنا الامانة এ কথিত আমানত অভিন্ন। মূলতঃ ইহাই হইল দ্বীন ও ইমান। ইহা যখন বান্দার অন্তরে দৃঢ়মূল হয় তখনই সে শরীয়তের যাবতীয় আহকাম ও বিধান পালনে উদ্বুদ্ধ হয়।

(আমানত লোকদের অন্তরের অন্তস্থলে প্রবিষ্ট হইল) হাদীছের অর্থ এই যে, আমানত সম্পর্কিত জ্ঞান ও বোধ মানুষের অন্তরে স্বভাবগতভাবেই সৃষ্টি হইল, অতঃপর কোরআন ও সুন্নাহ হইতেও আমানত সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জিত হইল। কোরআন দ্বারা انا عرضنا الامانة على السموت و الارض উদ্দেশ্য, আর সুন্নাহ দ্বারা আলোচ্য হাদীছ উদ্দেশ্য। (তাহার অন্তর হইতে আমানত) উঠাইয়া লইবার কারণ তাহারই বদ আমল। কেননা আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم *

আল্লাহ্ কোন কাওমের (ভাল বা মন্দ) অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তাহারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।

ইহারও সম্ভাবনা আছে যে, পৃথিবীতে আমানতের অবস্থানের যে সময়কাল আল্লাহর ইলমের মধ্যে ছিল তাহা পূর্ণ হইবার কারণে উহা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

(অথচ উহাতে কিছুই নাই) হাদীছের অর্থ এই যে, মানুষের অন্তর হইতে আমানত পর্যায়ক্রমে উঠাইয়া লওয়া হইবে। যখন আমনতের প্রথম অংশ উঠিয়া যাইবে তখন উহার নূর চলিয়া যাইবে এবং হালকা ছায়ার মত একটা অন্ধকার উহার স্থান গ্রহণ করিবে। যখন আমানতের আরও কিছু অংশ উঠিয়া যাইবে তখন ফোস্‌কার চিহ্নের মত গভীর চিহ্ন দেখা দিবে যাহা সহজে দূর হইবে না। এই অন্ধকার পূর্ববর্তী অন্ধকারের চাইতে গভীর হইবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমানতের নূর অন্তরে পয়দা হইবার পর উহা চলিয়া যাওয়া এবং অন্ধকার রাখিয়া যাওয়াকে পায়ের উপর গড়াইয়া পড়া জ্বলন্ত অংগারের সহিত তুলনা করিয়াছেন যাহা পায়ে দাগ সৃষ্টি করে। অতঃপর ঐ অংগার তো পড়িয়া যায় কিন্তু ফোস্‌কা থাকিয়া যায়। বিবরণটিকে অধিক স্পষ্ট করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কংকর লইয়া আপন পায়ের উপর গড়াইয়া দিলেন। (আল্লাহ অধিক জানেন।)

(অমুক গোত্রে) অর্থাৎ আমানতদার লোকের অস্তিত্ব খুবই বিরল হইবে। বিদগ্ধ পাঠক! চিন্তা করিয়া দেখুন, হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত সেই ভয়ংকর সময় এখন আসিয়া পড়িয়াছে কি না। পুরা মহল্লায় বা পুরা বস্তিতে একজন দুইজন আমানতদার লোক তালাশ করিলেও কি এখন আর পাওয়া যায়? এখন তো বরং অবস্থা এমন হইয়াছে যে, পাওনা টাকা চাহিতে গিওয়াও মানুষ খুন হইতেছে। এমতাবস্থায় কিভাবে আমরা আল্লাহর রহমত ও শান্তি আশা করিতে পারি?

(সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও নাই) আমানত থাকা তো দূরের কথা। কেননা আমানতদারি তো হইল ঈমানের একটি শাখা। সুতরাং ঈমান না থাকিলে আমানতদারি থাকিবার তো প্রশ্নই আসে না। ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে, তখন ঈমানদারি ও আমানতদারির পরিবর্তে চালাকি ও ধূর্ততাকেই মানুষের প্রশংসার বিষয় মনে করা হইবে।

(ভাবিয়া দেখিতাম যে,) কেননা আমার জানা ছিল যে, মানুষের অন্তর হইতে আমানত উঠিয়া যায় নাই। সুতরাং পূর্ণ আস্থার সহিত যে কাহারও সহিত লেনদেন করিতে পারিতাম। কেননা মুসলমান হইলে সে নিজেই তাহার দ্বীনদারির কারণে হকদারকে তাহার হক বুঝাইয়া দিত। আর অমুসলমান হইলে শাসকের ভয়ে সে নিজেই হক আদায় করিত। কিংবা শাসক তাহার নিকট হইতে হক উদ্ধার করিয়া দিত।

আল্লামা কিরমানী (রহঃ) বলেন, প্রশ্ন হইতে পারে যে, আমানত উঠিয়া যাইবার বিষয়টি যদি ছাহাবা কেরামের যামানাতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে তবে হযরত হোযায়ফা (রাঃ)-এর এই কথা বলিবার কি অর্থ যে, আমি দ্বিতীয়টির (অর্থাৎ আমানত উঠিয়া যাইবার) অপেক্ষা করিতেছি? উত্তর এই যে, অপেক্ষা করিবার অর্থ আমানত এমনভাবে উঠিয়া যাইবার অপেক্ষা করা যাহাতে অমুক অমুক বলিয়া ব্যতিক্রম দেখাইবার মত লোকও থাকিবে না। তদুপরি

আমানত উঠিয়া যাইবারও বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। হযরত হোযায়ফা (রাঃ) যেহেতু পূর্ববর্তী অবস্থার সহিত পরবর্তীদের অবস্থার তুলনা করিয়াছেন সেহেতু তাহার এই রূপ মনে হইয়াছে।

২০৪। হাশরের মাঠের হালত

وَعَنْ حُذَيْفَةَ، وَابي هريرةَ، رضي الله عنهما، قالا : قال رسولُ الله، ﷺ :

«يَجْمَعُ اللهُ ، تَبَارَكَ وتَعالى، الناسَ فيقومُ المؤمنون حَتّى تَزلفَ لهم الجَنَّةُ ، فَيَأتُونَ آدمَ، صلوات الله عليه، فيقولون: يَا اَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنا الجَنَّةَ، فيقول: وَهَلْ اَخْرَجَكُمْ مِنَ الجَنَّةِ اِلَّا خَطِيْئَةُ اَبِيْكُمْ! لستُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ، اِذْهَبوا الى ابْني اِبْراهِيْمَ خليلِ اللهِ ، قال: فَيَأتُونَ ابراهيمَ، فيقول ابراهيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اِنَّما كنتُ خَليلاً مِنْ وَراءَ وَراءَ، اِعْمِدُوا الى مُوْسَى الَّذِي كَلَّمَه اللهُ تَكْلِيمًا، فَيَاتُون مُوسٰى، فيقول: لستُ بصاحِبِ ذلكَ؛ اِذهَبوا الى عِيسٰى كَلِمَةِ اللهِ وَرُوْحِهِ . فيقول عِيسٰى: لستُ بِصاحب ذٰلك. فَياتونَ مُحَمَّدًا، ﷺ، فَيقومُ فَيُؤْذَنُ له، وَتُرْسَلُ الامَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيَقُومانِ جَنْبَتَيِ الصِّراطِ يَمِيْنًا وَشِمالاً، فَيَمُرُّ اَوَّلُكُم كَالبَرْقِ» قلتُ: بِاَبِي وَاُمِّي، اَيُّ شَيْءٍ اَكَمَرِّ الْبَرْقِ؟ قال: «اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ في طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمَرِّ الريح، ثم كَمَرِّ الطيرِ، وَشَدِّ الرِّجالِ تَجْرِي بِهِمْ اَعْمالُهم، وَنَبِيُّكم قائِمٌ على الصراطِ يقول: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتّى تَعْجِزَ اَعْمالُ العِبادِ، حَتّى يَجِيْءَ الرجلُ لا يَسْتَطِيعُ السيرَ اِلا زَحْفًا، وَفِي حَافَتَيِ الصِّراطِ كَلالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأمُورَةٌ بِاَخْذِ مَنْ اُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ ناجٍ ، وَمُكَرْدَسٌ في النارِ» وَالذي نَفْسُ ابي هريرةَ بِيَدِهِ اِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا . رواه مسلم .

হযরত হোযায়ফা ও আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা (পুনরুত্থানের পর) মানুষকে (হাশরের মাঠে) একত্র করিবেন। তখন মুমিনগণ উঠিয়া দাঁড়াইবে। এমন কি জান্নাতকে তাহাদের জন্য নিকটবর্তী করা হইবে। তখন তাহারা আদম (আঃ)-এর নিকট গিয়া আরয করিবে, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) জান্নাত খুলিয়া দিবার দরখাস্ত করুন। তিনি বলিবেন, তোমাদের পিতার গোনাহ্-ই তো তোমাদিগকে জান্নাত হইতে বহিষ্কার করিয়াছে। আমি এই সম্মানের উপযুক্ত নহি। তোমরা আমার পুত্র ইবরাহীম খালীলুল্লাহর নিকট যাও। তখন ইবরাহীম (আঃ) বলিবেন, আমি এই সম্মানের উপযুক্ত নহি। আমি তো খলীল (ও বন্ধু) ছিলাম আড়াল আড়াল হইতে। তোমরা বরং মূসা (আঃ)-এর নিকট যাও, যিনি আল্লাহর সহিত 'কালাম' করিয়াছেন। তখন সকলে মূসা (আঃ) এর নিকট হাযির হইবে। আর তিনি বলিবেন, আমি এই সম্মানের উপযুক্ত নহি। তোমরা আল্লাহর কালিমা ও রূহ ঈসা (আঃ)-এর নিকট যাও, কিন্তু ঈসা (আঃ) বলিবেন, আমি এই সম্মানের উপযুক্ত নহি। তখন তাহারা মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

নিকট হাযির হইবে। তখন তিনি দাঁড়াইবেন। আর তাঁহাকে (শাফা'আত করিবার) অনুমতি দান করা হইবে। আর আমানত ও আত্মীয়তাকে (অবয়ব দান করিয়া) পাঠানো হইবে। তাহারা (উভয়ে) পোলছিরাতের ডানে ও বামে দাঁড়াইবে। তখন তোমাদের প্রথম দলটি বিদ্যুৎবেগে (পোলছিরাত) পার হইয়া যাইবে। আমি বলিলাম, (হে আল্লাহর রাসূল!) আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত। বিদ্যুৎ বেগের কি অর্থ? তিনি বলিলেন, তোমরা কি বিদ্যুৎ দেখ নাই, কিভাবে উহা চক্ষের পলকে যায় আসে? অতঃপর পর্যায়ক্রমে পরবর্তী দলগুলি (যথাক্রমে) বাতাসের গতিতে, অতঃপর পাখীর গতিতে এবং দ্রুততম দৌড়ের গতিতে (পোলছিরাত পার হইবে।) মানুষের আমল সমূহ তাহাদিগকে (বিভিন্ন গতিতে) অতিক্রম করাইবে। আর তোমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উম্মতের প্রতি অশেষ দয়া, স্নেহ ও উৎকণ্ঠার কারণে) দাঁড়াইয়া বলিতে থাকিবেন, হে আমার প্রতিপালক! (আমার উম্মতকে) নিরাপদ রাখুন। নিরাপদ রাখুন। এমন কি এক সময় বান্দাদের আমল সমূহ অক্ষম হইয়া পড়িবে। এমন কি একদল লোক আসিবে যাহারা চলিতেই পারিবে না তবে বসা অবস্থায় হেঁচড়াইয়া (চলিবে)। পোলছিরাতের উভয় পার্শ্বে কিছু লোহার আঁকড়া থাকিবে। এইগুলি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হইবে যাহাকে ধরিবার হুকুম তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। ফলে একদল আঁচড় খাইয়া নাজাতপ্রাপ্ত হইবে। আর অন্যদল দলামোচড়া হইয়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

ঐ যাতের কসম! যাঁহার (কুদরতি) হাতে আবু হোরায়রার জান! নিঃসন্দেহে জাহান্নামের তলদেশের দূরত্ব সত্তর বৎসরের পথ। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(মুমিনগণ উঠিয়া দাঁড়াইবে।) অর্থাৎ কাফিররা সেইখানে থাকিবে না। তবে মুনাফিকদের থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দুনিয়াতে যেমন মুনাফিকরা মুমিনদের সহিত মিশিয়া ছিল হাশরের মাঠেও হয়ত তেমনি থাকিবে। কিন্তু পোলছিরাত পার হইবার সময় তাহারা আটকা পড়িয়া যাইবে।

(তোমাদের পিতার গোনাহ্) আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী নবী ও রাসূলগণ সর্বপ্রকার কাবীরা ও ছাগীরা গোনাহ হইতে পবিত্র। কাবীরা গোনাহ তো ইচ্ছা অনিচ্ছা বা ভুলবশতঃ কোন রূপেই হইতে পারে না। তদ্রূপ এমন ছাগীরা গোনাহ্ও হইতে পারে না যাহা মর্যাদাহানিকর। পক্ষান্তরে অতি সাধারণ ছাগীরা সম্পর্কে কেহ্ কেহ্ বলেন যে, অনিচ্ছা ও ভুলবশতঃ তাহা হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু উহার উপর আল্লাহ্ পাক তাঁহাদিগকে স্থির রাখেন না বরং সতর্ক করিয়া উহা হইতে তাঁহাদিগকে সরাইয়া আনেন। তবে গবেষক আলিমগণের এক জামা'আত বলেন, কবীরা ও মর্যাদাহানিকর ছাগীরাহ হইতে তাঁহারা যেমন পবিত্র ও নিষ্পাপ তেমনি সাধারণ ছাগীরা হইতেও তাঁহারা মুক্ত।

নবী ও রাসূলগণের ইছমত ও নিষ্পাপতা কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সুপ্রমাণিত। ইহাছাড়া নবুওয়াতের মর্যাদা ও যোগ্যতা এবং দ্বীন ও শরীয়তের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রামাণ্যতার জন্যও ইহা অপরিহার্য। কেননা সাধারণ হইতে সাধারণ গোনাহও তাঁহাদের দ্বারা সংঘটিত

হইবার সম্ভাবনা যদি থাকে তবে তাঁহাদের উপর অবতীর্ণ শরীয়তের উপর আস্থা অটুট রাখিবার উপায় থাকে না তাঁহাদের ইক্তিদা ও অনুসরণের বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ হইয়া পড়ে। সুতরাং যেই সমস্ত আয়াত বা হাদীছের বাহ্য অর্থ দ্বারা নবী রাসূলগণের ইছমতের বিপরীত বিষয় অর্থাৎ গোনাহ্ হওয়া সাব্যস্ত হয় ওলামায়ে কেরাম সেইগুলির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। যেমন ধরুন হযরত আদম (আঃ)-এর নিষিদ্ধ ফল খাইবার ঘটনা যাহার প্রতি আলোচ্য হাদীছে ইংগিত করা হইয়াছে।

এই সম্পর্কে কোরআনে দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রথমে বলা হইয়াছে–

وَ لَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ *

ইতিপূর্বে আদমকে আমি একটি নির্দেশ দিলাম কিন্তু তিনি ভুলিয়া গেলেন।

পরে বলা হইয়াছে–

و عصى آدم ربه فغوى *

আদম তাহার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করিলেন। ফলে তিনি পথচ্যুত হইলেন।

نسى ক্রিয়াটি نيسان ধাতুমূল হইতে নির্গত। ইহার অর্থ ভুলিয়া যাওয়া আর ইহা সতঃসিদ্ধ যে, ভুলিয়া যাওয়া গোনাহ্ বা অবাধ্যতা নহে। তবে হযরত আদম (আঃ)-এর অত্যুচ্চ মর্যাদার ও অতি নৈকট্যের কারণে তিরস্কার স্বরূপ ইহাকেই عصى ও غوى বা অবাধ্যততা ও বিচ্যুতি বলা হইয়াছে এবং তিনি নিজেও ইহাকে خطيئة বা গোনাহ্ বলিয়াছেন।

কতিপয় আধুনিক বুদ্ধিজীবী লেখক তাহাদের লেখায় ইছমাতুল আম্বিয়া প্রসংগে মারাত্মক গোমরাহী ছড়াইয়াছেন। বিষয়টি আকীদার সহিত সম্পৃক্ত। সুতরাং সকলের কর্তব্য এই সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ও বিশ্বাসের ইলম হাছিল করিয়া উহার উপর অবিচল থাকা।

(আমি এই সম্মানের উপযুক্ত নহি) কাযী ইয়ায (রহঃ) বলেন, হযরত আদম (আঃ) ও অন্যান্য নবী বিনয়ের কারণে এবং প্রার্থিত বিষয়ের প্রতি সমীহের কারণে এই কথা বলিবেন। সম্ভবতঃ এই দিকেও ইংগিত রহিয়াছে যে, এই মহাসম্মান তাঁহাদের জন্য নহে বরং ইহার জন্য আল্লাহ তা'আলা মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাই একজন অপরজনকে দেখাইয়া দিবেন। এইভাবে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাবরে বিষয়টি পেশ হইবে। আল্লাহ্ পাক উক্ত সুফারিশের প্রার্থনা আদম (আঃ)-এর সামনে পেশ করিবার ধারণা মানুষের অন্তরে ইলহাম করিবেন, আর তিনি ও পরবর্তী সকল নবী অপারগতা প্রকাশ করিবেন। ইহার হিকমত হইল; সকল নবী রাসূলের উপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মুমিনগণের উপর তাঁহার অনুগ্রহের অশেষতা প্রমাণ করা। কেননা মানুষ প্রথমেই তাঁহার নিকট আসিলে এবং প্রথমবারেই তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে বোঝা যাইত না যে, এই মর্যাদা অন্য কোন নবীর অধিকারে ছিল না এবং তাঁহার সুফারিশ ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করা মুমিনগণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ এখন বিষয় দুইটি পরিষ্কার হইয়া গেল।

(আমি তো খলীল ছিলাম আড়াল হইতে) হাদীছের শব্দ হইল وَرَاءَ وَرَاءَ -শব্দ হিসাবে وَرَاءَ -এর অর্থ হইল পিছনে, আড়ালে। আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, ইহার মতলব হইল, আমি ঐ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নহি। মূলতঃ বিনয় প্রকাশের জন্য শব্দটি বলা হয়। التحرير। কিতাবের লেখক বলেন, (আল্লামা নববী তাঁহার মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইহা নকল করিয়াছেন) এই বিষয়ে একটি অনবদ্য ভাবার্থ আমার অন্তরে উদিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই কথা দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্ভবতঃ ইহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, যাবতীয় মর্যাদা আমাকে জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যম দান করা হইয়াছে। সুতরাং তোমরা মুসা (আঃ)-এর নিকট যাও। কেননা তিনি আল্লাহর সহিত বিনা মাধ্যমে কথা বলিয়াছেন। সুতরাং তাহার মর্যাদা সরাসরি বিনা মাধ্যমে লব্ধ। পক্ষান্তরে আমার মর্যাদা আড়াল হইতে মাধ্যম দ্বারা লব্ধ। আর وَرَاءَ শব্দটি পুনরুক্ত করিবার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, (মেরাজ রজনীতে) রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি কথোপকথনের মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। আবার দর্শন সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছেন। তাই ইবরাহীম (আঃ) বলিলেন যে, আমি মুসা (আঃ)-এর পিছনে আর তিনি মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে। অর্থাৎ আমি ইবরাহীম খলীলুল্লাহ হইলেও আল্লাহর সহিত আমার দুইটি আড়াল রহিয়াছে। আর মুসা কালীমুল্লাহর সহিত আল্লাহর একটি আড়াল রহিয়াছে। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আল্লাহর কোন আড়াল নাই।

(আল্লাহর কালিমা) কালিমা অর্থ- শব্দ, বাক্য। হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর কালিমা বলিবার কারণ এই যে, তিনি كُـنْ دون اب (পিতা ছাড়া জন্ম হও) আল্লাহ্ পাকের এই বাক্যাদেশ দ্বারা মাতৃগর্ভে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছেন।

আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, এই হিসাবে তাঁহাকে কালিমাতুল্লাহ বলা হয় যে, মানব জাতির সামনে তিনি আল্লাহর কুদরতের প্রমাণ ও হুজ্জত। কেননা তিনি তাহাকে পিতা ছাড়া অস্তিত্ব দান করিয়াছেন এবং শৈশবে দোলনায় বাকশক্তি দান করিয়াছেন এবং তাঁহার হাতে মৃতকে জীবন দান করিয়াছেন।

(তাঁহার রূহ) রূহ শব্দের সাধারণ অর্থ প্রাণ। কিন্তু ইহার হাকীকত আল্লাহ পাকই জানেন। এই সম্পর্কে ইহুদীদের পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা রূপে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। ইহার উত্তরে এই আয়াত নাযিল হইয়াছিল–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ *

তাহারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ বিশেষ।

'রূহ'-এর হাকীকত বোঝা যেহেতু মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। জরুরীও নহে সেহেতু আল্লাহর পক্ষ হইতে রূহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানটুকুই শুধু দান করা হইয়াছে। অর্থাৎ রূহ শরীরের মত পদার্থযোগে সৃষ্ট নহে বরং উহা আল্লাহর كن (হও) আদেশ দ্বারা সৃষ্ট, এখন প্রশ্ন হইল হযরত ঈসা (আঃ)-কে রূহুল্লাহ বা আল্লাহর রূহ বলা হইল কিভাবে? ইহার বিভিন্ন উত্তর ওলামায়ে কেরাম দিয়াছেন। তবে সর্বোত্তম কথা এই যে, আল্লাহ পাকই ইহার রহস্য ভাল জানেন।

কেহ কেহ বলেন, রূহুল্লাহ বলিবার কারণ এই যে, তিনি আল্লাহর আদেশে মৃতদের মাঝে প্রাণ বা রূহ দান করিতেন। কেহ কেহ বলেন, কারণ এই যে, তাহার প্রাণ স্বভাব নিয়মে বীর্যনির্ভর নহে। বরং সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হইতে বিনা মাধ্যমে আগত।

(তখন ঈসা বলিবেন) পূর্ববর্তী 'ক্বারীনাহ' বা আভাস বিদ্যমান থাকিবার কারণে এইখানে কিছু কথা উহ্য রাখা হইয়াছে। পুরা কথা এইরূপ। "তখন তাহারা ঈসা (আঃ)-এর নিকট আসিবে। আর ঈসা (আঃ) বলিবেন, আমি এ মর্যাদার উপযুক্ত নহি। কেননা আমার কাওম আমাকে ও আমার আম্মাকে ইলাহ (বা মাবুদ) রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। সেই লজ্জায় আমি জড়োসড়ো আছি। তোমরা বরং মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। কেননা তিনি খাতামুন্নাবিয়্যীন। আর তাঁহার নাম হইল–

الشفيع المشفع

(সুফারিশকারী ও সুফারিশ মঞ্জুরকৃত ব্যক্তি।)

(আমানত ও আত্মীয়তাকে) আমানত রক্ষা করাকে ঈমানের পূর্ণতার আলামত বলা হইয়াছে–

لا دين لمن لا امانة له *

যাহার আমানতদারি নাই তাহার দ্বীন নাই।

তদ্রূপ আমানত রক্ষা না করাকে মুনাফিকের আলামত বলা হইয়াছে–

و اذا اوتمن خان *

যখন তাহার নিকট আমানত রাখা হয় তখন সে খিয়ানত করে।

তদ্রূপ আত্মীয়তার হক সমূহ আদায় করিবার প্রতি জোর তাকিদ শরীয়তে আসিয়াছে–

اطعم الطعام و صل الارحام *

(ক্ষুধার্তকে) আহার দান কর এবং আত্মীয়তার হক আদায় কর।

من وصلها وصلته و من قطعها قطعته *

যে আত্মীয়তা রক্ষা করিবে আমি তাহাকে রক্ষা করিব এবং যে আত্মীয়তা কর্তন করিবে আমি তাহাকে কর্তন করিব।

لا يدخل الجنة قاطع يعنى قاطع رحم *

কোন আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, আমানত ও আত্মীয়তা রক্ষার মহামর্যাদা ও গুরুত্ব প্রকাশের জন্য এই দুইটি বিষয়কে আল্লাহ পাক তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী অবয়ব দান করিবেন এবং পোলছিরাতের ইহাদেরকে দুই পার্শ্বে স্থাপন করিবেন, যাহাতে এই দুই হুকুম রক্ষাকারীকে ইহারা সাহায্য করিতে পারে এবং এই দুই হুকুম নষ্টকারীর নিকট হইতে উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে পারে। (উপযুক্ত প্রতিশোধ অর্থ পোলছিরাত পার হইতে না দেওয়া)

(তাহাদের আমল সমূহ তাহাদিগকে) ইহা পূর্ববর্তী বক্তব্যের খোলাসা। অর্থাৎ দুনিয়াতে যে যত বেশি নেক আমল করিয়াছে সে তত দ্রুতগতিতে পোলছিরাত পার হইবে। তদ্রূপ যাহার আমল যত কম হইবে তাহার গতিও তত কম হইবে। এমন কি যাহার আমল একেবারেই কম হইবে সে সোজা হইয়া হাঁটিতেও পারিবে না। বরং বসিয়া হেঁচড়াইয়া চলিতে থাকিবে।

(আর তোমাদের নবী) উম্মতের প্রতি অশেষ দরদী হইবার কারণে পোলছিরাতে দাঁড়াইয়া দু'আ করিতে থাকিবেন যেন উম্মত নিরাপদে পার হইয়া যাইতে পারে এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া উম্মতের অন্তরে ভয়ভীতির পরিবর্তে আশা ও হিম্মত সঞ্চারিত হয় এবং তাঁহার উপস্থিতির বরকতে উম্মতের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হয় এবং উম্মতের উপর হইতে বিপদাপদ দূরীভূত হয়।

আলোচ্য অধ্যায়ের সহিত হাদীছটির সাযুজ্য এই যে, ইহাতে আমানতের গুরুত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। কেননা আমানত পোলছিরাতে দাঁড়ানো থাকিবে (এবং আমানত উহার রক্ষাকারীকে পোলছিরাত পার হইতে সাহায্য করিবে। পক্ষান্তরে আমানত ভংগকারীর পথ সে রোধ করিয়া দাঁড়াইবে।

(পোলছিরাত) পোলছিরাত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, জাহান্নামের উপর একটি রাস্তা হইবে যাহা চুলের চাইতে সূক্ষ্ম এবং তলোয়ারের চাইতে ধারালো। উহার উপর দিয়া পার হইয়া মুমিনগণকে জান্নাতে যাইতে হইবে। উহার দুই পার্শ্বে লোহার কাঁটা থাকিবে। (কসাই গোশত ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য যেমন লোহার কাঁটা ব্যবহার করে তেমন) ঐ কাঁটা নাফরমানদিগকে ধরিয়া ধরিয়া জাহান্নামে ফেলিয়া দিবে। কিছু মুসলমানকে ঐ কাঁটা আটকাইয়া ধরিতে চাহিবে। কিন্তু তাহারা (বিভিন্ন নেক আমলের কারণে) উহার কব্জা হইতে ছুটিয়া যাইবে। সুতরাং শরীরে বিভিন্ন রকম আঁচড় লাগিলেও জাহান্নামে পড়িয়া যাওয়া হইতে বাঁচিয়া যাইবে। –(সত্তর বৎসর) (মুসলিম শরীফ, জান্নাত প্রসংগ)

২০৫। ছাহাবা কেরামের ঋণ পরিশোধের চিন্তা এবং আল্লাহর মদদ

وَعَنْ اَبِي خُبَيبٍ ـ بضم الخاء المعجمة ـ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، رضي الله عنهما، قال: لَمَّا وَقَفَ الزبيرَ يومَ الْجَمَلِ دَعانِي فقُمْتُ الى جَنْبه، فقالَ: يا بُنَيَّ اِنَّه لا يُقْتَلُ اليومَ اِلاَّ ظالِمٌ اَوْمَظْلومٌ ، وَاِني لا اَراني اِلاَّ سَاُقْتَلُ اليومَ مَظْلومًا، وَاِنَّ مِنْ اَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْني ، اَفترَىٰ دَيْنَنا يُبْقِي مِنْ مَالِنا شيئًا؟ ثم قال؟ يا بُنَيَّ بِعْ مَالَنا وَاقْضِ دَيْنِيْ، وَاَوْصٰى بِالثُّلُثِ، وَثُلُثُه لِبَنِيه، يَعني لِبَني عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبيرِ ثُلُثُ الثلثِ. قال: فَاِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنا بَعْدَ قَضاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَثُلُثُه لِبَنيك، قال هشام: وَكان بعضُ ولدِ عَبْدِ اللّٰه قد وَازٰى بَعْضَ بَنِي الزُّبيرِ خُبيبٍ وَعبادٍ، وَله يَوْمَئذٍ تِسعةُ بَنِيْنَ وتِسعُ بَناتٍ. قال عبدُ اللّٰهِ، فَجَعلَ يُوْصِيْني بِدَيْنِه ويقول: يا بُنَيَّ اِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ منه فَاسْتَعِنْ عليه بِمَوْلايَ. قال: فَوَاللّٰهِ ما دَرَيْتُ مَا ارادَ حَتّٰى قلتُ: يَا اَبتِ مَنْ مَوْلاكَ؟ قال: اللّٰهُ. قال: فَواللّٰهِ ما وَقَعْتُ في كَرْبَةٍ مِنْ دَيْنِه اِلاَّ قلت: يا مَوْلَى الزبيرِ اِقْضِ عنه دَيْنَه، فَيَقْضِيه. قال: فَقُتِلَ الزبيرُ وَلَمْ يَدَعْ دينارًا ولا دِرْهَمًا

اِلاَّ اَرْضِيْنَ، منها الغابَةُ وَاِحْدٰى عَشْرَةَ دارًا بالمدينةِ، وَدارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، وَدارًا بالكُوْفَةِ وَدارًا بِمِصْرَ. قال: وَاِنَّما كانَ دَيْنُه الذي كانَ عليه اَنَّ الرجُلَ كان يَاتيه بِالْمَالِ، فيَسْتَوْدِعُه اِيَّاه، فيقول الزبيرُ: لا وَلٰكِنْ هو سَلَفٌ اِنِّي اَخْشٰى عليه الضَّيْعَةَ. وَما وَلِيَ اِمارةً قَطُّ ولا جِبايةً ولا خَراجًا ولا شَيْئًا اِلا اَنْ يَكُونَ في غَزْوٍ مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ، اَوْ مَعَ ابي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ رضي الله عنهم، قال عبدُ اللهِ: فَحَسَبْتُ ما كانَ عَليهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُه اَلْفَيْ اَلفٍ وَمِائَتَيْ اَلْفٍ! فَلَقِيَ حكيمُ بْنُ حِزامٍ عبدَ اللهِ بْنَ الزبيرِ فقال: يَا ابْنَ اَخِيْ كَمْ عَلى اَخِيْ مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمْتُهُ وقلتُ: مِائَةُ اَلْفٍ. فقال حكيمٌ: وَاللهِ ما اَرٰى اَمْوالَكُمْ تَسَعُ هذه! فقال عبدُ اللهِ: اَرَاَيْتَكَ اِنْ كانَتْ اَلْفَيْ اَلفٍ؟ وَمِائَتَيْ اَلْفٍ؟ قال: ما اَراكُمْ تُطِيقُونَ هذا، فَاِنْ عَجَزْتُم عَنْ شَيْءٍ منه فَاسْتَعِينُوا بي. قال: وَكانَ الزبيرُ قَدِ اشْتَرٰى الغابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ الفٍ، فَباعَها عبدُ اللهِ بِاَلْفِ اَلْفٍ وَسِتِّمِائَةِ اَلفٍ، ثم قامَ فَقالَ: مَنْ كانَ له عَلى الزُّبيرِ شَيْءٌ فَلْيُوافِنا بِالغَابَةِ، فَاَتاه عبدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَكانَ له على الزبيرِ اَرْبَعمِائَةِ الفٍ، فقال لِعَبْدِ اللهِ: اِنْ شِئْتُمْ تركتُها لكم؟ قال عبدُ اللهِ: لا، قال: فَاِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُموها فِيما تُؤَخِّرُونَ اِنْ اَخَّرْتُمْ، فقالَ عبدُ اللهِ: لا، قال: فَاقْطَعُوا لي قِطْعَةً، قال عبدُاللهِ: لَكَ مِنْ هٰهُنا الى ههنا. فباعَ عبدُ اللهِ منها، فَقَضٰى عنه دَيْنَه، وَاَوْفاهُ وبَقِيَ منها اَربعةُ اَسْهُمٍ ونصفٍ، فَقَدِمَ عَلي مُعاوِيَةَ وعِنْدَه عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزبيرِ، وَابْنُ زَمْعَةَ. فقال له معاويةُ: كَمْ قُوِّمَتِ الغابَةُ؟ قال: كلُّ سَهْمٍ بمائَةِ الفٍ قال: كَمْ بَقِيَ منها؟ قال: اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ وَنِصْفٍ، فَقال المُنْذِرُ بْنُ الزبيرِ: قد اَخذتُ منها سَهْمًا بِمائَةِ الفٍ، قال عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ: قد اَخذتُ منها سَهْمًا بِمائَةِ الفٍ. وقال ابنُ زمعَةَ: قد اخذتُ سَهْمًا بِمائَةِ الفٍ، فقال مُعاوِيَةُ: كم بَقِيَ مِنها؟ قال: سَهْمٌ ونصفُ سهمٍ، قال: قَدْ اخذتُه بِخَمْسِين وَمِائَةِ اَلفٍ. قَالَ: وباعَ عبدُاللهِ بْنُ جعفرٍ نَصِيْبَه مِنْ مُعاوِيَةَ بِسِتِّمائَةِ اَلفٍ. فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزبيرِ مِنْ قَضاءِ دَيْنِه قال بَنُو الزبيرِ: اقْسِمْ بَيْنَنا مِيراثَنا. قال: وَاللهِ لا اَقْسِم بَيْنَكُم حَتّٰى اُنادِيَ بِالْمَوْسِمِ اَرْبَعَ سِنينَ: اَلاَ مَنْ كان له عَلَى الزبيرِ دَيْنٌ فَلْيَاْتِنا فَلْنَقْضِه. فَجَعَلَ كُلَّ سنةٍ يُنادِيْ في الْمَوْسِمِ، فَلَمَّا مَضٰى اَرْبَعُ سِنين قَسَمَ بَيْنَهم وَدَفَعَ الثُّلُثَ. وكان للزبيرِ اَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَاَصابَ كُلَّ امْرَاَةٍ اَلْفُ الفٍ وَمِائَتَا الفٍ، فَجَمِيعُ مَالِه خَمْسُونَ الفَ اَلفٍ وَمِائَتَا الفٍ: رواه البخاري

হযরত আবু খোবায়ব আব্দুল্লাহ বিন যোবায়র ইবনুল আওয়াম আল কোরায়শী আলী আসাদী (রাঃ) বলেন, জামাল যুদ্ধের দিন (আমার আব্বা) যোবায়র যখন যুদ্ধের জন্য

প্রস্তুত হইলেন। তখন আমাকে ডাকিলেন। আমি তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। তখন তিনি বলিলেন, হে পুত্র! আজ জালিম কিংবা মজলুম নিহত হইবে। আর আমার মনে হইতেছে যে, আজ আমি অবশ্যই মজলুম অবস্থায় নিহত হইব। তবে আমার সর্বাধিক একটি দুশ্চিন্তা হইল আমার ঋণ। আচ্ছা, তুমি কি মনে কর যে, আমার ঋণ আমার সম্পদের কিছু অবশিষ্ট রাখিবে? অতঃপর তিনি বলিলেন, হে পুত্র! তুমি আমার সম্পদ বিক্রয় করিয়া আমার ঋণ পরিশোধ করিও। আর তিনি এক তৃতীয়াংশ (মাল) সম্পর্কে অছিয়ত করিলেন এবং এক তৃতীয়াংশের তৃতীয়াংশ সম্পর্কে তাঁহার পুত্রদের (অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন যোবায়রের পুত্রদের) অনুকূলে অছিয়ত করিলেন। তিনি বলিলেন, যদি ঋণ পরিশোধ করিবার পর কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে উহার তৃতীয়াংশ তোমার পুত্রদের জন্য।

হিশাম বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন যোবায়রের পুত্র খোবায়ব ও আব্বাদ,* যোবায়র-এর কোন কোন পুত্রের সমবয়সী ছিলেন। যোবায়রের নয় পুত্র ও নয় কন্যা ছিল।

আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, তিনি আমাকে তাঁহার ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে অছীয়ত করিতে এবং (এই কথা) বলিতে থাকিলেন, হে পুত্র! তুমি যদি ঐ ঋণের কোন অংশ পরিশোধ করিতে অপরাগ হইয়া যাও তবে এই ব্যাপারে আমার মাওলার নিকট সাহায্য চাহিও।

আব্দুল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি বুঝিতে পারিলাম না যে, (মাওলা বলিয়া) তিনি কাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আব্বা! আপনার মাওলা কে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্।

আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! তাহার ঋণের ব্যাপারে যখনই আমি কোন বিপদে পড়িতাম তখনই আমি এই দু'আ করিতাম, হে যোবায়রের মাওলা! তাঁহার পক্ষ হইতে তাঁহার ঋণ আদায় করিয়া দাও। আর তিনি তাহা আদায় করিয়া দিতেন।

আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, যোবায়র শহীদ হইলেন এমন অবস্থায় যে জমাজমি ছাড়া একটি দীনার বা একটি দিরহামও তিনি রাখিয়া যান নাই। জমাজমির মধ্যে ছিল (মদীনার নিকটবর্তী) গাবা-ভূমি, মদীনায় এগারটি বাড়ী, বছরায় দুইটি বাড়ী, কুফায় একটি বাড়ী এবং মিশরে একটি বাড়ী।

আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, তাঁহার ঋণগ্রস্ত হইবার কারণ ছিল এই যে,মানুষ তাঁহার নিকট মাল আমানত রাখিবার জন্য আসিত। কিন্তু তিনি বলিয়া দিতেন, না, আমানত নহে বরং ইহা করয। কেননা আমি মাল নষ্ট হইবার আশংকা করি।

তিনি কখনো প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। তদ্রূপ কর বা (ভূমি)রাজস্ব বা অন্য কিছু গ্রহণ করেন নাই। তবে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এবং আবু বকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর সহিত জিহাদে শরীক হইতেন।

আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, (তাঁহার শাহাদতের পর) আমি তাঁহার ঋণের পরিমাণ হিসাব করিয়া দেখিলাম বাইশ লক্ষ দিরহাম।

হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) আব্দুল্লাহ্ ইবনে যোবায়র (রাঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাতিজা! আমার ভাইয়ের ঋণের পরিমাণ কত? (আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন,) আমি তাঁহার নিকট প্রকৃত পরিমাণ গোপন করিয়া বলিলাম, এক লক্ষ দিরহাম। তখন হাকীম বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় না যে, তোমাদের সম্পত্তি এই (বিপুল পরিমাণ) ঋণ পরিশোধে যথেষ্ট হইবে। তখন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, আপনার কি ধারণা, যদি ঋণের পরিমাণ বাইশ লক্ষ দিরহাম হয়? তিনি বলিলেন, আমার মনে হয় না যে, তোমরা ইহা আদায় করিতে পারিবে। সুতরাং যদি কোন ঋণ আদায় করিতে অপারগ হইয়া পড় তবে আমার সাহায্য গ্রহণ করিও।

(হিশাম) বলেন, যোবায়র (রাঃ) এক লক্ষ সত্তর হাজার দিরহাম দ্বারা গাবা-ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন। আর আব্দুল্লাহ উহা ষোল লক্ষ দিরহামে বিক্রয় করিয়াছিলেন।

অতঃপর আব্দুল্লাহ (রাঃ) ঘোষণা দিয়া বলিলেন, যোবায়রের যিম্মায় যাহার কোন ঋণ আছে সে যেন আমাদের সহিত গাবা-ভূমিতে দেখা করে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) তাঁহার নিকট আসিলেন, যোবায়রের যিম্মায় তাঁহার চারলক্ষ দিরহাম ঋণ ছিল। তিনি আব্দুল্লাহ বিন যোবায়র (রাঃ)-কে বলিলেন, তোমরা চাহিলে আমি উহা তোমাদের জন্য ছাড়িয়া দিব। আব্দুল্লাহ বলিলেন, না। তিনি বলিলেন, যদি এমন হয় যে, (কিছু ঋণ পরিশোধ করা) তোমরা বিলম্বিত করিবার ইচ্ছা কর তবে ইহাকে বিলম্বিত ঋণসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিতে পার। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, না। তিনি বলিলেন, তবে আমার জন্য এক খণ্ড জমি নির্ধারণ কর। আব্দুল্লাহ বিন যোবায়র (রাঃ) বলিলেন, এখান হইতে এখান পর্যন্ত তোমার।

যাহাই হউক আব্দুল্লাহ (রাঃ) গাবা-ভূমির অংশবিশেষ বিক্রয় করিয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিলেন। তখনও গাবা-ভূমির সাড়ে চার ভাগ রহিয়া গেল। অতঃপর তিনি মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। সেখানে আমর বিন উছমান, মুনযির বিন যোবায়র ও ইবনে যাম'আ উপস্থিত ছিলেন, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গাবা-ভূমির মূল্য কত নির্ধারিত হইয়াছে? তিনি বলিলেন, প্রতি অংশ এক লক্ষ দিরহাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কত অংশ অবশিষ্ট আছে? তিনি বলিলেন, সাড়ে চার অংশ। তখন মুনযির বিন যোবায়র বলিলেন, আমি এক লক্ষ্য দিরহামে এক অংশ লইলাম। আমর বিন উছমান বলিলেন, আমি এক লক্ষ দিরহামে এক অংশ লইলাম। ইবনে যাম'আ বলিলেন, আমি এক লক্ষ দিরহামে এক অংশ লইলাম। অতঃপর মু'আবিয়া (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কত অংশ অবশিষ্ট আছে? তিনি বলিলেন, দেড় অংশ। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আমি উহা দেড় লক্ষ দিরহামে লইলাম। হিশাম বলেন, আব্দুল্লাহ বিন জাফর তাঁহার হিসসা হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর নিকট ছয় লক্ষ দিরহামে বিক্রয় করিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়র (রাঃ) যখন ঋণ আদায় হইতে অবসর হইলেন তখন যোবায়র–পুত্রগণ বলিলেন, আমাদের মাঝে আমাদের মীরাছ বন্টন করুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! চারি বৎসর পর্যন্ত হজ্জের মৌসুমে এই ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত তোমাদের মাঝে মীরাছ বন্টন করিব না–

'শোন, যোবায়রের যিম্মায় যাহার কোন ঋণ পাওনা রহিয়াছে, সে যেন আমাদের নিকট আসে। আমরা তাঁহার ঋণ শোধ করিব।'

সুতরাং প্রতি বৎসর হজ্জ মৌসুমে তিনি ঘোষণা দিতে লাগিলেন। যখন চারি বৎসর চলিয়া গেল তখন তিনি তাহাদের মাঝে মীরাছ বন্টন করিলেন এবং (অছীয়ত মুতাবিক) এক তৃতীয়াংশ (প্রাপকদিগকে) পরিশোধ করিয়া দিলেন। যোবায়র (রাঃ)-এর চারি স্ত্রী ছিলেন। তাহাদের প্রত্যেকে বারলক্ষ দিরহাম পাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পুরা সম্পত্তির পরিমাণ হইল পাঁচ কোটি দুই লক্ষ দিরহাম।

ফায়দা ঃ

(যোবায়র ইবনুল আওয়াম রাঃ) তাঁহার আব্বা আওয়াম হইলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রাঃ)-এর ভাই। (খাদীজা ও আওয়াম উভয়ে খোওয়াইলিদের সন্তান) আর তাঁহার মাতা হইলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু হযরত ছাফিয়্যাহ (রাঃ)। বার কিংবা ষোল কিংবা আঠার বৎসর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের অল্প পরেই চতুর্থ কিংবা পঞ্চম ব্যক্তি রূপে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান দশ ছাহাবার অন্যতম। খিলাফতের বিষয় নিষ্পত্তির দায়িত্বভার যেই ছয়জন ছাহাবির উপর হযরত ওমর (রাঃ) অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের একজন ছিলেন তিনি। এই ছয়জন সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ছয়জনের প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়াছেন।[১]

ইসলামের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম আল্লাহর নামে তরবারি কোষমুক্ত করিয়াছিলেন। ঘটনা ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুসলমানদের দুর্বল জামা'আতসহ মক্কায় ছিলেন তখন একদিন খবর ছড়াইয়া পড়িল যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছে। এই খবর শুনিবামাত্র হযরত যোবায়র (রাঃ) লোকজনের ভিতর দিয়া খোলা তলোয়ার হাতে ছুটিয়া গেলেন। তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি হে যোবায়র? তিনি বলিলেন, খবর পাইলাম যে, আপনি ঘেরাও হইয়াছেন। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জন্য রহমত প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার ও তাঁহার তলোয়ারের জন্য দু'আ করিলেন।

(জামাল যুদ্ধের দিন) তেষট্টি হিজরীর জুমাদাল আখিরা মাসে হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মাঝে সংঘটিত প্রসিদ্ধ যুদ্ধ, যাহাতে উভয় তরফে কমপক্ষে দশ হাজার মুসলমান শহীদ হইয়াছিলেন। উভয় পক্ষেই জলীলুল কদর ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী বিশিষ্ট ছাহাবা শামিল ছিলেন। এই যুদ্ধকে জামাল যুদ্ধ বলিবার কারণ এই যে, প্রসিদ্ধ ছাহাবী ইয়ালা বিন উমাইয়া (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জন্য একশত দিনার দ্বারা একটি উট

১। ইহার অর্থ এই নহে যে, অন্যদের তাঁহার প্রতি সন্তুষ্টি ছিল না। বরং অর্থ এই যে, এই ছয়জনের মাঝে খিলাফত পরিচালনার যোগ্যতাও ছিল।

খরীদ করিয়াছিলেন এবং তিনি উহাতে আরোহণপূর্বক যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন। যুদ্ধ কোন ক্রমেই থামিতেছিল না। উটটি যখন আহত হইয়া উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)সহ পড়িয়া গেল তখন তাহাদের পরাজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল।

যুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল এই ভাবে যে, তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান বিন আফফান (রাঃ)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের পর এক নযিরবিহীন পরিস্থিতির মাঝে হযরত আলী (রাঃ) খিলাফত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সময়ে তিনিই ছিলেন খিলাফতের যোগ্যতম ব্যক্তি। এই বিষয়ে কাহারই দ্বিমত ছিল না। কিন্তু হযরত উছমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীরা সদলবলে হযরত আলী (রাঃ)-এর জামা'আতে ভিড়িয়া গিয়াছিল। তাই হযরত তালহা, যোবায়র, হযরত আয়েশা (রাঃ) ও বহু বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত উছমান হত্যার কিছাছ ও বিচারের দাবীতে বাহির হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁহার সমর্থক বহু বিশিষ্ট ছাহাবীর বক্তব্য ছিল এই যে, সর্বপ্রথম কর্তব্য হইল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা এবং ফিতনা প্রশমিত করা। অতঃপর অপরাধীচক্রকে কোণঠাসা করিয়া পাকড়াও করা। উভয় পক্ষই মুজতাহিদ ছিলেন এবং নিজ নিজ ইজতিহাদ মুতাবিক কাজ করিয়াছেন। সুতরাং উভয় পক্ষই হকের উপর ছিলেন। কেহ বাতিলের উপর ছিলেন না। তবে একপক্ষ (অর্থাৎ হযরত আলী রাঃ) নির্ভূল ইজতিহাদের উপর ছিলেন। আর অপরপক্ষ (অর্থাৎ হযরত তালহা, যোবায়র, ও পরবর্তীতে হযরত মুআবিয়া রাঃ) ভুল ইজতিহাদের উপর ছিলেন। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন ঘটনার পরবর্তী ফলাফল দেখিয়া, যাহা ছাহাবা কেরামের সামনে ছিল না। তাহাদের সামনে তো ছিল শুধু পরিস্থিতি।

আর ইজতিহাদের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই ছাওয়াবের অধিকারী। প্রথম পক্ষের দুইটি ছাওয়াব। একটি হইল ইজতিহাদ করিবার, দ্বিতীয়টি হইল সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবার। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পক্ষের একটি ছাওয়াব। অর্থাৎ ইজতিহাদের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য আন্তরিক মেহনতের ছাওয়াব।

জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক ও ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন তাঁহার আলমুকাদ্দিমায় মুসলিম উম্মাহকে এই উপদেশ দিয়াছেন।–

সাবধান! নিজেকে এবং নিজের জিহ্বাকে কোন ছাহাবীর শানে গোস্তাখিতে অভ্যস্থ করিও না এবং তাঁহাদের কোন ঘটনার বিষয়ে হৃদয়কে সংশয়ের আবর্তে নিক্ষেপ করিও না। বরং তাঁহাদের জন্য যথাসম্ভব উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তি খুঁজিয়া বাহির কর। কেননা তাঁহারাই ইহার সর্বাধিক হকদার। দলীল প্রমাণ ছাড়া না বুঝিয়া তাঁহারা মতবিরোধ করেন নাই। হক্কের প্রতিষ্ঠা ও জিহাদের নিয়তেই তাঁহারা লড়িয়াছেন ও মরিয়াছেন। সেই সংগে এই বিশ্বাসও রাখিও যে, তাঁহাদের মতবিরোধ পরবর্তী উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ, যাহাতে প্রত্যেকেই তাঁহাদের মধ্য হইতে যে কাহাকেও নির্বাচন করিয়া ইকতিদা ও অনুসরণ করিতে পারে এবং তাঁহাকে নিজের ইমাম, পথ প্রদর্শক ও পথ নির্দেশক রূপে গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং এই বিষয়টি বুঝ এবং সৃষ্টিজগতে ও বিশ্বজগতে আল্লাহর হিকমত ও রহস্য অনুধাবন কর।

তিনি আরও বলেন–

উছমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর ফিতনার দরওয়াজা খুলিয়া গিয়াছিল। যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার ব্যাপারে ছাহাবা কেরামের প্রত্যেকেরই যুক্তি ও কৈফিয়ত রহিয়াছে। তাঁহারা সকলেই দ্বীনের প্রতি যত্নবান ছিলেন। দ্বীন সম্পর্কিত কোন বিষয় তাঁহারা নষ্ট হইতে দিতেন না।

যাহাই হউক এই ঘটনার পর তাঁহারা চিন্তা ও ইজহিতাদ করিয়াছেন। আর আল্লাহ তাঁহাদের অবস্থাবলী সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তাঁহাদের বিষয়ে জ্ঞাত আছেন। আমরা কিন্তু তাহাদের সম্পর্কে ভাল ছাড়া অন্য কোন ধারণা করিব না। কেননা তাঁহাদের অবস্থা এবং তাঁহাদের সম্পর্কে সত্যবাদী (রাসূলের) বাণীসমূহ ইহাই সাক্ষ্য দেয়।

তিনি আরও বলেন–

যদিও আলী (রাঃ) সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু মু'আবিয়া (রাঃ) বাতিল উদ্দেশ্যে তাঁহার ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই বরং হক ও সত্যকেই তিনি উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন। তবে ভুল (ইজতিহাদ) করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ উদ্দেশ্যে হকের উপর ছিলেন।

(আজ জালিম কিংবা মজলুম নিহত হইবে।) কেননা নিহত ব্যক্তি হয় আমাদের পক্ষীয় কিংবা হযরত আলীর পক্ষীয় ছাহাবী হইবেন। আর উভয় পক্ষের ছাহাবাগণ নিজ নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী হকের উপর আছেন। সুতরাং তাহারা নিহত হইলে মজলুম অবস্থায় নিহত হইবেন। পক্ষান্তরে অ-ছাহাবী যোদ্ধাদের দুইদল। একদল ছাহাবা কেরামের অনুগামী রূপে যুদ্ধে আসিয়াছে। তাহারাও যে পক্ষ হইতেই নিহত হইবে মজলুম অবস্থায় নিহত হইবে। আর অন্যরা হইল সুযোগ-সন্ধানী ও দুনিয়ার লোভী। তাহারা যে পক্ষেই নিহত হইবে জালিম অবস্থায় নিহত হইবে। বস্তুতঃ হযরত আলী (রাঃ)ও উভয় পক্ষের নিহত ছাহাবা কেরামকে শহীদ মনে করিতেন। তাই তিনি উভয় পক্ষের নিহতদের জানাযা পড়িয়া বিনা গোসলে দাফন করিতেন।

(তুমি কি মনে কর যে, আমার ঋণ আমার সম্পদের কিছু অবশিষ্ট রাখিবে?) বিপুল পরিমাণ ঋণের কথা চিন্তা করিয়াই তিনি ইহা বলিয়াছিলেন। দৃশ্যতঃ এই পরিমাণ সম্পদ দ্বারা তাঁহার ঋণ আদায় হওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তাই হাকীম বিন হিযাম প্রথমে এক লক্ষ দিরহামের কথা শুনিয়াই বলিয়াছিলেন, আমার মনে হয় না যে, তোমাদের বর্তমান সম্পদ এই পরিমাণ ঋণ সামাল দিতে পারিবে। অথচ ঋণের প্রকৃত পরিমাণ ছিল বাইশ লক্ষ দিরহাম। কিন্তু আল্লাহ পাক এমনই গায়বী মদদ করিলেন যে, কি আর বলিব! আল্লাহু আকবার!!

ছাহাবা-অর্ন্তবিরোধের কারণে যাহারা তাঁহাদের সমালোচনা করেন তাহারা চিন্তা করিয়া দেখুন; কি ঈমান, বিশ্বাস, তাওয়াক্কুল ও ভরসা ছিল আল্লাহর উপর তাঁহাদের যে, শহীদ হইবার বিশ্বাস লইয়া যুদ্ধে নামিতেছেন আর পুত্রকে অছীয়ত করিতেছেন, যদি কখনও করয পরিশোধ করিতে গিয়া সমস্যায় পড় তবে আমার মাওলার নিকট সাহায্য চাহিও।

অপরদিকেও দেখুন, তিরানব্বই বৎসর বয়সে হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষে লড়াই করিতেছেন হযরত আম্মার বিন ইয়াসির। আর নিজেই নিজের শাহাদতের খোশখবর দিয়া ঘোষণ করিতেছেন–

اليوم القى الاحبة محمدا و صحبه *

(আজ আমি বন্ধুদের সহিত মিলিত হইব। মুহম্মদ ও তাঁহার সংগীগণের সহিত মিলিত হইব।

আর সত্য সত্যই সেই দিনই তিনি শহীদ হইলেন।

বস্তুতঃ এই পরিমাণ ঈমান ও বিশ্বাস বুকে ধারণ করিয়া আজিকার মুসলমানগণ দুই পক্ষ হইয়া যদি লড়াই করিয়াও দেখাইতে পারিত তবে বিশ্বের জাতিবর্গ বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অবিভূত হইয়া পড়িত। মুসলমানদের যুদ্ধ দেখিয়াই তাহারা হিদায়াত লাভ করিতে পারিত। অথচ দুর্ভাগ্য এই যে, ছাহাবা কেরাম কেন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন সেই শরমেই যেন আমরা মরিয়া যাইতেছি। তদুপরি কোন্ পক্ষ হক ও কোন্ পক্ষ না হক উহা নির্ধারণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি।

সুতরাং হে মুসলমান ভাই সকল! বড় দরদের সহিত বলিতেছি, যখনই তোমরা ছাহাবা কেরামের মাঝে সংঘটিত মতবিরোধ ও সংঘাতের ইতিহাস পড়িবে তখন মনে রাখিও যে, উভয় পক্ষে এই রকমের বড় বড় ছাহাবী ছিলেন এবং তাঁহাদের সকলেরই লক্ষ্য ছিল আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সন্তুষ্টি। চারিদিকে যখন ইসলামের শত্রুরা ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহকে নিশ্চিহ্ন করিবার জঘন্য চক্রান্তের জাল বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছিল তখন সমকালীন জটিল পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া কোরআন সুন্নাহর আলোকে যিনি যেই সিদ্ধান্ত সঠিক মনে করিয়াছিলেন তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তাঁহাদের সকলের প্রতি রহম করুন। আমীন।

(এক তৃতীয়াংশ সম্পর্কে অছীয়ত করিলেন এবং এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ সম্পর্কে) অর্থাৎ ঋণ আদায় করিবার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে উহার এক তৃতীয়াংশ বাদ দিয়া বাকী মাল মীরাছ হিসাবে তকসীম হইবে। এক তৃতীয়াংশ অছিয়ত মুতাবিক ব্যয় হইবে। অছীয়তের একটি খাত হইল আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর পুত্রগণ অর্থাৎ তাঁহার নাতিগণ। তাহারা পাইবে এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ। অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশের খাত সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয় নাই।

কিন্তু পরবর্তী বাক্যটির কারণে জটিলতা সৃষ্টি হইতেছে। কেননা উহা দ্বারা বোঝা যায় যে, ঋণ পরিশোধের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে উহার এক তৃতীয়াংশ সমস্তটুকুই হযরত আব্দুল্লাহর পুত্রদের জন্য। আল্লামা দিমামীনী ইহার উত্তর দিয়াছেন এইভাবে যে, পরবর্তী বাক্যটির অর্থ হইল, ঋণ পরিশোধের পর অছীয়ত খাতে ব্যয় করিবার মত যদি কিছু থাকে তবে উহার এক তৃতীয়াংশ তোমার পুত্রদের জন্য। আর অছীয়ত খাতে ব্যয় করিবার পরিমাণ হইল সম্পদের এক তৃতীয়াংশ। সুতরাং হযরত আব্দুল্লাহর পুত্রদের জন্য এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ হইল।

উল্লেখ্য, জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় মানুষ ইচ্ছা করিলে তাহার সমস্ত সম্পদ দান করিয়া দিতে পারে। আল্লাহর ওয়াস্তে দান করিলে ছাওয়াব পাইবে। পক্ষান্তরে ওয়ারিছদিগকে বঞ্চিত করিবার নিয়তে করিলে দান হইয়া যাইবে। কিন্তু ছাওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ হইবে। পক্ষান্তরে অন্তিম

অসুস্থতার সময় সম্পদের এক তৃতীয়াংশ শুধু দান করিতে বা দানের অছীয়ত করিতে পারে। অবশিষ্ট সম্পদের উপর তখন তাহার হক থাকে না। ওয়ারিছদের হক হইয়া যায়। সুতরাং এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত সম্পদ দান করিলেও দান হইবে না।

(আমার মাওলার নিকট সাহায্য চাহিও) বাংলা ভাষায় মাওলা শুধু আল্লাহকেই বলা হয়। এই কারণে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, হযরত যোবায়র (রাঃ) আমার মাওলা বলিবার পর তাঁহার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) কেন বুঝিতে পারিলেন না যে, মাওলা দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হইয়াছে? ইহার উত্তর এই যে, আরবীতে মাওলা শব্দটি ইহা ছাড়াও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বন্ধু, মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ মিত্র (সেই যুগে সামাজিক সম্মান লাভের জন্য প্রভাবশালী কোন গোত্র বা গোত্রের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত মৈত্রী চুক্তি করা হইত। তখন লোকটিকে সেই গোত্রের বা সেই ব্যক্তির মাওলা বলা হইত।) আযাদকৃত গোলাম। (আযাদকৃত গোলামের সহিত একটি বিশেষ সম্পর্ক স্বীকৃত ছিল। যেমন আযাদকৃত গোলামের কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে আযাদকারী মালিক উত্তরাধিকারী হইতেন।) চাচাত ভাই। এই সকল কয়টি অর্থই এইখানে গ্রহণ করা যাইতে পারিত। তাই উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝিতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়র (রাঃ)-এর অসুবিধা হইয়াছিল।

(এবং একটি বাড়ী মিশরে) এইগুলি বয়ান করিবার উদ্দেশ্য এই যে, হযরত যোবায়রের মাওলা আল্লাহ পাকের খাছ মদদ না হইলে এই পরিমাণ সম্পদ দ্বারা এত বিপুল অংকের ঋণ আদায় করা কিছুতেই সম্ভব হইত না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মদদে ঐ সম্পদ দ্বারাই সমস্ত করয আদায় হইয়াও কিছু অবশিষ্ট ছিল। আল্লাহর মদদের একটি ছুরত এই ছিল যে, জমি ও বাড়ীর অপ্রত্যাশিত মূল্য পাওয়া গিয়াছিল।

(হে ভাতিজা!) হযরত হিযাম ও আওয়াম উভয়ে খোয়াইলিদের পুত্র অর্থাৎ দুই ভাই ছিলেন। সুতরাং হযরত হাকীম বিন হিযাম (রাঃ) হইলেন হযরত যোবায়র বিন আওয়া চাচাত ভাই। বয়সের বিরাট তারতম্যের কারণে তাঁহাকে তিনি এইভাবে সম্বোধন করিয়াছিলেন। কেননা হযরত হাকীম (রাঃ) তখন শতবর্ষীয় ছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত আব্দুল্লাহর বয়স তখন মাত্র চল্লিশ বৎসর।

(এক লক্ষ দিরহাম) প্রকৃত বিষয় গোপন করিবার কারণ এই ছিল যে, হযরত হাকীম (রাঃ) যেন ঋণের বিশাল অংকের কারণে তাঁহার পিতা হযরত যোবায়রকে বেহিসাবী ছিলেন বলিয়া মনে না করেন এবং হযরত আব্দুল্লাহকে ঋণ আদায়ে অক্ষম ভাবিয়া করুণার দৃষ্টিতে না তাকান। কেননা শরীফ মানুষ কাহারও করুণার পাত্র হইবার কথা কল্পনাও করিতে পারেন না। কিন্তু হযরত হাকীম যখন ইহাকেই বিরাট মনে করিয়া বসিলেন এবং ভাবিলেন যে, এক লক্ষ দিরহাম ঋণ পরিশোধ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তখন তিনি প্রকৃত বিষয় তুলিয়া ধরিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, আমি তো এই পরিমাণ ঋণের বোঝা মাথায় লইয়াও ঘাবড়াইতেছি না। কেননা যোবায়র আমাকে তাঁহার মাওলার সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

আল্লামা ইবনুল বাত্তাল (রহঃ) বলেন, ইহাকে মিথ্যা বলা চলে না। কেননা তিনি আংশিক ঋণ সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করিয়াছেন আর অবশিষ্ট ঋণ সম্পর্কে নিরবতা অবলম্বন করিয়াছেন মাত্র (এবং তাহাও একটি মহৎ উদ্দেশ্যে)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়র (রাঃ) হযরত হাকীমের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তদ্রূপ হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রাঃ)-এর নিকট হইতেও ন্যূনতম সুবিধা গ্রহণ করেন নাই। কেননা হযরত যোবায়র (রাঃ) তাঁহাকে শুধু আল্লাহর সাহায্য গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন।

(আব্দুল্লাহ গাবা-ভূমির অংশবিশেষ বিক্রয় করিলেন) শুধু গাবা-ভূমি নহে বরং অন্যান্য বাড়ীঘরও বিক্রয় করা হইয়াছিল। কেননা ঋণের পরিমাণ ছিল বাইশ লক্ষ দিরহাম। পক্ষান্তরে গাবা-ভূমির মূল্য পাওয়া গিয়াছিল ষোল লক্ষ দিরহাম।

(এখান হইতে এখান পর্যন্ত তোমার) আল্লামা আলকামী (রহঃ) বলেন, বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়র (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ)-কে বলিলেন, আমি চাহি যে, আমরা দুইজন ছাড়া তৃতীয় কেহ যেন আমাদের সহিত উপস্থিত না থাকে। অতঃপর তাঁহারা গাবা অভিমুখে চলিলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফরকে মূল্য ধরিয়া একটি অনাবাদ ও বসতিহীন ভূমি দিলেন। লেনদেন শেষ হইবার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) তাঁহার গোলামকে বলিলেন, এইখানে আমার জন্য জায়নামায বিছাও। গোলাম সবচাইতে শক্ত মাটিতে জায়নামায বিছাইল। তিনি ঐ স্থানে দুই রাক'আত নামায পড়িলেন এবং দীর্ঘ সিজদায় পড়িয়া দু'আ করিলেন। ইচ্ছামত দু'আ করিয়া (নামায শেষে) গোলামকে তিনি বলিলেন, আমার সিজদার স্থানটি খনন কর। গোলাম খনন করিল। আর তৎক্ষণাৎ একটি স্রোতস্বিনী ঝরনা প্রবাহিত হইল। (এই বরকত ও কারামত দেখিয়া) হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়র (রাঃ) বলিলেন, আমাকে বিক্রয়চুক্তি হইতে অব্যাহতি দিন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করিয়াছেন। আমি বিক্রয় প্রত্যাহার করিব না।

(যোবায়র নিহত হইলেন) তাঁহার নিহত হইবার ঘটনা এইরূপ—

জামাল যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ) হযরত যোবায়র (রাঃ)-কে একান্তে ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন, আপনার কি মনে পড়ে যে, আমি ও আপনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলাম তখন তিনি আপনাকে বলিলেন—

لتقاتلن عليا و انت له ظالم *

তুমি আলীর বিরুদ্ধে লড়াই করিবে অথচ তুমি তাহার প্রতি জুলুমকারী হইবে।

হাদীছটি হযরত যোবায়র (রাঃ)-এর স্মরণ হইল। তাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। 'ওয়াদি সিবা' উপত্যকায় অবতরণ করিয়া তিনি নামাযে দাঁড়াইলেন তখন ইবনে জুরমুয পিছন হইতে আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। অতঃপর এই নরাধম হযরত যোবায়র (রাঃ)-এর তলোয়ার হযরত আলী (রাঃ)-এর দরবারে পেশ করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল। হযরত আলী তলোয়ারখানা দেখিয়া বিষন্ন কণ্ঠে বলিলেন, হায়, এই তলোয়ার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর হইতে কত বিপদ দূর করিয়াছে। অতঃপর তিনি ইবনে জুরমুযকে সাক্ষাৎ দানে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, যাও তাহাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দান কর।

হযরত আলী (রাঃ)-এর ইহা বলিবার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন–

بشر قاتل ابن صفية بالنار *

ছাফিয়্যার পুত্রের হত্যাকারীকে জাহান্নামের সুসংবাদ দান কর।

(তাঁহার ঋণের কারণ এই ছিলো যে,) কেহ তাহার নিকট আমানত রাখিতে চাহিলে তিনি বলিয়া দিতেন যে, আমি আমানত রাখিব না। করয হিসাবে রাখিব। এই কথা বলিবার কারণ এই ছিল যে, তিনি স্বভাবতঃ মহানুভব ও দানবীর ছিলেন। তাঁহার ভয় ছিল যে, কোন অসতর্ক মুহূর্তে দানের স্রোতে আমানতের মালও চলিয়া যাইতে পারে। অথচ আমানতের মাল খরচ করা জায়েয নাই। পক্ষান্তরে করয হিসাবে লইতে কোন অসুবিধা ছিল না। তিনি ইচ্ছামত দান করিতে পারিতেন। যখন করযদাতার প্রয়োজন হইত শোধ করিয়া দিতেন।

কিংবা ইহাও কারণ হইতে পারে যে, আমানতের বস্তু যথাযথ হিফাযতের পর চুরি বা নষ্ট হইয়া গেলে মূল মালিক উহা আর দাবী করিতে পারে না এবং আমানতদারকে উহার যিমান বা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। অথচ মালিক এই রূপ ধারণা করিতে পারে যে, হয়ত যথাযথ হিফাযত না করিবার কারণে তাহার মাল নষ্ট হইয়াছে। তাই তিনি যামিন হইবার ছুরতে টাকা রাখিতেন, যাহাতে তাঁহার মহানুভবতা অক্ষুণ্ন থাকে এবং মালিক অধিক আশ্বস্ত হইতে পারে। অতঃপর তিনি সমস্ত মাল আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দিতেন। এই হইল তাঁহার ঋণগ্রস্ত হইবার রহস্য।

(যোবায়রের পুত্ররা) হযরত যোবায়র (রাঃ)-এর নয় পুত্র ও নয় কন্যার মাঝে তখন যাহারা জীবিত ছিলেন তাঁহারা হইলেন হযরত আব্দুল্লাহ, ওরওয়া, মুনযির, (আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) এর গর্ভে) ওমর, খালেদ (বিনতে খালেদ বিন ছাঈদ বিন আছ-এর গর্ভে) মুছা'আব, হামযাহ, (রাবাব বিনতে আনীফের গর্ভে) ওবায়দা, জাফর (যয়নব বিনতে বিশর-এর গর্ভে) ও যয়নব (উম্মে কুলছূম বিনতে ওকবা-এর গর্ভে) হযরত যোবায়র (রাঃ)-এর অন্যান্য সন্তান তাঁহার জীবদ্দশাতেই মৃত্যু বরণ করিয়াছিল।

(তোমাদের মাঝে তাকসীম করিব না) দৃশ্যতঃ এই ধরনের বিলম্ব সকল ওয়ারিছের সম্মতি ছাড়া হইতে পারে না। কেননা ঋণ সমূহ আদায়ের পর কোন ওয়ারিছ তাহার মীরাছ দাবী করিলে তাহার দাবী অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে। অজানা ঋণের কল্পিত সম্ভাবনায় তাহাকে অপেক্ষায় রাখা যাইবে না। তবে পরবর্তীতে কোন ঋণ প্রকাশ পাইলে সকলের নিকট হইতে আনুপাতিক হারে ঋণ পরিশোধের অর্থ ফেরত লওয়া হইবে।

ঘোষণার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়র কর্তৃক চারি বৎসর নির্ধারণ করিবার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, তখন হজ্জকাফেলা ইয়ামান, ইরাক, শাম ও মিশর এই চারিটি এলাকা হইতে হিজাযে আসিত। সুতরাং তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, সাধারণতঃ কোন এলাকার লোক তিন বৎসরের বেশী হজ্জ সফরে অনুপস্থিত থাকিবে না।

অধ্যায় - ২৬

জুলুমের পরিণাম

আয়াতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّ لَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ *

জালিমদের কোন বন্ধু থাকিবে না এবং এমন কোন সুফারিশকারীও থাকিবে না যাহাদের সুফারিশ মঞ্জুর করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন—

وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ وَّلِيٍّ وَ لَا نَصِيْرٍ *

জালিমদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না—

হাদীছসমূহ

(তন্মধ্যে একটি হইল হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ, যাহা পিছনে মুজাহাদা অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত হইয়াছে।

২০৬। জুলুম ও কৃপণতা ধ্বংসের কারণ

وَعَنْ جابرٍ رضي الله عنه اَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «اِتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَاِنَّ الظلمَ ظُلُماتٌ يومَ القِيامَةِ، واتقوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ؛ حَمَلَهم عَلى اَنْ سَفَكُوا دِماءَهم[٣] وَاسْتَحَلُّوا مَحارِمَهُمْ» رواه مسلم[٤].

হযরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা জুলুম পরিহার কর। কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন বহু অন্ধকারে পরিণত হইবে। তদ্রূপ কৃপণতা হইতে দূরে থাক। কেননা কৃপণতাই তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে ধ্বংস করিয়াছে। (এইভাবে যে,) ইহা তাহাদিগকে পরস্পর রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এবং (ইহার কারণেই) নিজেদের মাহরামদিগকে তাহারা (ভোগের জন্য) হালাল করিয়া লইয়াছে। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(জুলুম পরিহার কর) ظلم এর শাব্দিক অর্থ কোন কিছু অস্থানে স্থাপন করা। শরীয়তের পরিভাষায় জুলুম অর্থ অপরের হক নষ্ট করা। অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। জুলুম প্রথমতঃ দুই প্রকার। আপন নফসের উপর জুলুম এবং অপরের উপর জুলুম।

আপন নফসের উপর জুলুম করিবার অর্থ, নফসের হক নষ্ট করা। যেমন প্রয়োজন মত

আহার, ঘুম ও অন্যান্য বৈধ আরাম হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ)-কে বলিয়াছিলেন–

ان لنفسك عليك حقا *

তোমার উপর তোমার নফসের হক রহিয়াছে।

নফসের উপর আরেকটি জুলুম হইল তাহার অন্যায় চাহিদা পূরণ করা এবং আল্লাহর নাফরমানির ব্যাপারে তাহাকে সাহায্য করা। যেমন আল্লাহ পাক আদেশ করিয়াছেন–

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا *

তোমরা নিজেদিগকে এবং আপন পরিবারবর্গকে আগুন হইতে রক্ষা কর।

অপরের উপর জুলুম কয়েক প্রকার। যথা, জানের উপর জুলুম। আল্লাহ পাক বলিয়াছেন–

وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ *

যে নফসকে আল্লাহ হারাম করিয়াছেন উহাকে হত্যা করিও না। তবে ন্যায়ভাবে (কিছাছ, রজম ইত্যাদির ছূরতে।)

মালের উপর জুলুম সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে–

وَ لَا يَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ *

তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিও না।

আবরু ইজ্জতের উপর জুলুম। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

حرم عليكم دمائكم و اموالكم و اعراضكم * (رواه البخارى)

আল্লাহ তোমাদের উপর তোমাদের পরস্পরের জান-মাল ও আবরু-ইজ্জত হারাম করিয়াছেন।

ঈমানের উপর জুলুম। যেমন ভুল ফতোয়া দেওয়া فضلوا و اضلوا (এইভাবে নিজেরাও গোমরাহ হয় এবং অন্যদিগকেও গোমরাহ করে।) মানুষের সামনে আল্লাহর নাফরমানির পথ খুলিয়া দেওয়া ইত্যাদি।

এই সমস্ত প্রকার জুলুম পরিহার করিবার আদেশ করা হইয়াছে আলোচ্য হাদীছে।

(কিয়ামতের দিন) কাযি ইয়ায (রহঃ) বলেন, জুলুমকে আক্ষরিক অর্থেই অন্ধকার বলা হইয়াছে। কেননা জালিম দুনিয়াতে তাহার জুলুমের কারণে কিয়ামতে অন্ধকার দেখিতে পাইবে। অথচ নেককার মুমিন দুনিয়াতে তাহার ঈমান ও নেক আমলের কারণে আখিরাতে নূর দেখিতে পাইবে এবং সেই নূরের সাহায্যে সে চলিবে।

يسعى نورهم بين ايديهم و بايمانهم *

তাহাদের নূর তাহাদের সামনে এবং তাহাদের ডানে চলাচল করিবে।

কাহারও কাহারও মতে ظلمات দ্বারা বিপদ মুছীবত উদ্দেশ্য। যেমন আয়াতে আছে–

قل من ينجيكم من ظلمت البر و البحر *

আপনি বলুন, কে তোমাদিগকে স্থলের ও সমুদ্রের বিপদ সমূহ হইতে উদ্ধার করে?

আলামা ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, জুলুম দুইটি মা'ছিয়াত ও নাফরমানিকে একত্র করিয়া থাকে। যথা অপরের হক অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে আস্পর্ধা প্রদর্শন করা। আর ইহা অন্য সকল নাফরমানি হইতে অধিক গুরুতর।

(কৃপণতা) আরবীতে شح শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কৃপণতার সাধারণ আরবী শব্দ হইল بخل-পক্ষান্তরে شح হইল কৃপণতার সর্বনিকৃষ্ট পর্যায়।

(কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতীবর্গকে ধ্বংস করিয়াছে) ধ্বংস দ্বারা নৈতিক ধ্বংস এবং দৈহিক ধ্বংস উভয়ই উদ্দেশ্য হইতে পারে। দৈহিকভাবে ধ্বংসের প্রতি ইংগিত করিয়া বলা হইয়াছে– "ইহা তাহাদিগকে পরস্পর রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।"

যেমন মীরাছের সম্পত্তি তাড়াতাড়ি হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে বনী ইসরাঈলের এক লোক তাহার চাচাত ভাইকে হত্যা করিয়াছিল। অতঃপর গাভী জবেহ করাইয়া আল্লাহ পাক হত্যা-রহস্য উদ্‌ঘাটন করাইয়াছিলেন। সুরাতুল বাকারায় এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

মাযহারী বলেন, সম্পদের প্রতি লোভের কারণে তাহারা একে অপরকে খুন করিয়া তাহার সম্পত্তি দখল করিত।

নৈতিক ধ্বংসের প্রতি ইংগিত করিয়া বলা হইয়াছে– "তাহারা মাহরামদিগকে হালাল করিয়া লইয়াছে।" অর্থাৎ যেহেতু পরনারীর সহিত যিনা করিতে পয়সা খরচ হইত, এই জন্য ঐ নরাধমেরা আপন মাহরামদের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইত। কেননা তাহারা হাতের মুঠায় ছিল। সুতরাং পয়সা খরচ করিবার প্রশ্ন ছিল না। (নাউযুবিল্লাহ)

অন্যরা বলিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল আল্লাহ তাহাদের জন্য যাহা হারাম করিয়াছিলেন তাহা কৌশলে তাহারা হালাল করিয়া লইত। যেমন শনিবারে মৎস শিকার হারাম ছিল। তাই তাহারা গর্ত করিয়া শনিবারে মাছ আটকাইয়া রাখিত এবং পরে তাহা ধরিত।

২০৭। কিয়ামতে যাবতীয় হক আদায় করিতে হইবে

وَعَنْ اَبِي هُرِيرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لَتُؤَدُّنَّ الْحقوقَ الى اَهْلِها يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتّٰى يُقادُ لِلشَّاةِ الجَلْحاءِ(٥) مِنَ الشاةِ القَرْناءِ» رواه مسلم(٦).

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন অবশ্যই হকদারদিগকে তাহাদের হক সমূহ পরিশোধ করা হইবে এমনকি শিংবিহীন বকরীর পক্ষে শিংযুক্ত বকরীর নিকট হইতে বদলা লওয়া হইবে। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

অর্থাৎ দুনিয়াতে যদি কেহ কাহারও হক নষ্ট করে তবে আখিরাতে উহার বদলা অবশ্যই

দিতে হইবে। কিন্তু আখিরাতে একমাত্র বিনিময় মাধ্যম হইল নেক আমল বা ছাওয়াব। সুতরাং এক-এক জন দাবীদার আসিবে আর নিজের হক দাবী করিতে থাকিবে। ফলে দাবীদারকে তাহার ছাওয়াব দিয়া দেওয়া হইবে। যখন দিবার মত নেক আমল থাকিবে না তখন দাবীদারদের গোনাহর বোঝা তাহার উপর চাপানো হইতে থাকিবে। ফলে জাহান্নাম ছাড়া তাহার আর কোন পথ থাকিবে না।

যেমন হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান, দরিদ্র কে? ছাহাবা কেরাম বলিলেন, আমরা তো জানি যে, যাহার মাল নাই সে দরিদ্র। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উম্মতের দরিদ্র হইল ঐ ব্যক্তি যে অনেক নামায, রোযা ও যাকাতের আমল লইয়া কিয়ামতে হাযির হইবে। কিন্তু সে ইহাকে গালি দিয়াছে। উহাকে অপবাদ দিয়াছে। ইহার মাল আত্মসাত করিয়াছে। উহার রক্তপাত করিয়াছে এবং ইহাকে প্রহার করিয়াছে। তখন ইহাকে তাহার নেক সমূহ হইতে দেওয়া হইবে এবং উহাকে তাহার নেক সমূহ হইতে দেওয়া হইবে। যদি তাহার দায় পরিশোধ হইবার পূর্বে তাহার নেক সমূহ শেষ হইয়া যায় তবে তাহাদের গোনাহ সমূহ লইয়া তাহার উপর চাপানো হইবে এবং তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

সুতরাং আমাদিগকে দুনিয়াতেই হকদারদের হক আদায় করিয়া হকমুক্ত ও পাকছাফ অবস্থায় আখিরাতে আল্লাহর দরবারে হাযির হইতে হইবে।

(এমন কি শিংবিহীন) আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ পরিষ্কার প্রমাণ করে যে জ্বিন ইনসান ছাড়া পশুদিগকেও হাশরের মাঠে হাযির করা হইবে। ইহার স্বপক্ষে কোরআন সুন্নাহর বহু দলিল রহিয়াছে। আল্লাহ বলেন–

وَ اِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ *

ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর যখন হিংস্র প্রাণী সমূহকে (হাশরের মাঠে) জমায়েত করা হইবে।

কোরআন হাদীছের কোন শব্দকে উহার বাহ্য অর্থে গ্রহণ করায় যদি আকল বা শরীয়তের কোন বাধা না থাকে তবে উহাকে বাহ্য অর্থে গ্রহণ করাই আবশ্যক। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতকে বাহ্য অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে।

আলিমগণ বলিয়াছেন যে, পশুদের হাশর শাস্তি ও পুরস্কার হিসাবে নহে। বরং কিছাছ ও বদলা গ্রহণ হিসাবে।

হাদীছের শিক্ষা ঃ প্রত্যেক মুসলমানকে এই বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকিতে হইবে যে, আমার দ্বারা যেন কাহারও কোন প্রকার হক নষ্ট না হয়। যাবতীয় হক দুনিয়ার জিন্দেগীতেই পরিশোধ করিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২০৮। মুসলমানের জানমাল ও ইজ্জত আবরুর পবিত্রতা

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كُنا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الوَداعِ ، والنبيُّ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنا(٧)، وَلا نَدْرِي ما حَجَّةُ الوَداع ، حَتّى حَمِدَ اللهَ رَسولُ اللهِ ﷺ ،

وَأَثْنَى عليه، ثم ذَكَرَ المَسِيحَ الدجَّالَ فَأَطْنَبَ في ذِكْرِهِ، وقال: «مَا بَعَثَ اللهُ مِن نَبِيٍّ إِلاَّ أَنْذَرَه أُمَّتَهُ: أَنْذَرَه نوحٌ[৮] وَالنبيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّه إِنْ يَخْرُجْ فِيكمْ فَمَا خَفِيَ عليكم مِنْ شَأْنِه فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيكم، إنَّ رَبَّكم لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَه أَعْوَرُ عَيْنِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عينَه عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ. أَلا إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عليكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوالَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكم هذا، في بَلَدِكم هذا، في شَهْرِكُم هذا، أَلا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قالوا: نَعَم، قال: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ - ثَلاثًا - وَيْلَكُمْ، أو: وَيْحَكُم، انْظُرُوا: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفارًا يَضْرِبُ بَعْضُكم رِقابَ بَعْضٍ» رواه البخاري، وروى مسلم بعضه[৯].

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাদের মাঝেই উপস্থিত ছিলেন। আমরা জানিতাম না যে, বিদায় হজ্জ কি? তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা করিলেন এবং পবিত্রতা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর কানা দাজ্জালের আলোচনা করিলেন এবং বিশদ আলোচনা করিলেন এবং (শেষে) বলিলেন, আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠান নাই যিনি তাঁহার উম্মতকে কানা দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেন নাই। নূহ এবং তাঁহার পরবর্তী নবীগণ স্ব-স্ব উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছেন। সে যদি তোমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে তবে তাহার বিষয় সম্পর্কে যাহা কিছুই তোমাদের অজানা থাকুক, ইহা তো তোমাদের অজানা নহে যে, তোমাদের প্রতিপালক 'কানা' নহেন। অথচ সে ডান চোখের কানা হইবে। তাহার চক্ষু যেন (থোকায়) ভাসিয়া থাকা একটি আংগুর।

সাবধান, আল্লাহ তোমাদের উপর তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন, যেমন তোমাদের এই মাসে তোমাদের এই শহরে তোমাদের এই দিনটি হারাম (বা সম্মানিত।)

শোন, আমি কি পৌঁছাইয়াছি? সকলে আরয করিল, হাঁ, অবশ্যই আপনি পৌঁছাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ। আপনি সাক্ষী থাকুন। ইহা তিনি তিনবার বলিলেন।

(অতঃপর বলিলেন) তোমাদের সর্বনাশ হউক (কিংবা বলিলেন,) তোমাদের উপর রহম হউক। দেখ, আমার পরে তোমরা কুফুরিতে লিপ্ত হইও না যে, তোমাদের একদল অপর দলের গর্দান উড়াইতে থাকিবে। (পুরা হাদীছ বুখারীতে, মুসলিম শরীফে আংশিক)

ফায়দা ঃ

(হাজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ্জ কি) এই হজ্জকে বিদায় হজ্জ বলিবার কারণ কি? توشيح কিতাবে বলা হইয়াছে, সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শব্দটি বলিয়াছিলেন এবং ছাহাবা কেরাম উহা আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারেন নাই যে, বিদায় দ্বারা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়া হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করা

উদ্দেশ্য। যখন হজ্জের সামান্য পরে তাঁহার ওয়াফাত হইল তখন তাঁহারা বিষয়টি বুঝিতে পারিলেন।

(কানা দাজ্জালের আলোচনা করিলেন) আরবীতে مسيح শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহার একটি অর্থ হইল যাহা মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। যেহেতু তাহার একটি চক্ষু মুছিয়া ফেলা হইয়াছে এবং উহার দৃষ্টিশক্তি লোপ করা হইয়াছে। সেহেতু তাহাকে মসীহ্ বলা হয়। আর আমরা উহার বাংলা তরজমা করিয়াছি কানা দাজ্জাল।

দাজ্জাল শব্দের অর্থ অধিক মিথ্যাচারী ও ধোকাবাজ। যেহেতু সে খোদায়ী দাবী করিবে এবং নকল জান্নাত ও নকল জাহান্নাম দ্বারা মানুষকে ধোকা দিবে সেহেতু তাহার নাম হইয়াছে দাজ্জাল।

যেহেতু দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে সকল নবী অবগত ছিলেন কিন্তু তাহার আগমনকাল অজ্ঞাত ছিল সেহেতু প্রত্যেক নবী তাঁহার উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছেন এবং তাহাকে চিনিবার জন্য কিছু আলামত বলিয়াছেন।

(যদি তোমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে) إن (যদি) অব্যয়টি শর্ত ও অনিশ্চয়তা জ্ঞাপক। কিন্তু এখানে অবস্থার প্রেক্ষিতে নিশ্চয়তা বুঝাইতেছে। কেননা দাজ্জালের আগমন অবশ্যম্ভাবী। অথচ পূর্ববর্তী কোন উম্মতের মাঝে তাহার আগমন ঘটে নাই। আর এই উম্মতের পরে কোন উম্মত নাই। সুতরাং এই উম্মতের মাঝে তাহার আগমন সুনিশ্চিত।

দাজ্জালের আগমন সম্পর্কিত আলোচনা কিয়ামতের বয়ান প্রসংগে সামনে আসিতেছে।

(তোমাদের জান-মাল) অন্যান্য হাদীছে জান-মালের সংগে ইজ্জত-আবরুর কথাও আসিয়াছে।

(তোমাদের এই শহরে তোমাদের এই দিনে) অর্থাৎ এই দিনটির পবিত্রতা রক্ষা করা যেমন জরুরী এবং এই শহরের পবিত্রতা রক্ষা করা যেমন জরুরী মুসলমানের জান-মাল (ও ইজ্জত-আবরুর) হিফাযত করা তেমনই জরুরী।

প্রশ্ন এই যে, মুসলমানের জান-মালের হিফাযত করা তো ইহার চাইতেও জরুরী। এমতাবস্থায় ইহার সহিত তুলনা করিবার কারণ কি?

উত্তর এই যে, জাহেলিয়াতের যুগে মানুষের অন্তরে হজ্জের পবিত্র দিনের এবং পবিত্র শহরের মর্যাদা অতিমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মানুষের জান-মালের পবিত্রতার চিন্তা তাহাদের অন্তরে ছিল না। বরং উহাকে তাহারা খুবই তুচ্ছ বিষয় মনে করিত। তাই তাহাদের অন্তরে যেই বিষয়ের গুরুত্ব ছিল সেই বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া মুসলমানের জান-মালের হিফাযতের গুরুত্ব বুঝানো হইয়াছে।

(আমি কি পৌঁছাইয়াছি) অর্থাৎ রিসালাতের যে দায়িত্ব দিয়া আল্লাহ আমাকে পাঠাইয়াছিলেন এবং শরীয়তের যে সকল আহকাম ও বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছাইবার দায়িত্ব আমার উপর ছিল আমি কি উহা পূর্ণ রূপে পৌঁছাইয়াছি?

পেয়ারা নবী উম্মতের যবান হইতে রিসালাতের দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি এই জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন যেন, কেয়ামতের দিন কেহ ইহা অস্বীকার করিতে না পারে। কেননা কথিত আছে

যে, পূর্ববর্তী কোন কোন উম্মত নবীর নবুয়তের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি অস্বীকার করিয়া বসিবে এবং বলিবে, হে আল্লাহ! আমাদের নিকট তোমার কোন নবী আসেন নাই এবং আমাদের নিকট তোমার কোন বাণী পৌঁছানো হয় নাই। তখন ঐ উম্মতের নবী উম্মতে মুহম্মদীকে সাক্ষী সাব্যস্ত করিবেন এবং উম্মতে মুহম্মদী নবীর পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। উম্মতে মুহম্মদীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তোমরা তো তখন উপস্থিত ছিলে না। সাক্ষ্য দিতেছ কিভাবে? উম্মতে মুহম্মদী তখন আরয করিবে। আমাদের রাসূলের উপর যে কালাম নাযিল হইয়াছে উহা হইতেই আমরা জানিয়াছি। আমাদের রাসূলের সত্যবাদিতায় কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর উম্মতে মুহম্মদীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কিয়ামতের ময়দানে বলিবেন যে, আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিয়াছি এবং শরীয়তের যাবতীয় আহ্‌কাম আমার উম্মতের নিকট পৌঁছাইয়াছি, তখন উম্মতে মুহম্মদী তাহা স্বীকার করিয়া লইবে। কেননা বিদায় হজ্জের সময় আল্লাহর রাসূল উম্মতের নিকট হইতে স্বীকৃতি আদায় করিয়াছিলেন। আল্লাহ পাক আল-কোরআনে ইরশাদ করিয়াছেন—

لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ *

যেন রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষ্যদাতা হন আর তোমরা মানবমণ্ডলীর উপর সাক্ষ্যদাতা হও।

(তোমাদের সর্বনাশ হউক) ويلكم অর্থ তোমাদের সর্বনাশ বা বরবাদি হউক। ইহা বদ-দু'আবাচক শব্দ। ويحكم অর্থ তোমাদের উপর রহম হউক। তবে উভয় শব্দ স্নেহবাচক অর্থে ব্যবহৃত। হাদীছ বর্ণনাকারী সন্দেহ করিতেছেন যে, কোন শব্দটি কথিত হইয়াছিল। এই সন্দেহ ছাহাবীর পক্ষ হইতে হইতে পারে আবার নিম্নবর্তী কোন রাবী বর্ণনাকারীর পক্ষ হইতেও হইতে পারে।

(তিনবার বলিলেন) হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক কথাটা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলিলেন, যাহাতে উপস্থিত কাহারও কর্ণগোচর হইতে বাকী না থাকে। ছহী হাদীছে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিতেন তখন উহা তিনবার উচ্চারণ করিতেন যাহাতে শ্রোতাগণ উত্তমরূপে বুঝিয়া লয়।

(আমার পরে) যেহেতু অহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতেন যে, তাঁহার জীবদ্দশায় এইরূপ ঘটিবে না সেহেতু নিষেধবাণীকে তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সহিত খাছ করিয়াছেন।

(একে অপরের গলা কাটিও না) ইহা কুফুরি হইবার কয়েকটি অর্থ ওলামায়ে কেরাম বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ মুসলমানদের পারস্পরিক রক্তপাত তাহাদিগকে কুফুরি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ ইহা কাফিরদের মত আচরন। কেননা কাফিররাই তো মুসলমানদের গলা কাটিয়া থাকে। মুসলমান তো কোন মুসলমানের গলা কাটিতে পারে না। তৃতীয়তঃ আমার পরে তোমরা ধর্ম ত্যাগ করিও না। যদি কর তবে তোমরা পরস্পরের গলা কাটাকাটিতে লিপ্ত হইবে।

২০৯। অপরের জমি আত্মসাতের পরিণাম

وَعَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ(١) مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ» متفق عليه(٢).

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি জুলুম করিল (অর্থাৎ জবর দখল করিল) কিয়ামতের দিন তাহাকে (তাহার গলায়) সাত তবক যমিনের ঐ পরিমাণ (বেড়ী পরানো হইবে।) (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

এই হাদীছ দ্বারা সপ্ত পৃথিবীর কথা পরিষ্কার প্রমাণিত হইতেছে। আল কোরআনেও একই বিষয় রহিয়াছে।

اَللّٰهُ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ *

আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে।

প্রশ্ন হইল; সপ্ত পৃথিবী দ্বারা পৃথিবীর উপর নীচ সাতটি স্তর উদ্দেশ্য নাকি স্বতন্ত্র পৃথিবী উদ্দেশ্য। তদ্রূপ প্রতিটি স্তরের অথবা প্রতিটি পৃথিবীর আলাদা বায়ুমণ্ডল, শূন্যমণ্ডল আছে কি না এবং সেখানে স্বতন্ত্র প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না? এই সকল প্রশ্নের ব্যাপারে কোরআন নিরব। কেননা কোরআন বিজ্ঞান-গ্রন্থ নহে, ধর্ম-গ্রন্থ। যেহেতু এই সকল প্রশ্নের জওয়াব জানিবার উপর দ্বীন ও দুনিয়ার কোন কিছু নির্ভরশীল নহে সেহেতু কোরআন এই ধরণের আলোচনার অবতারণা করে নাই। এই সম্পর্কিত যে সমস্ত হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে ওলামায়ে কেরাম সেইগুলিকে জাল হাদীছ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। সুতরাং সেইগুলি বর্ণনা করা উচিত নহে। আমরা শুধু এই ঈমান পোষণ করিব যে, আসমানের ন্যায় যমিনও সাতটি যাহা আল্লাহ তা'আলা আপন কুদরতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার স্বরূপ ও হাকীকত আপন ইলমের মাঝেই গোপন রাখিয়াছেন। আর আল্লাহ যাহা প্রকাশ করেন নাই আমরা উহার পর্দা উন্মোচনের অনর্থক ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিব না। এই সম্পর্কে পূর্ববর্তী আকাবিরগণের উপদেশ হইল–

ابهموا ما ابهمه الله *

আল্লাহ যাহা অজ্ঞাত রাখিয়াছেন তোমরা উহাকে অজ্ঞাতই থাকিতে দাও।

(সাত তবক যমিনের বেড়ী পরানো হইবে) বেড়ী পরাইবার বিভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ তাহাকে সাত তবক যমিনের ঐ পরিমাণ বহন করিতে বলা হইবে এবং উহা পারিতে হইবে। অন্যথায় না পারিবার জন্য আলাদা শাস্তি হইবে। দ্বিতীয়তঃ আক্ষরিক অর্থেই তাহার গলায় সাত তবক যমিনের ঐ পরিমাণ দ্বারা বেড়ী তৈয়ার করিয়া তাহার গলায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। যেমন কোরআন শরীফে আছে–

سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ *

যেই মাল সর্ম্পকে তাহারা কৃপণতা করিয়াছে (যাকাত আদায় না করিয়া এবং আল্লাহর

রাস্তায় খরচ না করিয়া সঞ্চয় করিয়াছে) সেই মাল দ্বারা তাহাদিগকে (গলায়) বেড়ী পরানো হইবে।

অবশ্য আল্লাহ পাক তাহার গলাকেও ঐ রকম বড় করিয়া দিবেন যাহাতে এই ধরণের বেড়ী পরানো সম্ভব হয়। যেমন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জাহান্নামে একজন কাফিরের দাঁত অহুদ পাহাড়ের সমান হইবে এবং তাহার চামড়া তিনদিনের দূরত্বের সমান মোটা হইবে।

তৃতীয়তঃ তাহাকে সাত তবক যমিন পর্যন্ত দাবাইয়া দেওয়া হইবে। ফলে প্রত্যেক তবক ঐ অবস্থায় তাহার গলার বেড়ী স্বরূপ হইবে।

বুখারী শরীফে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত এই ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে। উহাতে আছে–

خسف به الى سبع ارضين *

(তাহাকে সাত তবক যমিন পর্যন্ত দাবাইয়া দেওয়া হইবে।)

চতুর্থতঃ তাহাকে হুকুম দেওয়া হইবে যে, ঐ এক বিঘত পরিমাণ সাত তবক যমীন দ্বারা বেড়ী তৈয়ার কর। কিন্তু সে উহা পারিবে না। তখন তাহাকে না পরিবার কারণেও শাস্তি দেওয়া হইবে। যেমন মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনাকারী সম্পর্কে হাদীছ শরীফে আসিয়াছে–

من كذب فى منامه كلف ان يعقد بين شعيرتين *

যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করিবে তাহাকে দুই যবের দানার মাঝে গিঠ দিবার হুকুম দেওয়া হইবে।

তদ্রূপ মূর্তি নির্মাণকারী ও ছবি অংকনকারী সম্পর্কে হাদীছে আসিয়াছে–

قال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من صور صورة فى الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة و ليس بنافخ *

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন ছবি অংকন করিবে (কিংবা মূর্তি তৈয়ার করিবে) তাহাকে কিয়ামতের দিন উহাতে রূহ ফুঁকিতে আদেশ করা হইবে কিন্তু সে রূহ ফুঁকিতে পারিবে না।

পঞ্চমতঃ যমিন আত্মসাৎ ও জবরদখল করিবার গোনাহ্ তাহার সহিত বেড়ীর মত লাগিয়া থাকিবে এবং ইহার শাস্তি হইতে কোনক্রমেই সে রেহাই পাইবে না। যেমন বেড়ী হইতে গলা বাহির করা সম্ভব নহে।

এমনও হইতে পারে যে, অপরের যমিন জুলুম করিয়া যে দখল করিবে তাহাকে উপরোল্লেখিত সমস্ত শাস্তিই দেওয়া হইবে। কিংবা অন্যায় ও জুলুমের পরিমাণ হিসাবে এক-এক জনকে এক-এক রকম শাস্তি দেওয়া হইবে।

(এক বিঘত যমিন) ইহার দ্বারা এই কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, হাদীছে বর্ণিত এই শাস্তি ভোগ করিবার ক্ষেত্রে যমিন কম বেশী হওয়া সবই সমান। হাঁ, যমিনের পরিমাণ হিসাবে শাস্তির মাত্রা তারতম্য হইতে পারে।

শিক্ষণীয় ঘটনা ঃ এই সম্পর্কে মুসলিম শরীফে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। হিশাম বিন উরওয়া তাঁহার আব্বা উরওয়া হইতে বর্ণনা করেন যে, আরওয়া বিনতে উয়াইস নাম্নী এক মহিলা (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ ছাহাবীর অন্যতম হযরত) সাঈদ বিন যায়দ (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে কিছু পরিমাণ যমিন আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপন করিল এবং (মদীনার প্রশাসক) মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট বিচার দায়ের করিল। তখন হযরত সাঈদ বিন যায়দ (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে একটি হাদীছ শুনিবার পর আমি কি তাহার জমির তিল পরিমাণও লইতে পারি? মারওয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আপনি কি শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি জুলুম করিয়া এক বিঘত পরিমাণ যমিনও গ্রহণ করিবে তাহাকে সাত তবক যমিন পর্যন্ত দাবাইয়া দেওয়া হইবে। মারওয়ান তাঁহাকে বলিলেন, ইহা শুনিবার পর (মামলায় বিচারের জন্য) আপনার নিকট আমি আর সাক্ষী চাহিব না। তখন হযরত সাঈদ বিন যায়দ (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, হে আল্লাহ! যদি সে মিথ্যাবাদি হয় তবে তাহাকে অন্ধ করিয়া দাও এবং তাহাকে তাহার যমিনেই হত্যা কর।

অন্য বর্ণনায় আছে, তাহার বাড়ীতেই তাহার কবর কর।

হিশাম বলেন, মৃত্যুর পূর্বেই ঐ স্ত্রীলোকের দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। অতঃপর একবার সে তাহার যমিনে হাঁটিতেছিল তখন হঠাৎ একটি গর্তে পড়িয়া মারা গেল।

অন্য এক বর্ণনায় বর্ণনাকারী মুহম্মদ বলেন, আমি তাহাকে দেখিয়াছি, অন্ধ অবস্থায় সে দেওয়াল হাতড়াইয়া চলাফিরা করিত আর বলিত, সাঈদ বিন যায়দের বদ-দু'আ আমাকে ধরিয়াছে।

একবার সে বাড়ীতে হাঁটিতে হাঁটিতে বাড়ীর এক কুয়ার পাশে গিয়া পৌঁছিল এবং উহাতে পড়িয়া গেল। ফলে ঐ কুয়াই তাহার কবর হইল।

আল্লাহ্ তাহার বান্দাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য মাঝে মধ্যে দুনিয়াতেই শাস্তি দেখাইয়া দেন। যেমন বিভিন্ন কবর হইতে আগুন ও ধোঁয়া বাহির হইতে দেখা গিয়াছে এবং কবর ভাংগিয়া যাইবার পর উহার ভিতরে কবরওয়ালার উপর বিভিন্ন আযাব হইতে দেখা গিয়াছে। এইগুলি আল্লাহ্ পাক বান্দাকে সতর্ক হইবার জন্য মাঝে মধ্যে দেখাইয়া থাকেন।

যাহারা আজ দুনিয়াতে ছলে-বলে-কৌশলে দুর্বল মানুষের সহায় সম্পদ আত্মসাৎ করিতেছে, অসহায় বিধবাকে তাহার শেষ সম্বল ভিটাবাড়ী হইতে শক্তিবলে বিতাড়িত করিতেছে. এক টুকরা যমিনের জন্য গোটা পরিবারকে খুন করিয়া ফেলিতেছে, এত কিছুর পরও আইন আদালতের বিচার তাহাদের পক্ষেই যাইতেছে, তাহারা কি মনে করে যে, মওত আসিবে না! কবর তাহাদিগকে চাপিয়া ধরিবে না এবং হাশরের মাঠে সাত তবক যমিনের বেড়ী তাহাদিগকে পরানো হইবে না! অবশ্যই মওত আসিবে।

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِى بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ *

যেখানেই তোমরা থাক মওত তোমাদিগকে পাকড়াও করিবে। এমন কি যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দূর্গে অবস্থান করিলেও

কোন সন্দেহ নাই যে, কবর এমনভাবে চাপিয়া ধরিবে যে, একদিকের হাড় অপরদিকে চলিয়া যাইবে। তদ্রূপ ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, হাশরের মাঠে সাত তবক যমিনের বেড়ী গলায় পরিতে হইবে। তবে কোন্ ভরসায় তাহারা জুলুম করিতেছে! মওত আসিবার পূর্বেই সাবধান হও। কাহারও এক বিঘত পরিমাণ যমিনও যদি তোমার দখলে থাকিয়া থাকে তবে অবিলম্বে উহা হকদারকে বুঝাইয়া দাও। বোনের হক যদি না দিয়া থাক তবে আজই উহার ফয়সালা করিয়া ফেল। কেননা কেহই বলিতে পারে না যে, মওতের পরওয়ানা কখন আসিয়া হাযির হইবে। আর আল্লাহ আমাদের সকলকে হিফাযত করুন। আমীন।

২১০। জালিমকে ঢিল দেওয়া হয়

وَعَنْ أَبِي مُوْسٰى رضي الله عنه قال: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ (٣) فَإذا أَخَذَه لم يُفْلِته ثم قَرَأ: ﴿ وَكَذٰلِكَ أَخذُ رَبِّكَ إذا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إنَّ أَخْذَه أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٢] متفق عليه(٤).

হযরত আবু মুসা (আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ জালিমকে সুযোগ দিয়া থাকেন। তবে যখন ধরেন তখন আর ফসকাইতে দেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করিলেন–

وَ كَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَ هِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ *

এমনই হইয়া থাকে তোমার প্রতিপালকের ধরা যখন তিনি বিভিন্ন জনপদকে ধরেন এমন অবস্থায় যে, তাহারা জুলুম করিয়াছে। নিঃসন্দেহে তাঁহার ধরা বড় যন্ত্রনাদায়ক ও কঠিন।

ফায়দা ঃ

(জালিমকে সুযোগ দিয়া থাকেন) অর্থাৎ জুলুম অবিচারের কারণে সংগে সংগে শাস্তি দেন না। বরং বিভিন্নভাবে তাহাকে সতর্ক করিতে থাকেন, যাহাতে সে সরল পথে ফিরিয়া আসে এবং অনুতপ্ত হইয়া তাওবা করে। কিন্তু যখন নির্ধারিত সময় আসিয়া পড়ে আর সেও তাহার জুলুমের উপর অটল থাকে, কোন কিছু হইতেই শিক্ষা গ্রহণ করে না, তখন তাহার অপরাধের কারণে তাহার উপর আল্লাহ আযাব নামিয়া আসে। আর উহা হইতে বাঁচিবার কোন উপায় তাহার থাকে না।

(ফসকাইতে দেন না) জুলুম দ্বারা যদি শিরক ও কুফুরি উদ্দেশ্য হয় তবে অর্থ এই যে, আমার আযাব তাহার উপর চিরস্থায়ী হইয়া যায়। কোন দিন ঐ আযাব হইতে সে পরিত্রাণ পাইবে না। পক্ষান্তরে জুলুম দ্বারা আমলের জুলুম উদ্দেশ্য হইলে অর্থ হইবে, দীর্ঘ দিন সে

জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করিবে। অতঃপর ঈমানের বরকতে কোন একদিন জাহান্নাম হইতে উদ্ধার পাইয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

(এমনই হইয়া থাকে তোমার প্রতিপালকের ধরা।) এই আয়াতের পূর্ববর্তী অয়াতগুলিতে আদ, ছামুদ ও অপরাপর জাতির অবাধ্যতা এবং উহার পরিণামে তাহাদের উপর নামিয়া আসা আযাবের কথা আলোচনা হইয়াছে। সেই দিকে ইংগিত করিয়া ইহা বলা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে, অতীতের জালিমদের পরিণতি স্মরণ করাইয়া ভবিষ্যতের জালিমদিগকে সতর্ক করা।

বস্তুতঃ পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস আলোচ্য হাদীছের সত্যতার সাক্ষী। প্রথমাবস্থায় জালিমদিগকে সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু তাহারা সতর্ক হইবার পরিবর্তে আরও বেশী অবাধ্য হইয়া পড়ে। যেমন ফেরআউন শেষ পর্যন্ত দাবী করিয়া বসিয়াছিল–

انا ربكم الاعلى *

আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক।

তাহাকে আল্লাহ সুযোগ দিলেন, কিন্তু সে আরও অবাধ্যতা প্রদর্শন করিল এবং দম্ভ ভরিয়া ঘোষণা করিল–

اليس لى ملك مصر و هذه الانهار تجرى من تحتى *

মিশরের রাজত্ব কি আমার নহে? আর এই নদ-নদী তো আমার পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়। তোমরা কি দেখ না?

কিন্তু যখন নির্ধারিত সময় আসিয়া গেল তখন আল্লাহ তাহাদের পাকড়াও করিলেন–

جفلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقنهم اجمعين *

যখন তাহারা আমাকে ক্রুদ্ধ করিল তখন আমি তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম। অনন্তর সকলকে ডুবাইয়া দিলাম।

আকীদার ক্ষেত্রে, আমলের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, সামাজিক পর্যায়ে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে যখনই কেহ জুলুমের পথে অগ্রসর হইয়াছে, আসমানী বিধান তাহার সহিত একই আচরণ করিয়াছে। কিয়ামত পর্যন্ত এইরূপই চলিতে থাকিবে।

২১১। মযলুমের বদ-দু'আ

وَعَنْ مُعاذٍ رضي الله عنه قال: بَعَثَني رسولُ اللهِ ﷺ فقال: «إِنَّكَ تَأتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ، فَادْعُهُم إلى شَهادةِ أَنْ لا إِلٰهَ إلا اللهُ، وَأَنِّيْ رسولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أطاعوا لِذٰلِكَ، فَأَعْلِمْهُم أَنَّ اللهَ قَدْ افترَضَ عليهم خَمْسَ صَلَوات في كُلِّ يَوْمٍ وَليلةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطاعوا لِذلك، فَأَعْلِمهم أَنَّ اللهَ قدِ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيائِهم فَتُرَدُّ على فُقَرائِهِم، فَإِنْ هُمْ أَطاعوا لِذٰلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرائِمَ أَمْوالِهِم(٢). وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمظلوم فَإِنه لَيْسَ بَيْنَها وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ» متفق عليه(٦).

হযরত মু'আয (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানের শাসক রূপে পাঠাইলেন। তখন তিনি বলিলেন, তুমি এমন এক কাওমের নিকট যাইতেছ যাহারা আহলে কিতাব। সুতরাং তাহাদিগকে তুমি এই সাক্ষ্য দান করিবার আহবান জানাইবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তাহারা ইহার আনুগত্য করে তবে তাহাদিগকে বলিও যে, প্রতি দিনে ও রাত্রে আল্লাহ্ তাহাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। যদি তাহারা ইহার আনুগত্য করে তবে তাহাদিগকে বলিও যে, আল্লাহ্ তাহাদের উপর যাকাত ফরয করিয়াছেন, যাহা তাহাদের ধনীদের নিকট হইতে লওয়া হইবে এবং তাহাদের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হইবে। যদি তাহারা ইহার আনুগত্য করে তবে তাহাদের উৎকৃষ্ট মাল গ্রহণ করা হইতে নিজেকে দূরে রাখিবে এবং মজলুমের বদ-দু'আকে ভয় করিও। কেননা উহার ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নাই।

ফায়দা ঃ

(ইয়ামানের শাসকরূপে পাঠাইলেন) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইয়ামান দেশে ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল। হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) বেশ কিছু মুসলমানসহ ইয়ামান হইতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়াছিলেন। ইয়ামানবাসীদের প্রশংসা করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اتاكم اهل اليمن هم الين قلوبا و ارق افئدة *

ইয়ামানবাসীরা তোমাদের নিকট আসিয়াছে। তাহারা নম্র হৃদয় ও কোমল অন্তরের অধিকারী। ঈমান ইয়ামানীদের জন্য এবং হিকমত ইয়ামানীদের জন্য।

ইয়ামানের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য হযরত মু'আয (রাঃ)-কে সেখানে পাঠানো হইয়াছিল নবম হিজরীতে তাবুক অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়। বিদায়ের সময় হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিয়াছিলেন, হয়ত তুমি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না, বরং ফিরিয়া আসিয়া আমার কবর যিয়ারত করিবে।

ঠিক তাহাই হইয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় তিনি মদীনায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং রাওযা পাক যিয়ারত করিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ ছাহাবা কেরামের জিন্দেগীতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যই ছিল সর্বাধিক প্রিয় বিষয়। কিন্তু দ্বীনের জন্য উহাও কোরবানী করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না।

(এমন এক কাওমের নিকট যাইতেছ যাহারা আহলে কিতাব।) অর্থাৎ ইহুদী ও নাছারা। ইয়ামানে তৎকালে আরব মুশরিকদের চাইতে ইহুদী ও নাছারারাই ছিল সংখ্যায় বেশী।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয (রাঃ)-কে এই সম্পর্কে অবহিত করিয়াছিলেন, যেন তাহাদিগকে দ্বীনের দাওয়াত দিবার জন্য যুক্তি-তর্ক তৈয়ার করিয়া লন। কেননা আসমানী কিতাবের অধিকারী বিধায় যুক্তি-তর্ক ছাড়া তাহারা কিছু মানিতে চাহে না।

পক্ষান্তরে আরব মুশরিকদের চিন্তা ভাবনা ছিল খুব সাদামাটা। তাই তাহাদিগকে দাওয়াত দেওয়া ছিল সহজ।

(যদি তাহারা উহার আনুগত্য করে) অর্থাৎ কালিমা উচ্চারণ করে এবং স্বীকার করিয়া লয়, তবেই তাহাদিগকে মুমিন রূপে গ্রহণ করিয়া লইবে এবং পরবর্তীতে আমলের দাওয়াত দিবে। বাকি তাহাদের অন্তরের খবর তো জানেন আল্লাহ পাক।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, দাওয়াতের যে নির্দেশ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয (রাঃ)-কে দিয়াছিলেন তাহা হইল কাফিরদের সহিত লড়াই শুরু করিবার পূর্ববর্তী দাওয়াত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার প্রেরিত সকল 'আমীর'কে এই নির্দেশ দিতেন। যদি ইতিপূর্বে তাহাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত না পৌঁছিয়া থাকে তবে লড়াই শুরু করিবার পূর্বে দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব ও বাধ্যতামূলক। অন্যথায় সুন্নত ও উত্তম।

ঈমানের ক্ষেত্রে কাফিরদের নিকট প্রথম দাবী কি? মুখের স্বীকৃতি না কি হৃদয়ের বিশ্বাস? এই সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সহ অধিকাংশ ইমামের মতে শরীয়তের সম্বোধনপ্রাপ্ত প্রত্যেক 'মুকাল্লাফ' [১] এর প্রথম কর্তব্য হইল আল্লাহ, রাসূল, কিতাব এবং রাসূলগণের আনীত যাবতীয় বিষয়-এর প্রতি অন্তরে নিঃসংশয় বিশ্বাস পোষণ। এই ঈমান ও বিশ্বাস যে ভাবেই অর্জিত হউক এবং যে পথেই তাহার আয়ত্তে উপনীত হউক।

মুখে কালিমায়ে তাওহিদের উচ্চারণ– ইহা হইল অন্তরে স্থিত ঈমানের অভিপ্রকাশ এবং ইসলামের আহকাম ও বিধান আরোপিত হইবার বাহ্য কারণ।

(যাহা তাহাদের ধনীর নিকট হইতে লওয়া হইবে।) আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, এই শব্দ দ্বারা বোঝা যায় যে, নিছাব পরিমাণ মালের অধিকারী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যাকাত আদায় না করিলে ইমাম তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক যাকাত গ্রহণ করিবেন। এই বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। তবে জোরপূর্বক গ্রহণ দ্বারা তাহার ফরয আদায় হইবে কি না তাহাতে মত পার্থক্য রহিয়াছে।

(উৎকৃষ্ট মাল গ্রহণ করা হইতে) আল্লামা মুহম্মদ বিন আল্লান (রহঃ) বলেন, উৎকৃষ্ট মাল গ্রহণ না করিবার হিকমত এই যে, যাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা। কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া উৎকৃষ্ট মাল গ্রহণ করিলে ধনীদের অন্তরে গরীবদের প্রতি সহানুভূতির পরিবর্তে বিরক্তি সৃষ্টি হইবে। পক্ষান্তরে নিকৃষ্ট মাল গ্রহণ করিলে গরীবদের হক নষ্ট হইবে। সুতরাং উভয়ের প্রতি সুবিবেচনা হইল মধ্যম ধরনের মাল গ্রহণ করা। বলাবাহুল্য যে, এই প্রশ্ন দেখা দেয় গবাদি পশু বা দ্রব্যাদির যাকাত পশু বা দ্রব্য দ্বারা আদায় করিলে। পক্ষান্তরে স্বর্ণ বা রৌপ্য তথা নগদ মুদ্রায় আদায় করিলে এই প্রশ্ন থাকে না। কেননা মুদ্রা সবই সমান। অবশ্য সেই ক্ষেত্রেও মূল্য নির্ধারণকালে সুবিবেচনা প্রদর্শন করিতে হইবে।

ইহা তো হইল শরীয়তের ইনছাফপূর্ণ হুকুম। পক্ষান্তরে যাকাত আদায়ের প্রতি ছাহাবা

১। প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী মানুষ যাহারা কোরআন শরীফের يايها الناس (হে লোক সকল)– এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত।

কেরামের আবেগ ও জযবা এবং শওক ও আগ্রহ কি পরিমাণ ছিল তাহা নিম্নের ঘটনা দ্বারাই কিঞ্চিত অনুমান করা যাইবে। যেহেতু হাদীছ শরীফের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যাকাতকে বর্তমানকালের অধিকাংশ মালদার মুসলমান ইবাদতের পরিবর্তে আর্থিক জরিমানা মনে করিতেছে, সেহেতু ঘটনাটি এইখানে উল্লেখ করিতেছি। হয়ত আমাদের মুর্দা দিলেও ঈমান তাজা হইবে এবং ছাহাবা কেরামের অনুকরণে আল্লাহর হুকুম মনে করিয়া আল্লাহকে খুশী করিবার উদ্দেশ্যে সন্তুষ্টচিত্তে যাকাত আদায় করিবার জযবা পয়দা হইবে। আল্লাহুম্মা আমীন।

হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রাঃ) বলেন, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে যাকাত উশুল করিতে পাঠাইলেন। আমি এক ব্যক্তির নিকট গেলাম, তিনি তাহার উটসমূহ আমার সামনে হাযির করিলেন, আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম যে, উহাতে এক বৎসর বয়সী একটি উটনী ওয়াজিব হয়। কিন্তু তিনি বলিতে লাগিলেন, 'এক বছরী' উটনীতে কি হইবে? সওয়ারির কাজেও আসিবে না, দুধও দিবে না। এই কথা বলিয়া তিনি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের মোটাতাজা বড় একটি উটনী বাহির করিলেন। আমি বলিলাম, আমি ইহা কবুল করিতে পারি না। তবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই সফরে আছেন এবং আজ আপনার নিকটেই তাঁহার মঞ্জিল হইবে। আপনি ইচ্ছা করিলে সরাসরি তাঁহার খিদমতে গিয়া উটনী পেশ করুন। তিনি অনুমতি করিলে আমি গ্রহণ করিব। ঐ ব্যক্তি উটনীসহ আমার সহিত চলিলেন। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার যাকাত গ্রহণের জন্য আপনার দূত আমার নিকট গিয়াছিল। আর আল্লাহর কসম! জীবনে প্রথম আমার এই সৌভাগ্য হইয়াছে। তাই আমি আপনার দূতের সামনে আমার সমস্ত উট পেশ করিলাম। তিনি ঐগুলি দেখিয়া বলিলেন, এক বৎসর বয়সী একটি উটনী ওয়াজিব হইয়াছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'এক বছরী' উটনী না দুধ দিবে, না সওয়ারি করিতে পারিবে। এই জন্য আমি ভাল দেখিয়া একটি উটনী তাহার খিদমতে পেশ করিলাম, যাহা এখন আমার সংগে আছে। কিন্তু তিনি উহা কবুল করিতে অস্বীকার করিলেন। এই জন্য উহা আপনার খিদমতে লইয়া আসিয়াছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহা কবুল করিয়া ধন্য করুন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার উপর উহাই ওয়াজিব হইয়াছে যাহা আমার দূত বলিয়াছেন। তবে তুমি যদি নফল হিসাবে অধিক বয়সের উৎকৃষ্ট উটনী দিতে চাহ তবে আল্লাহ পাক তোমাকে উহার বিনিময় দান করিবেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই জন্যই তো আমি ইহা সংগে আনিয়াছি। আপনি কবুল করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা কবুল করিবার অনুমতি দিলেন।

দেখুন; সাধারণ ছাহাবা কেরামের অন্তরেও যাকাতের মাল আদায় করিবার এমন জযবা বিদ্যমান ছিল যে, যাকাত দিতে পারাকে তাঁহারা গর্ব ও সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিতেন।

(মযলুমের বদ-দু'আ) হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, ইহার অর্থ হইল, জুলুম পরিহার কর, যেন কোন মজলুম তোমার বিরুদ্ধে বদ-দু'আ করিবার সুযোগ না পায়। যাকাত উশুলের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট মাল গ্রহণ করিতে নিষেধ করিবার পর মজলুমের বদ-দু'আ প্রসংগ দ্বারা এই দিকে ইংগিত করা হইয়াছে যে, যাকাত উশুলের বেলায় উৎকৃষ্ট মাল গ্রহণ করা জুলুম। তবে মৌলিকভাবে সর্বপ্রকার জুলুম সম্পর্কেই এখানে সতর্ক করা হইয়াছে।

(আড়াল নাই) অর্থাৎ তাহার বদ-দু'আ আল্লাহর দরবারে অবশ্যই পৌঁছিবে এবং কবুল হইবে। উহাকে আল্লাহর দরবার হইতে ফিরাইয়া রাখিবার কেহ নাই।

মজলুম যদি নাফরমান ও ফাসেক ফাজেরও হয়। তবু তাহার দু'আ কবুল হইবে। যেমন মুসনাদে আহমদে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে আছে–

دعوة المظلوم مستجابة و ان كان فاجرا ففجوره على نفسه *

মজলুমের দু'আ অবশ্যই মকবুল। যদি সে পাপাচারী হয় তবে তাহার পাপাচারের শাস্তি সে নিজে ভোগ করিবে।

এমনকি মজলুম যদি কাফিরও হয় তবু তাহার বদ-দু'আ কবুল হয়। কেননা কোরআন শরীফে মুশরিক পিতা-মাতার সহিত উত্তম আচরণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বোঝা গেল যে, মুশরিক হওয়ায় বান্দার কোন হক রহিত হয় না। অর্থাৎ শিরক করিয়া বান্দা আল্লাহর উপর যে জুলুম করিয়াছে উহার শাস্তি সে ভোগ করিবে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার উপর জুলুম করিবার হক নাই কাহারও। সুতরাং যদি সে মজলুম হইয়া বদ-দু'আ করে তবে আল্লাহ অবশ্যই তাহার দু'আ কবুল করিবেন।

এমন কি প্রাণীর বদ-দু'আও আল্লাহ কবুল করেন। হাদীছ শরীফে আছে বান্দার বদ আমলের কারণে পশু পাখীও কষ্ট পায় এবং বদ-দু'আ করে। পক্ষান্তরে বান্দার নেক আমলের কারণে বনের পশুপাখী এমন কি সমুদ্রের মাছও দু'আ করে।

হাদীছ শরীফে আছে, এক আনছারী তাহার উটনীকে অনাহারে অযত্নে কষ্ট দিত। সেই উটনী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহার মালিকের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছিল। ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে, পশুপাখীও মানুষের জুলুমের কারণে বদ-দু'আ করে।

ইবনে মাজা শরীফে এক রিওয়ায়াতে আছে, তিন প্রকার লোকের দু'আ ফেরত দেওয়া হয় না। ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর দু'আ, রোযাদারের দু'আ, যতক্ষণ না সে ইফতার করে এবং মযলুমের দু'আ। মযলুমের দু'আকে আল্লাহ মেঘের উপর তুলিয়া লন এবং বলেন, আমি অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করিব, যদিও (বিশেষ কোন কল্যাণের কারণে) বিলম্ব হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য হাদীছে রোযা ও হজ্জের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। অথচ হযরত মু'আয (রাঃ)-কে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ দিকে ইয়ামানে পাঠানো হইয়াছিল। আর তখন রোযা ও হজ্জের আহকাম নাযিল হইয়া গিয়াছিল।

ইহার কারণ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) আপন শায়খের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, যখন শরীয়তের আরকান বয়ান করা উদ্দেশ্য হয় তখন কোন রোকনের আলোচনা বাদ দেওয়া হয় না। যেমন হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে আছে–

بنى الاسلام على خمس *

পাঁচটি রোকনের উপর ইসলামের ভিত্তি রাখা হইয়াছে।

অতঃপর একে একে পাঁচটি রোকন উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই হাদীছে যেহেতু ইসলামের দাওয়াতের প্রসংগ ছিল সেহেতু শাহাদাত তথা ঈমান, ছালাত ও যাকাত এই তিন

রোকনের আলোচনাকেই যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। যদিও ঘটনাটি রোযা ও হজ্জ ফরয হইবার পরে হইয়াছে। যেমন আল কোরআনে ইরশাদ হইয়াছে–

فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ *

যদি তাহারা তাওবা করে নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে।

সূরাতুল বারাআতের দুই স্থানে ইহা বলা হইয়াছে। অথচ ঐ সূরা রোযা ও হজ্জ ফরয হইবার পরে নাযিল হইয়াছে। তদ্রুপ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে আছে–

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله و يقموا الصلوة و يؤتوا الكاة *

আমাকে মানুষের সহিত লড়াই করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেয় এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে।

ইহার হিকমত এই যে, পঞ্চ রোকন মোট তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। আকীদাসম্পর্কিত অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যদান। শরীরসম্পর্কিত অর্থাৎ নামায এবং অর্থসম্পর্কিত অর্থাৎ যাকাত। ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবার ক্ষেত্রে এই তিনটি বিষয় উল্লেখ করিবার উপর যথেষ্ট করা হয় যাহাতে ইহাদের উপরই অন্য দুইটির প্রকরণ করিয়া লওয়া যায়। কেননা রোযা নিছক শরীরসম্পর্কিত (কায়িক) ইবাদত। সুতরাং ইহা নামাযের শ্রেণীভুক্ত। আর হজ্জ হইল কায়িক ও আর্থিক ইবাদত। সুতরাং ইহা নামায ও যাকাত উভয় শ্রেণীভুক্ত।

ইহাছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, কালিমায়ে শাহাদাত হইল আসল এবং ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া কাফিরদের জন্য খুবই কঠিন। তদ্রুপ পুনঃপৌনিকতার কারণে নামাযের হুকুমও কঠিন। একইভাবে স্বভাবগত সম্পদাসক্তির কারণে যাকাতের হুকুমও কঠিন। সুতরাং কোন মানুষ যখন এই তিনটি হুকুম মানিয়া লইবে তখন সেই তুলনায় অন্যান্যগুলি তাহার জন্য সহজ হইয়া যাইবে।

২১২। সরকারী কাজে নিযুক্তদের জন্য শিক্ষা

وَعَنْ أبي حُمَيدٍ عَبْدِ الرحمنِ بْنِ سَعْدٍ الساعِدِيِّ رضي الله عنه قال: اِسْتَعْمَلَ النبيُّ ﷺ رَجُلاً مِنَ الْاَزْدِ يقالُ له: ابْنُ اللتبية[৭] عَلى الصدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قال: هٰذا لَكُمْ، وَهٰذا أُهْدِيَ إِلَيَّ، فَقامَ رسولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَاَثْنٰى عليه، ثم قال: «اَمَّا بَعْدُ فَإِني أَسْتعمِلُ الرجُلَ مِنْكُمْ على العَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللهُ، فَيَأتِي فيقولُ: هٰذا لكم، وَهٰذا هَدِيةٌ أُهدِيَتْ إلَيَّ، اَفَلا جَلَسَ في بَيْتِ اَبِيه اَوْ اُمِّه حَتّٰى تَأْتِيَه هَدِيَّتُه إنْ كانَ صَادِقًا، وَ اللهِ لا يَأْخُذُ اَحدٌ مِنكم شَيْئًا بِغَيرِ حَقِّه إِلَّا لَقِيَ اللهَ تعالى، يَحْمِلُه يومَ القيامَةِ، فلا اَعْرِفَنَّ احدًا مِنكُم لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا له رُغاءٌ[১]، اَوْ بَقَرَةً لها خُوارٌ، اَوْ شَاةً تَيْعَرُ» ثم رَفَعَ يَدَيْهِ حتى رُؤِيَ بياضُ إِبطَيْهِ فقال: «اَللّٰهُمَّ هل بَلَّغْتُ» ثَلاثًا. متفق عليه[২].

আবু হোমায়দ আব্দুর রহমান বিন সা'আদ সাঈদী (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযদ গোত্রের ইবনুল্লুতবিয়্যা নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত উশুল

করিবার কাজে নিযুক্ত করিলেন। তিনি (যাকাত উশুল করিয়া ফিরিয়া) আসিলেন এবং (উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে) বলিলেন, ইহা তোমাদের জন্য আর ইহা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হইয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়াইয়া আল্লাহর প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহার গুণ বর্ণনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন–

আম্মাবাদ, দেখ! আল্লাহ আমাকে যেই সকল কাজের দায়িত্ব দান করিয়াছেন সেইগুলির কোন একটি কাজে আমি তোমাদের কাহাকেও নিযুক্ত করি। কিন্তু সে আসিয়া বলে, ইহা তোমাদের জন্য আর ইহা আমাকে হাদিয়া করা হইয়াছে। আচ্ছা, সে তাহার বাবার কিংবা মায়ের ঘরে বসিয়া থাকুক না, যেন তাহার নিকট হাদিয়া আসিতে থাকে, যদি সে সত্যবাদী হয়। আল্লাহর কসম! তোমাদের কেহ যদি তাহার অনধিকার সত্ত্বেও কিছু গ্রহণ করে তবে কিয়ামতের দিন অবশ্যই সে উহা বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করিবে। আমি তোমাদের কাহাকেও যেন এমন না দেখি যে, সে আল্লাহর সামনে হাযির হইয়াছে এমন অবস্থায় যে, সে এক উট বহন করিতেছে যাহা ডাক ছাড়িতেছে কিংবা এমন গরু যাহা হাম্বা হাম্বা করিতেছে কিংবা এমন বকরী যাহা ভ্যা ভ্যা করিতেছে। অতঃপর তিনি তাঁহার উভয় হাত উঠাইলেন, এমন কি তাঁহার বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা গেল। আর তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছাইয়াছি?

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(আযদ গোত্রীয়) আযদ হইলেন উক্ত গোত্রের আদি পুরুষ। তাহার আসল নাম দাউদ, তাহার বংশ তালিকা এই রূপদাউদ বিন গাওছ বিন মালিক বিন রুদাদ বিন ফাহলান বিন সাবা বিন ইয়াশজুব বিন ইয়ারুব বিন কাহতান। আনছারদের অধিকাংশই আযদ গোত্রভুক্ত। হাদীছ শরীফে আযদ গোত্রের বহু প্রসংশা আসিয়াছে। এক হাদীছে আছে–

الازد جرثوسمة العرب *

আযদ হইল আরব জাতির গোড়া।

অপর এক হাদীছে আছে–

الازد اسد الله فى الارض ....:

আযদ গোত্র এই দুনিয়াতে আল্লাহর সিংহ। মানুষ তাহাদিগকে অবনত করিতে চাহে। কিন্তু আল্লাহ তাহাদিগকে উন্নত করিয়াই ছাড়িবেন। মানুষের সামনে এমন যামানা অবশ্যই আসিবে যখন সে আকাঙক্ষা করিয়া বলিবে, হায়, আমার আব্বা যদি আযদ গোত্রীয় হইত। হায়, আমার আম্মা যদি আযদ গোত্রীয়া হইত। (অবশ্য হাদীছটির সনদ অপরিচিত)

(ইবনুল্লুতবিয়্যাহ) ইহা তাঁহার কুনিয়াত বা উপনাম। আসল নাম হইল আব্দুল্লাহ।

(তোমাদের কাহাকেও নিযুক্ত করি) হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহৎ চরিত্রের ইহা একটি নমুনা যে, সংশোধনের উদ্দেশ্যে কাহারও কোন দোষের আলোচনা করিতে হইলে

তিনি ঐ ব্যক্তির নাম বলিতেন না। কেননা তাঁহার উদ্দেশ্য তো হইত এই ধরনের দোষ সম্পর্কে সতর্ক করা। আর এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও অন্য সকলেই সমান।

(যদি সে সত্যবাদী হয়) অর্থাৎ 'ইহা আমাকে হাদিয়া করা হইয়াছে' তাহার এই দাবী যদি সত্য হয়। কেননা তাহার দাবীর সারমর্ম তো এই যে, তাহার ব্যক্তি পরিচয়েই তাহাকে হাদিয়া করা হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে তো সরকারী কাজে বাহিরে না গিয়া নিজ বাড়ীতে বসিয়া থাকিলেও হাদিয়া আসিবার কথা। অথচ তাহা তো হয় না। সুতরাং বুঝা গেল যে, সরকারী পরিচয়ের কারণেই এই হাদিয়া সে লাভ করিয়াছে। এই হাদীছ পরিষ্কার প্রমাণ করে যে, কোন অজুহাতেই সরকারী কাজে নিযুক্ত অবস্থায় সরকারী লোকদের জন্য কাহারও হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয নহে, হারাম। প্রকৃতপক্ষে ইহা ঘুষেরই নামান্তর হইবে। এই ধরনের 'হাদিয়া' যাহারা গ্রহণ করিবে তাহাদের পরিণতি হাদীছের শেষাংশে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং যাহারা সরকারী কাজ করিয়া জনসাধারণের নিকট দাবী করিয়া অর্থ আদায় করে এবং ঘুষ গ্রহণ করে তাহাদের কি পরিণতি হইতে পারে!

(ডাক ছাড়িবে) এই সকল প্রাণীর আওয়াজ করিবার অর্থ এই যে, তাহাকে হাশরের মাঠে সকলের সামনে অধিক লজ্জিত করা হইবে।

(বগলদ্বয়ের শুভ্রতা) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বগলদ্বয়ে কোন চুল ছিল না। তাই শুভ্র দেখা যাইত। তদ্রূপ তাহাতে স্বাভাবিক দুর্গন্ধও ছিল না। ইহা তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল।

(কিয়ামতের দিন বহন করিবে) বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, গর্দানে বহন করিবে। অথচ আয়াত শরীফে আছে–

هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ *

তাহারা তাহাদের গোনাহ সমূহ পিঠে বহন করিবে।

এই আপাত বৈপরীত্বের নিরসন এই যে, ظهور (বা পিঠ) শব্দটি পিঠ ও সংলগ্ন অংশকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে পারে। কিংবা আয়াতে কাফিরদের গোনাহ সম্পর্কে বলা হইয়াছে। আর আলোচ্য হাদীছে মুমিনদের গোনাহ সম্পর্কে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ কাফিররা তাহাদের গোনাহ সমূহ পিঠে বহন করিবে আর মুমিনরা ঘাড়ে বহন করিবে। কিংবা সাধারণ গোনাহ পিঠে বহন করা হইবে। পক্ষান্তরে যাকাত উশুলকারী তাহার খেয়ানতের মাল ঘাড়ে বহন করিবে। তাহার এই বিশেষত্বের কারণ এই যে, তাঁহার গোনাহ দুই দিক হইতে হক নষ্টকারী। আল্লাহর হক এবং মানুষের হক।

২১৩। যাবতীয় জুলুম দুনিয়াতেই মাফ করাইয়া লওয়া উচিত

وَعَنْ ابي هُريرةَ رضي الله عنه عَنِ النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ كانَتْ عِنْدَه مَظْلَمةٌ لِأَخِيهِ؛ مِنْ عِرْضِه أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْه مِنهُ اليومَ قبلَ انْ لا يكونَ دِينارٌ ولا دِرْهَمٌ؛ إنْ كانَ له عَمَلٌ صالِحٌ أُخِذَ منه بِقَدْرِ مَظْلِمَتِه، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ له حَسَناتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئاتِ صَاحِبِه فَحُمِلَ عليه» رواه البخاري(٣).

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার নিকট তাহার ভাইয়ের ইজ্জত সংক্রান্ত বা অন্য কিছু সম্পর্কিত কোন 'জুলুম' পাওনা রহিয়াছে, উহা সে তাহার নিকট হইতে আজই যেন ক্ষমা করাইয়া লয়, ঐ সময় আসিবার পূর্বে যখন দীনার বা দিরহাম থাকিবে না। যদি তাহার নেক আমল থাকে তবে তাহার নিকট হইতে তাহার জুলুমের পরিমাণ উহা লওয়া হইবে। আর যদি তাহার নেক আমল না থাকে তবে তাহার প্রতিপক্ষের গোনাহ্ হইতে (ঐ জুলুম পরিমাণ গোনাহ্ লইয়া) তাহার উপর চাপানো হইবে। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

(অন্য কিছু সম্পর্কিত কোন জুলুম) অর্থাৎ বড় হইতে বড় জুলুম কিংবা সাধারণ হইতে সাধারণ জুলুম কোন কিছুই বাদ যাইবে না। সকল জুলুমের বদলা গ্রহণ করা হইবে। এমন কি কাহাকেও অন্যায় ভাবে একটি কড়া কথা বলিয়া থাকিলে উহারও বদলা লওয়া হইবে। অবশ্য যদি ঐ আল্লাহর বান্দা আপন উদারতার কারণে মাফ করিয়া দিয়া থাকে তবে ভিন্ন কথা। কিংবা যদি আল্লাহ্ পাক জুলুমকারী বান্দার কোন আমলে খুশী হইয়া তাহার নাজাতের ইচ্ছা করেন তবে ঐ মজলুম ব্যক্তিকে বলিতে পারেন যে, আমার বান্দার অমুক জুলুম তুমি মাফ করিয়া দাও; তাহা হইলে বিনিময়ে আমি তোমাকে এই নেয়ামত দিব। কিন্তু ইহার উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নহে। কেননা মজলুম ব্যক্তি মাফ করিল কি না তাহা তো জানা নাই। আর আল্লাহর রহ্মতের উপর ভরসা করিয়া যাহারা তাঁহার মহাপরাক্রম, ক্রোধ ও গযবের কথা ভুলিয়া যায় এবং নিজেদের অন্যায়, জুলুম ও গোনাহ্ সম্পর্কে গাফেল থাকে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ নারায হন। আল্লাহর রহমত ঐ ব্যক্তিদের উপরই হইয়া থাকে যাহারা দুনিয়াতে মানুষের হক আদায়ের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহার পরও কোন হক রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং আলোচ্য হাদীছের সতর্কবাণী স্মরণ করিয়া জীবনের সুযোগ থাকা অবস্থায় এখনই তৎপর হওয়া উচিত। কখন কাহার উপর কি জুলুম করা হইয়াছিল উহা তালাশ করিয়া করিয়া বাহির করা উচিত। অতঃপর মালের উপর জুলুম হইলে মাল আদায় করিতে হইবে। জানের উপর জুলুম হইলে মজলুমকে উহার বদলা গ্রহণের সুযোগ দিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ, কাহাকেও অন্যায়ভাবে চড় মারিয়া থাকিলে তাহাকে বলিতে হইবে যে, ভাই! তুমি আমাকে অনুরূপ একটি চড় মারিয়া দুনিয়াতেই ইহার বদলা গ্রহণ কর। যদি বদলা না লইতে চাও তবে মাফ করিয়া আখিরাতের আযাব হইতে আমাকে অব্যাহতি দাও।

যেমন বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার একজনকে দোররা মারিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহার মনে হইল যে, ইহা উচিত হয় নাই। তখন তিনি লোকটির দিকে দোররা আগাইয়া দিয়া বলিলেন, ভাই! তুমিও আমাকে একইভাবে দোররা মারিয়া বদলা গ্রহণ কর। কিন্তু লোকটি বলিল, আমীরুল মুমিনীন আমি আপনাকে মাফ করিয়া দিলাম। আল্লাহ্ আপনাকে মাফ করুন।

তদ্রূপ ইজ্জতের উপর জুলুম হইলে মজলুমের মনোকষ্ট যেই ভাবেই হউক দূর করিতে হইবে।

মজলুমের ইন্‌তিকাল হইয়া গেলে মালের জুলুমের ক্ষেত্রে তাহার ওয়ারিছদের নিকট মাল পৌঁছাইতে হইবে। অন্যান্য জুলুমের ক্ষেত্রে অব্যাহতি লাভের উপায় হইল তাহার জন্য বেশী বেশী ইস্তিগফার করিতে থাকা। তবে প্রয়োজনে হক্কানী আলিমের নিকট মাসআলা জানিয়া লওয়া কর্তব্য।

ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, মজলুমের কর্তব্য হইল নিজে আল্লাহর নিকট মাফ পাইবার আশায় মানুষের জুলুম মাফ করিয়া দেওয়া এবং নিজের হক ছাড়িয়া দেওয়া। হাদীছে আসিয়াছে–

وَ اعف عمن ظلمك *

যে তোমার উপর জুলুম করিয়াছে তাহাকে তুমি মাফ করিয়া দাও।

আল্লাহ পাক মানুষকে ক্ষমা করিবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন–

الا يحبون ان يغفر الله لكم *

তোমরা কি চাহ না যে, আল্লাহ তোমাদিগকে মাফ করিয়া দেন?

(যখন দীনার দিরহাম থাকিবে না) অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষ যদি কাহারও নিকট হইতে দায়মুক্ত হইতে চাহে তবে অর্থ ব্যয় করিয়া দায়মুক্ত হইতে পারে। কেননা দুনিয়াতে টাকা পয়সা বিনিময় রূপে প্রচলিত আছে। কিন্তু আখিরাতে অর্থ ও সোনা চাঁদি বিনিময় রূপে গ্রহণযোগ্য নহে।

فَلَنْ يُّقبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَ لَوِ افْتَدٰى بِهٖ *

তাহাদের কাহারও নিকট হইতে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও গ্রহণ করা হইবে না। যদিও সে উহা মুক্তিপণ রূপে দিতে চাহে।

বরং আখিরাতে নেক আমলই বিনিময় রূপে গ্রহণযোগ্য একমাত্র জিনিস। সুতরাং সেইখানে নেক আমল দ্বারাই হক আদায় করিতে হইবে।

আলোচ্য অধ্যায়ের ১৬ নম্বর হাদীছে বিষয়টি আরও পরিষ্কার রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

(প্রতিপক্ষের গোনাহ তাহার উপর চাপানো হইবে) প্রশ্ন হইতে পারে যে, কোরআন শরীফে তো বলা হইয়াছে–

وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى *

কেহ অপরের গোনাহের বোঝা বহন করিবে না।

উত্তর এই যে, আয়াত ও হাদীছের মাঝে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা তাহাকে তাহার জুলুমের কারণেই শাস্তি দেওয়া হইতেছে। অপরাধ ছাড়া তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে না। নেক আমল ও বদ আমলের এই বিনিময় বান্দাদের মাঝে আল্লাহ পাকের ইনছাফেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

২১৪। পূর্ণ মুসলমানের আলামত

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ رضي الله عنهما عَنِ النبيِّ ﷺ قال: «الْمسلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمونَ مِنْ لِسانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى اللهُ عنه» متفق عليه(٤).

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, (পূর্ণ) মুসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার জিহ্‌বা ও হাত হইতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। আর (প্রকৃত) মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয় ত্যাগ করে।

ফায়দা ঃ

হাদীছের বর্ণনায় দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল– ای الاسلام خیر ইসলামের কোন আমল সর্বোত্তম? অন্য বর্ণনায় আছে– ای المسلمین خیر কোন মুসলমান সর্বোত্তম? ইহার উত্তরে একবার তিনি বলিয়াছেন–

ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت و على من لم تعرف *

ইসলামের সর্বোত্তম আমল হইল (অভাবীকে) আহার দান করা এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে ছালাম করা।

কিন্তু অপর প্রশ্নকারীর উত্তরে বলিয়াছেন, পূর্ণ মুসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার জিহ্‌বা ও হাত হইতে মুসলমানগণ পূর্ণ নিরাপদ থাকে।

বস্তুতঃ প্রশ্নকারীগণের অবস্থার বিভিন্নতার কারণে উত্তর বিভিন্ন হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রথম প্রশ্নকারীর মাঝে এই দুইটি আমলের অভাব ছিল তাই তাহাকে এই দিকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রশ্নকারীর মাঝে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হইতে বিরত থাকিবার গুণ অর্জনের প্রয়োজন অধিক ছিল। তাই তাহাকে সেই দিকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে।

(মুসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার জিহ্‌বা ও হাত হইতে) এখানে মুসলমান দ্বারা পূর্ণ মুসলমান উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যাহার মাঝে এই গুণটি আছে সে পূর্ণ মুসলমান। আর যাহার মাঝে এই গুণটি নাই সে পূর্ণ মুসলমান নহে। তবে ইসলামের গণ্ডি হইতে বাহিরেও নহে।

(মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে) এখানে মুসলমানগণ কথাটা সাধারণ অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা হইয়াছে। কেননা মুসলমানদের উঠা-বসা, লেন-দেন সাধারণতঃ মুসলমানদের সংগেই হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ তাহার জিহ্‌বা ও হাত হইতে নিরাপদ থাকিবে। কেননা ইসলাম দুইটি একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিপালকের একত্ব এবং মানব জাতির একত্ব। আমাদের রব ও প্রতিপালক এক। তদ্রূপ আমাদের আদি পিতাও এক। সুতরাং এক আল্লাহর সৃষ্টি এবং এক আদমের সন্তান হিসাবে সকলেই আমাদের উত্তম আচরণ লাভের যোগ্য। হাদীছ শরীফে الخلق عيال الله বলিয়া গোটা মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহর পরিবারভুক্ত সাব্যস্ত করা হইয়াছে এবং যাহারা আল্লাহর পরিবারভুক্তদের সহিত সদাচার করিবে আল্লাহও তাহাদের সহিত সদাচার করিবেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

আরও ইরশাদ হইয়াছে–

الناس بنو آدم و خلق الله آدم من تراب *

মানুষ আদমের সন্তান আর আল্লাহ্ আদমকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন।

হাত ও জিহ্বার কথা বিশেষভাবে বলিবার কারণ এই যে, জিহ্বা হইল অন্তরের ভাব ও মনোভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। পক্ষান্তরে অধিকাংশ কাজ হাত দ্বারা সমাধা করা হয়। নচেৎ অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ সম্পর্কেও একই কথা। অর্থাৎ কোন ভাবেই অপর মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেওয়া চলিবে না।

জিহ্বার দিক হইতে হাদীছটি হাতের তুলনায় ব্যাপক। কেননা জিহ্বা দ্বারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সর্বকালের লোকদের সম্পর্কে কথা বলা যায়। পক্ষান্তরে হাতের ক্ষমতা শুধু বর্তমান লোকদের পর্যন্ত। অবশ্য লেখার বিষয়টি বিবেচনায় আনিলে জিহ্বার মত হাতের পরিধিও অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বরং লেখার ক্রিয়া মানুষের মুখের কথার চাইতে দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী।

কথার পরিবর্তে জিহ্বা শব্দ ব্যবহার করিবার হিকমত এই যে, অনেক সময় কথা না বলিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া ভেংচি কাটিয়াও কষ্ট দেওয়া যায়।

ওলামায়ে কেরাম এইখানে একটি সুন্দর কথা এই বলিয়াছেন যে, 'মুসলমানগণ' এর মধ্যে সে নিজেও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

অর্থাৎ সে নিজেকেও যেন আপন জিহ্বার কষ্ট হইতে হিফাযত করে এবং জিহ্বা দ্বারা এমন কথা না বলে যাহাতে অপরের তো কষ্ট হইল না। কিন্তু সে নিজে দুনিয়া বা আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

আল্লামা মুহম্মদ বিন আল্লান (রহঃ) বলেন, হাত দ্বারা স্থূল হাত যেমন উদ্দেশ্য হইতে পারে তেমনি রূপক হাতও উদ্দেশ্য হইতে পারে। যেমন অপরের অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা।

(প্রকৃত মুহাজির) مهاجر শব্দটি هجر ধাতুমূল হইতে নির্গত। ইহার অর্থ ত্যাগ, বর্জন। হাদীছের অর্থ এই যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং দ্বীন ও ঈমান রক্ষার তাগিদে যিনি সহায় সম্পদ ও আপনজনদের মায়া উপেক্ষা করিয়া প্রিয় স্বদেশ ত্যাগ করেন শরীয়তের পরিভাষায় তাহাকে মুহাজির বলে। আর এই হিজরতের অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে ইহাও ঠিক। তবে ইহা হইল যাহেরী হিজরত। আর-এক প্রকার হিজরত হইল বাতেনী হিজরত। মানুষ নিজ দেশে নিজ সহায় সম্পদ ও পরিবার পরিজনের মাঝে থাকিয়াও এই হিজরত করিতে পারে এবং হিজরতের ছাওয়াব হাছিল করিতে পারে। তাহা হইল আল্লাহকে ভয় করিয়া এবং আল্লাহকে ভালবাসিয়া তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তিনি যাহা হারাম ও নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা ত্যাগ করা। এমন ব্যক্তি হইল আসল মুহাজির।

সম্ভবতঃ ইহা মদীনায় আগত মুহাজিরগণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যেন তাহারা নিজেদের হিজরতের (ফযীলতের) উপর ভরসা করিয়া বসিয়া না থাকেন এবং আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে কোনরূপ ত্রুটি ও অলসতা না করেন।

এমনও হইতে পারে যে, মক্কা বিজয়ের পর যখন হিজরত বন্ধ হইয়া গেল এবং ঘোষণা দেওয়া হইল। لا هجرة بعد الفتح (মক্কা বিজয়ের পর কোন হিজরত নাই) তখন নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তরে আফসোসের কোন সীমা থাকিল না যে, হিজরতের মহাফযীলত হইতে তাহারা মাহরূম হইয়া গেল। তখন তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহেরী হিজরত যদিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে কিন্তু যে কোন মুসলমান আপন নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদা করিয়া এবং আল্লাহ্ পাকের নিষিদ্ধ কাজসমূহ ত্যাগ করিয়া হিজরতের হাকীকত হাছিল করিতে পারে।

২১৫। আমানতে খেয়ানতের পরিণাম

وعنه رضي الله عنه قال: كانَ عَلى ثَقَلِ(٥) النبيِّ ﷺ رَجُلٌ يقال له كَرْكَرَةُ، فَمَاتَ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ في النارِ» فَذَهَبوا يَنْظُرون إليهِ(٦) فوَجَدُوا عَباءَةً قَدْ غَلَّها. رواه البخاري(٧).

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, কিরকিরা নামক এক ব্যক্তির উপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামানপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল। সে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে জাহান্নামী। তখন ছাহাবা কেরাম তাহার (জাহান্নামী হইবার) কারণ তালাশ করিতে গেলেন এবং একটি আবা দেখিতে পাইলেন যাহা সে খেয়ানত করিয়াছিল। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

(সে মারা গেল) সম্ভবতঃ কোন এক রিওয়ায়াতে আছে যে, লোকটি যুদ্ধ শেষ হইবার পর হঠাৎ একটি চোরা তীরে বিদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছিল।

(সে জাহান্নামী) অর্থাৎ এই গোনাহের কারণে সে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত জাহান্নামের আযাব ভোগ করিবে। অতঃপর আযাব হইতে মুক্ত হইয়া জান্নাতে যাইবে। কিংবা অর্থ এই যে, সে এমন এক অপরাধ করিয়াছে যাহার অনিবার্য পরিণতি হইল জাহান্নাম, যদি আল্লাহ্ পাক স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা না করেন। আর যদি ক্ষমা করিয়া দেন তবে কাহার কি বলিবার থাকিতে পারে?

(আবা) এক ধরনের পোশাক।

(খেয়ানত করিয়াছিল) হাদীছে غل শব্দটি রহিয়াছে। ইহার ক্রিয়ামূল হইল غلول -এর অর্থ জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুদের যে সমস্ত মাল হস্তগত হয়; যাহাতে সকল মুজাহিদের মালিকানা বিদ্যমান থাকে সেই গণীমতের মালে খেয়ানত করা। বস্তুতঃ গনীমতের মাল চুরি করা সাধারণ চুরির চাইতে অনেক বেশী জঘন্য ও ভয়াবহ। কেননা উহার সহিত মুজাহিদ বাহিনীর সকল মুজাহিদের অধিকার যুক্ত থাকে। সুতরাং ইহা হইতে তাওবা করিতে হইলে প্রত্যেক মুজাহিদকে তাহার হক ফেরত দিতে হইবে কিংবা তাহার নিকট হইতে মাফ লইতে হইবে। কিন্তু সকলকে তালাশ করিয়া বাহির করা অতি দুরূহ ব্যাপার। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট একজনের মাল চুরি করিলে তাহার হক ফেরত দেওয়া কিংবা মাফ চাহিয়া লওয়া তুলনামূলক সহজ ব্যাপার। যেমন এক যুদ্ধে জনৈক ব্যক্তি কিছু পশম রাখিয়া দিয়াছিল। গনীমতের মাল

বন্টন শেষ হইবার পর তাহার মনে অনুশোচনা হইল এবং পশমগুলি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির করিল, কিন্তু তিনি রহমাতুল্ লিল আলামীন হওয়া সত্ত্বেও এই বলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন যে, এখন এইগুলি সমগ্র বাহিনীর মাঝে বন্টন করা কিভাবে সম্ভব? সুতরাং কেয়ামতের দিন তুমিই এইগুলি বহন করিয়া হাযির হইও।

সাধারণ চুরি ও গনীমতের মাল চুরির আরেকটি পার্থক্য এই যে, কিয়ামতের দিন গনীমতের চুরি করা মাল কাঁধে বহন করিয়া সে হাযির হইবে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষের সামনে তাহাকে অপদস্থ করা হইবে। হাশর মাঠের এই লাঞ্ছনা এমনই কঠিন হইবে যে, এক বর্ণনা মতে ঐ ধরনের লোকেরা তখন কামনা করিতে থাকিবে যে, আমাদিগকে জাহান্নামে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। তবু যেন এই লাঞ্ছনা হইতে বাঁচিয়া যাই।

তাহারা উপায় না দেখিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদিগকে উদ্ধার করুন। তিনি বলিবেন, এখন আমার কিছুই করিবার নাই। আমি তো তোমাদিগকে সতর্ক করিয়াছিলাম।

উল্লেখ্য যে, মসজিদ, মাদরাসা, ওয়াকফসম্পত্তি ও সরকারী মালের খেয়ানত করাও গুলূলের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এইগুলিতেও হাজার হাজার (এমন কি লক্ষ লক্ষ মানুষের মাল জড়িত।) অথচ মানুষ এই গুলিকে চুরি করা অতি সহজ মনে করিতেছে এবং মোটেও ভাবিয়া দেখিতেছে না যে, দুনিয়াতে এই চুরির মাল হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই। কেননা এই সমস্ত মালের যিম্মাদার যাহারা তাহাদের মাফ করিবার অধিকার নাই। বরং যাহাদের মাল সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট হইতে মাফ লইতে হইবে যাহা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং হাশর মাঠের চরম লাঞ্ছনা এবং জাহান্নামের কঠিন শাস্তিই হইল তাহাদের শেষ পরিণতি।

এমন কি হুজুর আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত হইতে বঞ্চিত হইবারও পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। (নাউযুবিল্লাহ)

২১৬। মুসলমানদের জান-মাল ও ইয্যত আবরুর পবিত্রতা

وَعَنْ اَبِي بَكْرَةَ نُفَيعِ بْنِ الحارِثِ رضي الله عنه عَنِ النبيِّ ﷺ قال: «إن الزمانَ قَدِ اسْتَدارَ[٨] كَهَيْئَتِهِ يومَ خَلَقَ الله السَمواتِ وَالْاَرْضَ: السَنَةُ اثْنا عَشَرَ شَهْراً، مِنها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلاثٌ مُتَوالِياتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الحِجةِ، وَالْمُحَرَّم، وَرَجَبُ مُضَرَ[٩] الذي بَيْنَ جُمادَى وَشَعْبانَ، أيُّ شَهرٍ هذا؟» قلنا: اللهُ ورسولَه اَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنه سَيُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِه، قال: اَلَيْسَ ذا الحِجَّةِ؟ قُلنا: بَلٰى. قال: «فَاَيُّ بَلَدٍ هذا؟»، قُلْنا: اللهُ وَرسولُه اَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّه سَيُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِه. قال: «اَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟» قلنا: بَلٰى. قال: فَاَيُّ يومٍ هٰذا؟» قُلنا: اللهُ وَرَسولُه اَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّه سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِه. قال: «اَلَيْسَ يومَ النحرِ؟» قُلنا: بَلٰى. قال: «فَإِنَّ دِماءَكُمْ وَاَمْوالَكُم وَاَعْراضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُم هذا في بَلَدِكُمْ هٰذا في شَهْرِكُم هٰذا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ

فَيَسْأَلُكُم عَنْ أَعْمالِكُم ، أَلَا فَلا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ ، فَلَعَلَّ بعضَ مَن يُبَلِّغُه أَنْ يكونَ أَوْعَى له مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَه» ثم قال: «أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قُلنا: نَعم. قال: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» متفق عليه(١).

হযরত আবু বাকরাহ নোফায় বিন হারিছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন সময় তাহার সেই দিনের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। বার মাসে এক বৎসর। ইহার মধ্যে চারি মাস হইল পবিত্র মাস। জিলকদ, জিলহজ্জ ও মুহররম– এই তিনমাস হইল লাগাতার আর (চতুর্থ মাস হইল) মুযার গোত্রের রজব যাহা জুমাদাল উখরা ও শাবানের মাঝে রহিয়াছে।

(অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন) ইহা কোন মাস? আমরা বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল অধিক জানেন। তখন তিনি নিরব রহিলেন, এমন কি আমরা ভাবিলাম যে, তিনি এই মাসের অন্য কোন নাম বলিবেন। তখন তিনি বলিলেন, ইহা কি যিলহজ্জ নহে? আমরা আরয করিলাম, অবশ্যই। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, ইহা কোন শহর? আমরা বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল অধিক জানেন। তখন তিনি নিরব রহিলেন, এমন কি আমরা ধারণা করিলাম যে, তিনি এই শহরের অন্য কোন নাম বলিবেন। তখন তিনি বলিলেন, ইহা কি (মক্কা) শহর নহে? আমরা বলিলাম, অবশ্যই। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, ইহা কোন দিন? আমরা আরয করিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই অধিক জানেন। তখন তিনি নিরব রহিলেন, এমন কি আমরা ভাবিলাম যে, তিনি এই দিনের অন্য কোন নাম রাখিবেন। তখন তিনি বলিলেন, ইহা কি ইয়াওমুন্নহর (যিলহজ্জের দশ তারিখ) নহে? আমরা বলিলাম, অবশ্যই।

তিনি বলিলেন, তোমাদের এই মাসে তোমাদের এই শহরে তোমাদের এই দিনটি যেমন পবিত্র, তোমাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুও তোমাদের জন্য তেমনি পবিত্র। আর অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সংগে মিলিত হইবে। তখন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। সুতরাং সাবধান, আমার (মৃত্যুর) পরে তোমরা কুফুরিতে লিপ্ত হইও না; এইভাবে যে, একে অপরের গর্দানে তলোয়ার চালাইবে। শোন, উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে (আমার বাণীসমূহ) পৌঁছাইয়া দেয়। কেননা হইতে পারে যে, যাহাদের নিকট পৌঁছানো হইবে তাহাদের কেহ কেহ যাহারা শ্রবণ করিয়াছে তাহাদের কাহারও কাহারও চাইতে অধিক সংরক্ষণকারী হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, শোনো! আমি কি আমার প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছাইয়াছি? শোনো! আমি কি আমার প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছাইয়াছি? আমরা বলিলাম, অবশ্যই পৌঁছাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন) অর্থাৎ বিদায় হজ্জে দশ তারিখের খোতবায়।

(সময় তাহার সেই দিনের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে) সময় দ্বারা এইখানে বৎসর উদ্দেশ্য, যেমন পরবর্তীতে বলা হইয়াছে, বার মাসে এক বৎসর।

(যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন) আমাদের বর্তমান সময়ের সম্পর্ক হইল সৌরজগত তথা চন্দ্র-সূর্য ও পৃথিবীর ঘূর্ণনের সহিত। সৌরজগত সৃষ্টির পূর্বে বৎসর, মাস ও দিনভিত্তিক কোন সময় ছিল না। যেমন জান্নাতে এই ধরনের কোন সময় থাকিবে না। সুতরাং 'যেদিন আসমান যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন'-এর অর্থ হইল যেদিন চন্দ্র সূর্য তথা সৌরজগত সৃষ্টি করিয়াছেন।

(প্রত্যাবর্তন করিয়াছে) অর্থাৎ আসমান যমীন তথা চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টির পর সময়ের বৎসর ও মাসের যে বিন্যাস ও রূপ কাঠামো ছিল, বিদায় হজ্জের কালে সময় সেই রূপ কাঠামোতে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করিয়াছে (সামনে ইহার ব্যাখ্যা আসিতেছে।)

(চারি মাস পবিত্র) জাহেলী যুগেও আরবরা এই চারি মাসে রক্তপাত ও লুট তারাজ বন্ধ রাখিত। এমন কি পিতৃ-হন্ত্য বা পুত্র-ঘাতককে হাতের নাগালে পাইলেও হত্যা করিত না।

حرم শব্দটির দুই অর্থ। এক অর্থ হইল নিষিদ্ধ। অর্থাৎ এই চারি মাসে রক্তপাত ও যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ, যেমন জাহেলী আরবদের মাঝে ছিল। দ্বিতীয় অর্থ হইল পবিত্র। অর্থাৎ এই চারি মাস অতীব বরকতপূর্ণ। ইহাতে ইবাদতের ছাওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। প্রথম বিষয়টি ইসলামী শরীয়তে রহিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই চারিমাসে প্রয়োজন হইলে জিহাদ ও যুদ্ধ করা যাইতে পারে। কোন নিষেধ নাই। তবে দ্বিতীয় বিষয়টি শরীয়তে বহাল রহিয়াছে। অর্থাৎ এই মাসগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং অধিক ছাওয়াবের জন্য অধিক পরিমাণ ইবাদতে নিমগ্ন হইবার হুকুম শরীয়তে এখনও রহিয়াছে।

(মুযার গোত্রের রজব) মুযার গোত্রের সহিত রজবের সম্বন্ধ করিবার কারণ এই যে, এই মাসকে সকল আরব গোত্রের মাঝে তাহারাই অধিক পবিত্র মনে করিত।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা আরবদের 'নাসা' প্রথা বাতিল করা হইয়াছে, যাহাকে কোরআন শরীফে কুফুর বলা হইয়াছে।

انما النسيء زيادة فى الكفر *

মাস পিছাইয়া দেওয়া অধিক কুফুরি ছাড়া কিছুই নহে।

ইহার ব্যাখ্যা এই যে, আরবদের জীবিকার বড় উৎস ছিল লুণ্ঠন ও লড়াই। ইহাছাড়া হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ ছিল তাহাদের মজ্জাগত। সুতরাং লাগাতার তিন মাস যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া থাকা তাহাদের পক্ষে কঠিন ছিল। তাই তাহারা মুহররম মাসকে পিছাইয়া ছফরে লইয়া যাইত।

ইহাছাড়া সৌর বর্ষের সহিত সংগতিবিধানের উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর হজ্জপর্বকে তাহারা এগার দিন পিছাইয়া দিত। এই ভাবে ছত্রিশ বৎসর পর হজ্জ উহার সঠিক সময়ে ফিরিয়া আসিত। এই উভয় প্রকার সময় পরিবর্তনের কারণে মাস ও বৎসরের হিসাব তালগোল পাকাইয়া গিয়াছিল। সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ পাক সময় তথা বর্ষ ও মাসের যে বিন্যাস

রাখিয়াছিলেন উহা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। অথচ হজ্জ ইবাদতের জন্য সঠিক সময় নির্ধারণ জরুরী ছিল।

আল্লাহ্ পাকের কুদরত ও হিকমত এই যে, নবম হিজরীতে বিদায় হজ্জ আল্লাহ্র নির্ধারিত সময়ে (যাহা তিনি আসমান যমীনের সৃষ্টির সময় নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন) অর্থাৎ সঠিক যিলহজ্জ মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আল্লাহ্ পাক আসমান যমীন সৃষ্টি করিবার দিন সময় যে বিন্যাসে শুরু হইয়াছিল উহা সেই অবস্থায় পুনঃপ্রত্যাবর্তন করিয়াছে। (এবং আল্লাহ্ পাক যেই মাসকে যিলহজ্জ রূপে নির্ধারণ করিয়াছিলেন এই বৎসর সেই মাসেই যিলহজ্জ হইয়াছে। সুতরাং এখন হইতে আর সময়ের নড়চড় করা চলিবে না।)

(ইহা কোন মাস?) আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রশ্ন করিবার এবং প্রত্যেক প্রশ্নের পর নিরবতা অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্য ছিল ছাহাবা কেরামের পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং পরবর্তী বক্তব্যের গুরুত্ব ও বড়ত্ব তাঁহাদের চিন্তায় বদ্ধমূল করা।

(আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই অধিক জানেন) ইহা ছাহাবা কেরামের উত্তম আদব, শিষ্টাচার ও প্রজ্ঞার নমুনা। কেননা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, এই প্রশ্নের সাধারণ যে উত্তর তাহারা জানেন তাহা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অজানা নহে। সুতরাং সাধারণ উত্তর তাঁহার উদেশ্য নিশ্চয় নহে। বরং নিগূঢ় কোন রহস্য উদ্দেশ্য। তাই তাঁহারা নিজেদের অজ্ঞতা এবং সেই সংগে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের 'বিজ্ঞতার' অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ঘোষণা করিয়াছেন।

(এমন কি আমরা ধারণা করিলাম) অর্থাৎ দীর্ঘ নিরবতার কারণে আমাদের ধারণা যে, তিনি এই মাসের এবং এই শহরের এবং এই দিনের পরিচিত নামের পরিবর্তে অন্য কোন উপযুক্ত নাম চিন্তা করিতেছেন।

(তোমাদের এই মাসে, তোমাদের এই শহরে, তোমাদের এই দিনটি যেমন পবিত্র) এখানে মুসলমানের জান-মাল ও আবরু-ইজ্জতের হুরমত ও পবিত্রতাকে উল্লেখিত মাস, শহর ও দিবসের পবিত্রতার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। নিয়মমতে যাহার সহিত তুলনা করা হইবে তাহার মাঝে গুণটি অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকিবে। অথচ ইহা সর্বসম্মত যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে আলোচ্য দিন, মাস ও শহরের পবিত্রতার চাইতে মুসলমানের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর মর্যাদা ও পবিত্রতা অনেক বেশী। ইহা সত্ত্বেও দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির সহিত তুলনা করা হইল কিভাবে? আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ইহার উত্তরে বলেন, ইহার কারণ এই যে, আরবদের চিন্তায় ও মানসিকতায় এই জিনিসগুলির মর্যাদা ও পবিত্রতা বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর কোন মর্যাদা জাহেলী যুগে ছিল না। তাই ঐ গুলির পবিত্রতার সহিত এইগুলির পবিত্রতাকে তুলনা করা হইয়াছে।

(একে অপরের গর্দানে তলোয়ার চালাইবে) আলোচ্য অধ্যায়ের তৃতীয় হাদীছে ইহার ব্যাখ্যা গিয়াছে।

(তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন) অন্য রিওয়ায়াতে আছে—

و النار عن شمائلك و الجنة عن ايمانك، و الموازين قد نصبت، و الصراط قد نصب على متن جهنم و الرسل شعارهم يومئذ سلم سلم، و الشهود الجوارح و الحاكم الاعظم قد تجلى و غضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله *

(তখন) জাহান্নাম তোমাদের বাম দিকে এবং জান্নাত তোমাদের ডান দিকে হইবে এবং মিযান ও দাঁড়িপাল্লা স্থাপিত হইবে এবং জাহান্নামের উপর পোলছিরাত কায়েম হইবে। আর সেদিন রাসূলগণের একমাত্র বক্তব্য হইবে (হে আল্লাহ্) রক্ষা কর। রক্ষা কর। আর অংগ প্রত্যংগ হইবে সাক্ষী এবং সর্বোচ্চ বিচারক আত্মপ্রকাশ করিবেন এবং এমন ক্রোধান্বিত হইবেন যে, ইহার পূর্বে এবং ইহার পরে এমন ক্রোধান্বিত হইবেন না।

(উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছাইয়া দেয়।) ইহা দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী উম্মতের উপর তাবলীগের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে।

(অধিক সংরক্ষণকারী) ফলে যাহার নিকট আমার বাণী পৌঁছানো হইল সে উহা দ্বারা অধিক উপকৃত হইবে এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে উহা হইতে আহকাম ও মাসায়েল আহরণ করিয়া অন্যদিগকে উপকৃত করিবে, যাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণকারী অনেকের পক্ষে সম্ভব হইবে না। তবে এই সম্ভব না হওয়া জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অল্পতার কারণে নহে। বরং তখনকার জন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজ তথা জিহাদ ফী সাবিলীল্লাহর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবার কারণে। যেমন হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াফাতের পর অধিকাংশ ছাহাবা কেরামের ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মহাব্যস্ততার কারণে তাঁহারা জ্ঞান চর্চার সুযোগ পান নাই। সুতরাং এই প্রশ্ন আর থাকে না যে, কোন তাবেয়ীর পক্ষে কোন ছাহাবীর চাইতে অধিক জ্ঞানী হওয়া কিভাবে সম্ভব?

অবশ্য আল্লামা ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, কোন কোন তাবেয়ীর শুধু জ্ঞানগত বিশেষত্বের কারণে এই প্রশ্নের অবকাশ নাই। কেননা ছাহাবা কেরামের সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদাগত অগ্রগণ্যতা সুপ্রমাণিত।

(আমরা বলিলাম, হাঁ) আপনি আপনার উপর অর্পিত বার্তা পৌঁছাইয়াছেন। ছাহাবা কেরামের ন্যায় আমরাও সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, আল্লাহর রাসূল তাঁহার দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করিয়াছেন। রিসালাত ও আমানত যথাযথ রূপে পৌঁছাইয়াছেন এবং উম্মতের পূর্ণ হিতাকাঙক্ষা করিয়াছেন এবং সকল বিপদ মুছীবত বিদূরিত করিয়াছেন এবং আল্লাহর পথে জিহাদের পূর্ণ হক আদায় করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাঁহাকে ঐ সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন যাহা কোন নবীকে তাঁহার উম্মতের পক্ষ হইতে তিনি দান করিয়াছেন। আমীন।

২১৭। মিথ্যা কসমের পরিণাম

وَعَنْ أبي أُمَامَةَ إياس بْنِ ثَعْلَبَةَ الحَارِثِيِّ رضي الله عنه انَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنِ اقْتَطَعَ(٢) حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينه فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ له النارَ، وَحَرَّمَ عليهِ الجنةَ»

فَقالَ رجلٌ: وَإنْ كان شَيْئًا يسيرًا يا رسولَ اللهِ؟ فقال: «وَإنْ قضيبًا منْ أَرَاكٍ» رواه مسلم (١).

হযরত আবু উমামাহ ইয়াস বিন ছা'লাবা আলহারিছী (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি (মিথ্যা) কসমের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক আত্মসাৎ করিল আল্লাহ তাহার জন্য জাহান্নাম অপরিহার্য করিয়া দিবেন এবং জান্নাত তাহার জন্য হারাম করিয়া দিবেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি খুব সাধারণ জিনিস হয়? তিনি বলিলেন, তাহা পিলুগাছের সামান্য শাখা হইলেও একই হুকুম। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য বা মিথ্যা কসমের সাহায্যে মানুষের হক নষ্ট করে তাহাদের জন্য এই হাদীছ হইল চরম সতর্কবাণী। অমুসলমানদের হক নষ্ট করিবার ক্ষেত্রেও এই সতর্কবাণী প্রযোজ্য। নবম হাদীছে এই সংক্রান্ত আলোচনা গিয়াছে।

(জাহান্নাম অপরিহার্য হইবে) যে ব্যক্তি ইহা হালাল মনে করিয়া করিবে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে সে হারামকে হালাল মনে করিবার কারণে কাফির হইয়া চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হইবে। পক্ষান্তরে হারামকে হারাম মনে করিয়া গোনাহ হিসাবে এইরূপ করিলে নির্ধারিত মেয়াদের শাস্তি ভোগ করিবার পর সে জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইবে এবং জান্নাতে দাখেল হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, জাহান্নামের শাস্তি এমনই কঠিন যে, এক মুহূর্তের জন্যও উহা বরদাশত করিবার সাধ্য মানুষের নাই।

আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, এই হুঁশিয়ারি ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাওবার পূর্বে মৃত্যু বরণ করিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ছহী রূপে তাওবা করিবে। অর্থাৎ নিজের কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হইবে এবং হকদারের হক ফেরত দিয়া দিবে তাহার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

বর্তমান যুগের মুসলমানদের অবস্থা বড়ই আফসোসজনক। তাহারা এখন সামান্য সামান্য বিষয়ের জন্য মিথ্যা কসম খাইতে কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে মোটেই দ্বিধাবোধ করে না। অথচ আমাদের পূর্বপুরুষগণের অবস্থা এই ছিল যে, আল্লাহর নামে সত্য কসম করিবার প্রয়োজন হইলেও তাহাদের মনে হইত যেন মাথার উপর পাহাড় ভাংগিয়া পড়িতেছে। মনে হইতেছে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে–

ثم يجيء اقوام تسبق شهادة احدهم يمينه و يمنه شهاده *

অতঃপর এমন কিছু কাওমের আগমন হইবে যাহাদের একজনের সাক্ষ্য তাহার কসম হইতে অগ্রবর্তী হইবে। আবার তাহার কসম তাহার সাক্ষ্য হইতে অগ্রবর্তী হইবে। (অর্থাৎ নির্দ্বিধায় কসম করিবে ও সাক্ষ্য দিবে।)

২১৮। দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি সতর্কবাণী

وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «مَنِ اسْتَعْمَلْناه مِنكُمْ على عَمَلٍ، فَكَتَمَنا مَخِيطًا(٢) فَمَا فَوْقَهُ، كانَ غُلُولاً يَأتِي بِهِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ» فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ اَسْوَدُ مِنَ الاَنْصَارِ، كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْبَلْ عَنِّيْ عَمَلَكَ، قَالَ: «وَمَالَكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «وَاَنَا اَقُوْلُهُ الاٰنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ، فَمَا اُوْتِيَ مِنْهُ اَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهٰى» رواه مسلم ( ).

হযরত আদী বিন আমীরাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তোমাদের মধ্য হইতে যাহাকে আমি কোন কাজে নিযুক্ত করি আর সে একটি সুঁই বা উহার চাইতে বড় কিছু আমার নিকট হইতে গোপন করে তবে তাহা গুলূল (বা খিয়ানত) হইবে যাহা সে কিয়ামতের দিন (ঘাড়ে বহন করিয়া) আনিবে। তখন জনৈক কৃষ্ণকায় আনছারী ব্যক্তি তাঁহার সামনে আসিয়া বলিলেন, (বর্ণনাকারী বলেন) যেন তাহাকে আমি এখনও দেখিতেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার (অর্পিত) কাজ আমার নিকট হইতে ফেরত বুঝিয়া লন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? ছাহাবী বলিলেন, আমি আপনাকে এই কথা বলিতে শুনিলাম। তিনি বলিলেন, আমি ইহা এখনও বলিতেছি, তোমাদের মধ্য হইতে যাহাকে আমি কোন কাজে নিযুক্ত করি সে যেন কম বেশী সকল কিছু হাযির করে। অতঃপর তাহাকে উহা হইতে যাহা কিছু দেওয়া হইবে তাহাই সে গ্রহণ করিবে। আর যাহা হইতে তাহাকে বারণ করা হইবে তাহা হইতে বিরত থাকিবে। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(কোন কাজে নিযুক্ত করি) যেমন যাকাতের মাল, গনীমতের মাল ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার কাজ।

(তবে তাহা গুলূল বা খিয়ানত হইবে) আবু দাউদ শরীফের বর্ণনা এইরূপ–

فهو غل يأتى به يوم القيامة ‌*

তবে তাহা হাতকড়া হইবে যাহা সে কেয়ামতের দিন উপস্থিত করিবে।

ইবনে রাসলান (রহঃ) বলেন, غل হইল লৌহকড়া যাহা দ্বারা কয়েদীর উভয় হাত ঘাড়ের পিছনে বাঁধা হয়। এই অবস্থা হাশরের মাঠেও হইতে পারে। আবার এমনও হইতে পারে যে, জাহান্নামে তাহার হাত ঘাড়ের পিছনে হাতকড়া পরানো অবস্থায় থাকিবে।

মোটকথা, এই বর্ণনায় দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে। যদি সে তাহার হাতে ন্যাস্ত মালের ব্যাপারে খেয়ানত করে তবে উহার পরিমাণ যত সামান্যই হউক তাহাকে কঠিন পরিণতি ভোগ করিতে হইবে। ইহা অতি জঘন্য কাবীরা গোনাহর অন্তর্ভুক্ত।

মুসলিম শরীফের বর্ণনা মুতাবিক সরকারী কর্মচারী যাহা গোপন করিবে কিংবা আত্মসাৎ করিবে তাহা গুলূল বা খিয়ানত রূপে গণ্য হইবে এবং যত কমই হউক উহা ফেরত দিতে হইবে। সকল ইমাম এই বিষয়ে একমত।

(জনৈক কৃষ্ণকায় আনছারী ব্যক্তি) এই ছাহাবীর নাম কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তিনি এই আশংকায় দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি চাহিয়াছিলেন যে, যদি কখনো কোন রকমের ভুল হইয়া যায় তবে তো মহাসর্বনাশ ঘটিয়া যাইবে।

২১৯। খিয়ানতের কারণে শাহাদাতের মর্যাদা বাতিল হওয়া

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فقالوا: فُلانٌ شَهِيدٌ، وَفُلانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا على رَجُلٍ فقالوا: فُلان شَهِيدٌ. فقال النَّبِيُّ ﷺ: «كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ في النارِ في بُرْدَةٍ غَلَّها - أَوْ عَبَاءَةٍ -» رواه مسلم.

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক ছাহাবী বলিতে লাগিলেন, অমুক শহীদ হইয়াছেন, অমুক শহীদ হইয়াছেন। অবশেষে তাহাদের আলোচনা এক ব্যক্তি পর্যন্ত আসিয়া উপনীত হইল। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কখনও নহে। আমি তো তাহাকে একটি চাদর কিংবা একটি আবা খিয়ানত করিবার কারণে জাহান্নামে দেখিয়াছি।
(মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

চিন্তা করিবার বিষয় যে, শাহাদতের ফযীলত ও মর্যাদা কত বেশী যে, তাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ *

যাহারা অল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাহাদিগকে মৃত মনে করিও না। বরং তাহারা জীবিত এবং আপন প্রতিপালকের নিকট রিজিকপ্রাপ্ত।

যাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, বেলা হিসাব তাহারা জান্নাতে চলিয়া যাইবে এবং জান্নাতে তাহাদের জন্য প্রস্তুতকৃত নায-নিয়ামত দেখিয়া তাহারা আকাঙক্ষা করিতে থাকিবে–

ثم احى ثم اقتل ثم احى ثم اقتل *

আমাকে আবার জীবন দান করা হউক আর আমি আবার নিহত হই। আবার জীবন দান হউক আবার নিহত হই।

কিন্তু সামান্য একটি চাদর হয়ত দেখিয়া পছন্দ হইবার কারণে সরাইয়া ফেলিয়াছিল। ফল এই দাঁড়াইল যে, শাহাদাতের ন্যায় এতবড় সৌভাগ্য ও মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হইতে হইল।

বস্তুতঃ ছাহাবা কেরামের জীবনে এই ধরনের ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে উম্মতের জন্য বাস্তব শিক্ষা রাখিয়া যাইবার জন্য। সুতরাং নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করিবার পর (কিংবা আল্লাহ তাঁহার অশেষ রহমতের কারণে মাফ করিয়া দিলে শাস্তি ভোগ না করিয়াই) আল্লাহর রাসূলের ছাহাবী হিসাবে ইনশাআল্লাহ তিনি অবশ্যই জান্নাতে যাইবেন। কিন্তু তাঁহাদের দোষের আলোচনার পরিবর্তে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হইল এই যে, আল্লাহর পথে জীবন দানকারী এক ছাহাবী যদি জাহান্নামের শাস্তি হইতে বাঁচিতে না পারেন তবে আমরা যাহারা পাহাড় সমান গোনাহের বোঝা মাথায় করিয়া কবরে যাইতেছি, আমাদের কি উপায় হইবে?

contents

اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا و رحمتك ارجى عندنا من عملنا *

হে আল্লাহ! আপনার মাগফিরাত ও ক্ষমাগুণ আমাদের গোনাহ সমূহ হইতে অধিকতর প্রশস্ত এবং আমাদের আমলের চাইতে আপনার রহমতই অধিক ভরসার পাত্র।

অনেক ব্যাখ্যাকার এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার অর্থ এই যে, যদি তাহাকে মাফ না করা হয় তবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে ইহা আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি।

আর যদি লোকটি মুনাফিক হইয়া থাকে তবে তো কোন ব্যাখ্যারই প্রয়োজনই নাই।

(চাদর কিংবা 'আবা) পরবর্তী বর্ণনাকারী সন্দেহ করিতেছেন যে, পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী চাদর শব্দটি উল্লেখ করিয়াছিলেন নাকি 'আবা শব্দটি। 'আবা আরবদের পোশাকবিশেষ।

২২০। শহীদ হইলেও ঋণ মাফ হয় না

وَعَنْ اَبِي قَتَادَةَ الحارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ رضي الله عنه عَنْ رَسولِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ قامَ فيهم، فَذَكَرَ لَهم اَنَّ الجِهادَ في سَبيلِ اللهِ، وَالايمانَ بِاللهِ اَفْضَلُ الاَعمالِ، فَقامَ رجلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ في سَبيلِ اللهِ، تُكَفَّرُ عَنِّي خَطاياي؟ فَقالَ له رسولُ اللهِ ﷺ: «نَعم اِنْ قُتِلتَ في سَبيلِ الله وَاَنْتَ صابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غيرُ مدبرٍ» ثم قال رسولُ اللهِ ﷺ: «كيفَ قُلْتَ؟» قال: اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ في سَبيلِ اللهِ، اَتُكَفَّرُ عني خَطاياي؟ فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ وانتَ صابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غيرُ مدبرٍ، اِلَّا الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرِيلَ قال لي ذٰلِكَ» رواه مسلم.

হযরত আবু কাতাদাহ আল-হারিছ বিন রিবঈ (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) ছাহাবা কেরামের মাঝে দাঁড়াইয়া খোতবা দিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন যে, আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান হইল শ্রেষ্ঠ আমল।

তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বলেন, যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই তবে আমার পাপসমূহ মোচন করা হইবে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হাঁ, যদি তুমি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হও এমন অবস্থায় যে, তুমি ধৈর্যধারণকারী, আল্লাহর কাছে ছাওয়াবের আশাকারী এবং অগ্রগমনকারী, পশ্চাদ্‌পসরণকারী নহ।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি বলিয়াছিলে? ছাহাবী আরয করিলেন, আপনি কী বলেন, যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই তবে কি আমার পাপসমূহ মোচন করা হইবে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, যদি তুমি ধৈর্যধারণ কর, (শুধু আল্লাহর কাছে) ছাওয়াবের আশা পোষণ কর। অগ্রমন কর, পশ্চাদ্‌পসরণ না কর। কিন্তু ঋণ মাফ করা হইবে না। জিবরীল (আঃ) আমাকে ইহা বলিয়াছেন। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

অর্থাৎ সুন্নত অনুযায়ী হামদ ও ছানা দ্বারা খোতবা শুরু করিয়া এক পর্যায়ে জিহাদের ফযীলত বর্ণনা প্রসংগে তিনি বলিলেন, (আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করিবার উদ্দেশ্যে) আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা শ্রেষ্ঠ আমল। এখানে এই প্রশ্ন করা ঠিক হইবে না যে, জিহাদকে ঈমানেরও উপর অগ্রগণ্য কেন করা হইল? ঈমান ছাড়া তো কোন আমলই গ্রহণযোগ্য নহে?

কেননা و (এবং) অব্যয়টি দুইটি বিষয়কে একটি উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে শুধু একত্র করে। উভয়ের মাঝে অগ্র-পশ্চাত নির্ধারণ করে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, অন্য হাদীছে তো নামাযকে এবং আরও দুই একটি আমলকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। সুতরাং এই বর্ণনাগুলির মাঝে সমন্বয় সাধনের উপায় কি?

উত্তর এই যে, ঈমান ও জিহাদ সমষ্টিগত দিক হইতে তো সর্বোতভাবেই শ্রেষ্ঠ আমল। তদ্রূপ এককভাবেও ঈমান শ্রেষ্ঠ আমল। তবে এককভাবে জিহাদকে শ্রেষ্ঠ বলিবার অর্থ হইবে এই যে, ঐ সময়ের প্রেক্ষিতে জিহাদের গুরত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অধিক ছিল কিংবা বিভিন্ন প্রশ্নকারীর বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে এক-এক সময় এক-একটি আমলকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এইখানে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে জিহাদকে ঈমানের সংগে যুক্ত করা হইয়াছে। অথচ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে ইসলামের পঞ্চ বেনার মধ্যে ইহাকে উল্লেখ করা হয় নাই। কেননা ইহা সত্য যে, ইসলামের পঞ্চ বেনা- উহার যাবতীয় পূর্ণতা, ফাযায়েল ও উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও ঐ গুলিকে জিন্দা করা এবং সকল দ্বীনের উপর আল্লাহর দ্বীনকে জয়ী করা জিহাদ ছাড়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং দ্বীন ও ইবাদত কায়েম করিবার ক্ষেত্রে জিহাদ হইল মূল। পক্ষান্তরে পঞ্চ বেনার বিশুদ্ধতা ও কবুলিয়াতের ক্ষেত্রে ঈমান হইল মূল। এই কারণেই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে উভয় মৌল বিষয়কে একত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(এমন অবস্থায় যে তুমি ধৈর্যধারণকারী।) অর্থাৎ উপরোল্লেখিত মর্যাদা ও ফযীলত লাভ করিতে হইলে তিনটি শর্ত পালন করিতে হইবে। প্রথমতঃ যুদ্ধজনিত যাবতীয় কষ্ট, যেমন আঘাত, জখম, ক্ষুধা-পিপাসা ইত্যাদির মুখে ধৈর্যধারণ করিতে হইবে। অধৈর্য প্রকাশ না করিয়া হাসি মুখে এইগুলি বরণ করিতে হইবে। যেমন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পবিত্র হাতের একটি আংগুল হইতে রক্ত ঝরিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

و هل انت الا اصبع دميت + و فى سبيل الله ما لقيت

তুমি তো একটি আংগুল মাত্র যাহা রক্তাপ্লুত হইয়াছে। যে কষ্ট তুমি ভোগ করিয়াছ তাহা আল্লাহর পথেই করিয়াছ।

তদ্রূপ হযরত খোবায়ব (রাঃ) কে যখন শূলে চড়ানো হইল এবং চতুর্দিক হইতে তীর বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে ঝাঁঝরা করা হইতে লাগিল তখনও তিনি হাসি মুখে বলিতেছিলেন—

فلست ابالى حين اقتل مسلما + على اى جنب فى الله كان مصرعى

و ذلك فى ذات الا له و ان يشأ + يبارك فى شلو او صال ممزع

যদি মুসলমান রূপে নিহত হই তবে আল্লাহর পথে কোন্ পার্শ্বের উপর আমার মৃত্যু হইল সেই পরওয়া আমি করিব না।[১]

কেননা. এই মৃত্যু তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তিনি চাহিলে ছিন্নভিন্ন অংগ প্রত্যংগের মাঝেও বরকত দান করিতে পারেন।

তদ্রূপ ذات الرقاع যুদ্ধে ছাহাবা কেরামের পা এমন ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল যে, ক্ষতস্থানে নেকড়া পেঁচাইয়া তাহারা হাঁটিতেন এবং খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা চিবাইয়া খাইতেন।

হযরত ছা'আদ (রাঃ)-কে আহত অবস্থায় মসজিদে নববীতে আনিয়া রাখা হইল। রগ ফাটিয়া গল গল করিয়া রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু তাহার শহিদী চেহারায় তৃপ্তির হাসি ছিল অম্লান। কোন অবস্থাতেই ছাহাবা কেরামের ধৈর্যের পাহাড়ে সামান্যতম ফাটলও ধরিত না। এই রূপ ধৈর্যধারণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ এই প্রাণদান শুধু আল্লাহকে খুশী করিবার জন্য এবং আল্লাহর নিকট প্রতিদান লাভের আশায় হইতে হইবে। গনীমতের মাল কিংবা বীরত্বের খেতাব ও সুখ্যাতি লাভের জন্য হইলে কোন ফযীলত ও ছাওয়াব হাছিল তো হইবেই না, উল্টা জাহান্নামের কঠিন আযাব ভোগের কারণ হইবে। যেমন ছহী হাদীছ শরীফে আছে, এক ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে হাযির করা হইবে। আল্লাহ্ তাহাকে আমলের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। সে বলিবে, হে প্রতিপালক! আপনার পথে লড়াই করিয়া শহীদ হইয়াছি। আল্লাহ্ বলিবেন, মিথ্যা বলিয়াছ। তুমি ইহা এই জন্য করিয়াছ যে, মানুষ তোমাকে বাহাদুর বলিবে। তাহা তো বলা হইয়াছে। (সুতরাং আমার নিকট তোমার জন্য কোন প্রতিদান নাই।) অতঃপর আল্লাহর হুকুমে তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। (নাউযুবিল্লাহ)

তৃতীয়তঃ যুদ্ধের ময়দানে পিছু হটিবে না। বরং বুক পাতিয়া দাঁড়াইবে, অর্থাৎ পলায়নের উদ্দেশ্যে পিছু হটা চলিবে না। অবশ্য কৌশল হিসাবে এবং সামরিক প্রয়োজনে পিছু হটাতে কোন আপত্তি নাই।

এই তিনটি শর্তসহ যিনি আল্লাহর রাস্তায় জান দিবেন তাহার যাবতীয় গোনাহ মাফ করা হইবে।

(তুমি কি বলিয়াছিলে?) পূর্ববর্তী উত্তর দ্বারা দৃশ্যতঃ ইহাই বোঝা যাইতেছিলো যে, শাহাদাত দ্বারা হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ সবই মাফ হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, শাহাদাত দ্বারা ঋণ তথা হক্কুল ইবাদ সমূহ মাফ হয় না। হক্কুল্লাহ্ শুধু মাফ হয়। তাই ভুল ধারণার সম্ভাবনা নিরসনের জন্য তিনি প্রসংগটি পুনরায় উত্থাপন করিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রথমবারেই ইহা বলিয়া না দিবার হিকমত কি? উত্তর এই যে, এই ভাবে বলিবার হিকমত বিষয়টির গুরুত্ব অন্তরে দৃঢ়মূল হওয়া। অবশ্য এমনও হইতে পারে যে, হক্কুল ইবাদ মাফ না হইবার বিষয়টি তিনি উত্তর দিবার পর হযরত জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই দ্বিতীয়বারে জানাইয়াছেন।

১। তীরের আঘাতে তাঁহার চেহারা কেবলার দিক হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল। সেই দিকে ইংগিত করিয়া তিনি বলিতেছেন।

প্রথম উত্তর হিসাবে 'জিবরীল আমাকে ইহা বলিয়াছেন' কথাটির অর্থ হইবে এই ঘটনার পূর্বে বলা। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় উত্তর হিসাবে অর্থ হইবে সেই মুহূর্তেই বলা।

২২১। প্রকৃত দরিদ্র কে?

وَعَنْ ابي هُريرَةَ رضي الله عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال: «أتَدْرُونَ ما المُفلِسُ؟» قالوا: المُفْلِسُ فينا مَنْ لا دِرْهَمَ له ولا مَتاعَ فَقالَ: «إن المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَأْتي يومَ القيامَةِ بِصلاةٍ وَصيَامٍ وَزكاةٍ، وَيأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هٰذا، وَقَذَفَ هٰذا وَاَكلَ مالَ هذا، وسَفَكَ دَمَ هٰذا، وَضَرَبَ هذا، فَيُعْطٰى هٰذا مِنْ حَسَناتِه، وَهٰذا مِنْ حَسَناتِه، فَإنْ فَنِيَتْ حَسَناتُه قَبْلَ اَنْ يَقْضِيْ ما عليه، اُخِذَ مِنْ خَطايَاهم فَطُرِحَتْ عليه، ثُمَّ طُرِحَ في النارِ» رواه مسلم(١).

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কি জানো, মুফলিস বা দরিদ্র কে? ছাহাবা কেরাম আরয করিলেন, আমাদের মাঝে দরিদ্র ঐ ব্যক্তি যাহার দিরহাম নাই, অন্য কোন মাল সামানও নাই। তিনি বলিলেন, আমার উম্মতের মুফলিস বা দরিদ্র ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন বহু নামায, রোযা ও যাকাতের আমল লইয়া হাযির হইবে। কিন্তু অবস্থা এমন হইবে যে, সে এই লোককে (অন্যায়ভাবে) গালি দিয়াছে, ঐ লোককে অপবাদ দিয়াছে, এই লোকের সম্পদ আত্মসাৎ করিয়াছে, ঐ লোককে খুন করিয়াছে বা প্রহার করিয়াছে। তখন এই লোককে তাহার নেক আমলের অংশ দেওয়া হইবে এবং ঐ লোককে তাহার নেক আমলের অংশ দেওয়া হইবে। যদি তাহার দায় দেনা শোধ হইবার আগেই তাহার নেক আমল শেষ হইয়া যায় তবে তাহাদের গোনাহ সমূহ তাহাকে দেওয়া হইবে এবং সেইগুলি তাহার উপর চাপানো হইবে। অতঃপর তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। (মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(তোমরা কি জান, দরিদ্র কে?) এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য হইল শ্রোতাদিগকে মূল বক্তব্যের প্রতি সচকিত করিয়া তোলা। কেননা শ্রোতাদের চিন্তায় তো এই প্রশ্নের সাধারণ ও সুপরিচিত উত্তরই বিদ্যমান ছিল, যেমন তাহাদের কথায়ও প্রমাণিত হইল। ইহার পর যখন প্রকৃত উত্তর বলা হইবে তখন সকলের উৎসুক অন্তরে উহা দৃঢ়মূল হইবে। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরনের বিভিন্ন হিকমতপূর্ণ উপায়ে ছাহাবা কেরামকে উপদেশ দান করিতেন। আর উহা তাঁহাদের মর্মমূলে গিয়া প্রবেশ করিত। অতঃপর তাঁহাদের হাত পায়ের আমলের মধ্যে উহার পূর্ণ প্রকাশ ঘটিত।

আল্লামা ইবনুর রাস্‌সা (রহঃ) বলেন, এই হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসংগে জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়াছেন, জ্ঞানীদের জন্য ইহাতে অতি কঠিন হুঁশিয়ারি রহিয়াছে। হে নিজের আমলের ধোকায় পড়িয়া থাকা মানুষ, যে সামান্য কিছু আমল করিয়াই খুশিতে বাগবাগ হইতেছ এবং ভাবিতেছ যে, আমি জান্নাতের মালিক হইয়া গিয়াছি! অন্তর্চক্ষু মেলিয়া নিজের পানে একটু তাকাও এবং

চিন্তা কর, সারা জীবনের কত সামান্য অংশ তুমি আমলে ও ইবাদতে কাটাইয়াছ। তদুপরি এই সামান্য আমলের অতি সামান্য অংশই শয়তানের প্রতারণা, নফসের ধোকা ও রিয়া হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সুতরাং তোমার আমলের খুব সামান্য অংশই হয়ত মাওলার দরবারে কবুল হইয়াছে। কিন্তু সেই গুলিও নিরাপদ নহে। কেননা কোন না কোন পর্যায়ে মানুষকে কষ্ট দেওয়া এবং জুলুম করা হইতে খুব কমই তুমি মুক্ত থাকিয়াছ। সুতরাং কিয়ামতের দিন তুমি যখন ঐ সামান্য পরিমাণ আমল লইয়া হাযির হইবে তখন তোমার বিরুদ্ধে ফরিয়াদকারীদের এক বিরাট দল হাযির হইবে এবং তোমার মাওলার বিচার অনুযায়ী তাহারা তোমার আমল ছিনাইয়া লইবে। শুধু তাহাই নহে নিজেদের গোনাহর বোঝাও তোমার উপর চাপাইয়া দিবে। আর তুমি সর্বহারা ও দিশাহারা অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিবে। কেননা কিয়ামতের দিন মাল দৌলত থাকিবে না, যাহা দ্বারা তুমি মানুষের দায় দেনা শোধ করিতে পার। তাই তোমার নেক আমল ও মানুষের গোনাহের লেন-দেন দ্বারাই উহা শোধ করিতে হইবে। সুতরাং তুমি যদি জীবনভর দিনে রোযা ও রাত্রে নামায পড়িয়াও থাক এবং রহমানের আনুগত্যে তৎপর হইয়াও থাক তবু ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই।

এই যদি হয় নেককারদের অবস্থা তবে আমাদের মত বদকারদের অবস্থা কি হইবে যাহাদের আমলনামায় গোনাহের অন্ধকার ছাড়া কিছুই নাই? সুতরাং যত বেশী সম্ভব ইখলাছের সহিত আমল করিতে থাক এবং গোনাহের জন্য অনুতাপের সহিত তাওবা করিতে থাক এবং অন্যের হক আদায় করিতে থাক। কখনও কাহারও কোন হক নষ্ট করিয়া থাকিলে কিংবা কষ্ট দিয়া থাকিলে দুনিয়ার জিন্দেগীতেই উহার প্রতিকারে সচেষ্ট হও। অতঃপর নিজের আমলের উপর নহে বরং আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করিতে থাক।

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) লিখিয়াছেন, এই রকম অবস্থা তখনই হইবে যখন মানুষ সাধ্য ও সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হক্ক সমূহ আদায় করিবার ব্যাপারে সচেষ্ট না হয়। কিন্তু যদি সে সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াও হক্ক আদায় করিবার কোন উপায় খুঁজিয়া না পায় তবে আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম দয়া ও করুণার নিকট আশা করা যায় যে, তাহার নিয়ত ছহী হইলে এবং তাওবা খাঁটি হইলে আল্লাহ পাক নিজের পক্ষ হইতেই তাহার প্রতিপক্ষদিগকে খুশী করিয়া দিবেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীছে আসিয়াছে যে, আল্লাহ্ কোন বান্দাকে রহম করিতে চাহিলে পাওনাদারকে ডাকিয়া বলিবেন, আমার এই বান্দার হক যদি তুমি মাফ করিয়া দাও তবে তোমাকে আমি খুশী করিব। তখন পাওনাদার খুশী হইয়া তাহার হক মাফ করিয়া দিবে।

২২২। মিথ্যা মামলায় জিতিলেও অন্যের হক হালাল হইবে না

وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «اِنَّما اَنَا بَشَرٌ، وَانَّكم تَخْتَصِمُون اِلَيَّ، وَلَعَلَّ بعضَكُمْ اَنْ يَكُونَ اَلْحنَ بِحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ، فَاَقْضِيْ له بِنَحْوِ ما اَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ له بِحَقِّ اَخِيْهِ فَاِنَّما اَقْطَعُ له قِطْعَةً مِنَ النارِ» متفق عليه .

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি একজন মানুষ মাত্র। তোমরা আমার নিকট ঝগড়া বিবাদের মীমাংসার জন্য আসিয়া থাক। হয়ত তোমাদের কেহ যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনে প্রতিপক্ষের তুলনায় পারদর্শী হইয়া থাক। ফলে আমি যাহা শুনি সেইরূপ ফায়সালা করিয়া থাকি। এই ভাবে যাহাকে আমি তাহার ভাইয়ের হক প্রদানের ফায়সালা করি, মূলতঃ তাহার জন্য আমি এক খণ্ড আগুনেরই ফায়সালা করি। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ফায়দা ঃ

(আমি একজন মানুষ মাত্র) অর্থাৎ কোন মানুষ যেমন গায়বের খবর জানে না তদ্রূপ আমিও গায়বের কোন খবর জানি না, তবে আল্লাহ যাহা জানাইয়া দেন। এইখানে ঐ সমস্ত বিদ'আতীদের রদ হইয়া গেল যাহারা দাবী করে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়ব জানিতেন।

আল্লামা তূরবেশতী (রহঃ) বলেন, এই বাক্যটি দ্বারা হাদীছের বক্তব্য শুরু করিবার উদ্দেশ্য ইহা স্পষ্ট করিয়া দেওয়া যে, মানুষ হিসাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে ভুল ও বিস্মৃত অসম্ভব নহে, অস্বাভাবিকও নহে। তদুপরি মানব স্বভাবের ধারাই ইহা যে, যাবতীয় বিষয়ের বাহ্যিক অবস্থা জানা ও বোঝা তাহার পক্ষে সম্ভব। অন্তর্গত অবস্থা তাহার অজ্ঞাত থাকাই স্বভাবসম্মত।

তবে ইহা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাসুম ও নিষ্পাপ হইবার বিরোধী নহে। কেননা ইছমত ও নিষ্পাপতার সম্পর্ক হইল সজ্ঞানে কৃত ভুল বা অন্যায়ের সহিত। পক্ষান্তরে আলোচ্য বিষয়টি অর্থাৎ পক্ষ বিপক্ষের যুক্তি শ্রবণ করা এবং এক পক্ষকে সত্যবাদী ভাবিয়া তাহার অনুকূলে ফায়সালা করা- ইহার সহিত ইছমত ও নিষ্পাপতার কোন সম্পর্ক নাই। কেননা যেই সকল বিষয়ে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে কোন অহী নাযিল হয় নাই সেই সকল ক্ষেত্রে অন্যান্যদের মত তাঁহার প্রতি আদেশ ছিল ইজতিহাদ করিবার। ইজতিহাদের মাধ্যমে যে ফায়সালায় উপনীত হওয়া যাইবে উহাই ইনছাফ। যেমন উম্মে সালামাহ (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীছেরই অন্য বর্ণনায় আছে– আমি তো আমার রায় ও বিচার শক্তি দ্বারা তোমাদের মাঝে ফায়সালা করিয়া থাকি।

আল্লামা আল-আকূলী (রহঃ) বলেন,

আলোচ্য হাদীছ প্রমাণ করে যে, বিচারাদির ক্ষেত্রে অন্যদের যে অবস্থা হইবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও সেই অবস্থা হইতে পারে। কেননা তাঁহার প্রতিও আল্লাহর হুকুম হইল বাহ্যিক অবস্থার উপর মানুষের মাঝে ফায়সালা করা।

বস্তুতঃ ইহা মানব সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর অপরিসীম করুণারই একটি বহিঃপ্রকাশ, যাহাতে মানুষ লজ্জা ও অপদস্থতা হইতে নিরাপদ থাকিতে পারে এবং আল্লাহর ভয়কে গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার ভিত্তি রূপে গ্রহণ করিতে পারে। পক্ষান্তরে যদি গায়বের বিষয় মানুষ জানিতে পারিত তবে বিচার মোকদ্দমার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন হইত না এবং প্রত্যেকের মনের অভিপ্রায় ও ইচ্ছা অনাবৃত হইয়া পড়িত। ফলে মানুষের লজ্জার কোন শেষ থাকিত না। বরং পৃথিবীতে জীবন ধারণও অসম্ভব হইয়া যাইত।

ইহা হইল সাক্ষীনির্ভর বিচার ও ফায়সালা প্রদানের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে শরীয়তের আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক স্বয়ং তাহাকে যাবতীয় ভুল ও বিচ্যুতি হইতে হিফাযতে রাখিবার ঘোষণা দিয়াছেন। সতরাং এই ক্ষেত্রে তাহার কোন ভুল হইতে পারে না। ইহাছাড়া সাক্ষীনির্ভর ফায়সালার ক্ষেত্রে কোন ফায়সালাকে ভুল বলা যাইতে পারে না। এতটুকু শুধু বলা যাইতে পারে যে, ইহা বাহ্যিক অবস্থা মুতাবিক একটি ফায়সালা যাহা অন্তর্গত অবস্থার অনুকূল হয় নাই। তবু তাহা বিশুদ্ধ। কেননা তাহা শরীয়তের বিধান তথা দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(যাহাকে আমি তাহার ভাইয়ের হক প্রদানের ফায়সালা করি) অর্থাৎ যদি কাহারও যুক্তি প্রমাণের অকাট্যতা এবং উহা উপস্থাপনের চমৎকারিত্বে প্রভাবিত হইয়া আমি তাহার স্বপক্ষে ফায়সালাও করি এবং অন্যের হক তাহাকে দিয়া দেই তবে সে যেন তাহা গ্রহণ না করে। কেননা ইহা তাহার জাহান্নামে যাইবার কারণ হইবে।

হাদীছের শিক্ষা ঃ হাদীছের শিক্ষা এই যে, আদালতের রায় এবং বিচারকের বিচার যদি কাহারও পক্ষে যায় অথচ সে জানে যে, তাহার দাবী মিথ্যা তবে তাহার অবশ্যকর্তব্য হইল আল্লাহকে ভয় করিয়া প্রতিপক্ষের হক ফিরাইয়া দেওয়া। কেননা বিচারের রায়ের কারণে দুনিয়ার আইনগত বৈধতা যতই থাকুক তাহাতে অন্যের হক তাহার জন্য জায়েয হইবে না। দুনিয়ার আদালত এবং তাহার ফায়সালা সবই ক্ষণস্থায়ী। আখিরাতে আল্লাহর আদালতই হইল আসল আদালত এবং উহার ফায়সালাই হইবে চিরস্থায়ী। সুতরাং আল্লাহর আদালতের ভয় প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে জাগরূক থাকা উচিত।

২২৩। অন্যায় রক্তপাতের পরিণাম

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ. «لَنْ يَزالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينه ما لم يُصِبْ دَمًا حَرامًا» رواه البخاري .

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন; মুসলমান সর্বদা তাহার দ্বীনের ক্ষেত্রে অবকাশের মাঝে অবস্থান করিতে থাকে। যতক্ষণ না সে অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহিত করে। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

অর্থাৎ একজন মুসলমান যদিও বিভিন্ন কাবীরা গোনাহে লিপ্ত হয় তথাপি সে তাহার দ্বীন ও ঈমানের কারণে আল্লাহর রহমত আশা করিতে পারে। হয় আল্লাহ তাহাকে তাওবার তাওফীক দান করিবেন; ফলে সে অনুতপ্ত হইয়া তাওবা করিয়া ফেলিবে। কিংবা আপন দয়াগুণে আল্লাহ তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন। এই আশা ও অবকাশ ততক্ষণ বাকি থাকিবে যতক্ষণ অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা না করিবে। যখনই সে কাহারও রক্ত দ্বারা অন্যায় ভাবে আপন হাত রঞ্জিত করিবে অর্থাৎ হত্যা করিবে তখনই তাহার সকল পথ সংকীর্ণ হইয়া যাইবে এবং সে আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশদের দলভুক্ত হইয়া যাইবে। আর কোরআন শরীফে ইরশাদ হইয়াছে—

وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ *

তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না। নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমত হইতে কাফির সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কেহ নিরাশ হয় না।

বিষয়টি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদীছে খুবই পরিষ্কারভাবে আসিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে–

من اعان على قتل مؤمن و لو بشطر كلمة لقى الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله *

যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে হত্যা করিবার কাজে একটি শব্দের ভগ্নাংশ দ্বারাও সাহায্য করিবে সে (কেয়ামতের দিন) আল্লাহর সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, তাহার দুই চোখের মধ্যস্থলে 'আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ' বাক্যটি লেখা থাকিবে।

মোটকথা, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা অন্যায়ভাবে হত্যা ও রক্তপাতের ভয়াবহতা প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ এই জঘন্য কাজের শাস্তি হিসাবে ইহাই উপযুক্ত। অবশ্য আল্লাহ্ পাক শিরক ছাড়া অন্য যে কোন গোনাহ্ মাফ করিতে চাহিলে করিতেও পারেন। আবার শাস্তিও দিতে পারেন। তদ্রূপ খাঁটি অন্তরে তাওবার সমস্ত শর্ত পূরণ করিয়া তাওবা করিলে আল্লাহ্ তাহার তাওবা কবুল করিতে পারেন। তাঁহার মাগফিরাতকে বাধা দিবার কেহ্ নাই।

তবে ইহাও সত্য যে, আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের ভরসায় যাহারা গোনাহ্ করে খুব কমই তাহাদের তাওবা নছীব হয়। কেননা ইহা মহাপরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের শানে চরম বেআদবী ও ধৃষ্টতা প্রদর্শনের শামিল। আর–

بے آدب محروم گشت از فضل رب *

মহান প্রতিপালকের রহমত হইতে বে-আদবরা মাহরূম হইয়া থাকে।

আল্লামা তাবরানী হযরত কাতাদাহ হইতে নিম্নোক্ত হাদীছ সংযুক্ত সনদে [১] বর্ণনা করিয়াছেন–

لن يزال العبد فى فسحة من دينه ما لم يشرب الخمر، فاذا شربها خرق الله عنه ستره و كان الشيطان و ليه و سمعه و بصره و رجله يسوقه الى كل شر و يصرفه عن كل مرقاة *

বান্দা যতক্ষণ মদ পান না করে ততক্ষণ সে তাহার দ্বীনের ক্ষেত্রে অবকাশের মাঝে অবস্থান করে। যখন মদ পান করে তখন আল্লাহ্ তাহার উপর হইতে আপন (হিফাযতের) পর্দা ফাড়িয়া ফেলেন। ফলে শয়তান তাহার অভিভাবক হয়, তাহার কান, চোখ ও পা হয়। প্রতিটি মন্দের দিকে সে তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় এবং (কল্যাণের) প্রতিটি সোপান হইতে তাহাকে সরাইয়া দেয়।

আল্লামা হারাবী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা বোঝা যায় যে, সামগ্রিকভাবে সকল কাবীরা গোনাহ্ হইতে বিরত রাখাই এই জাতীয় হাদীছগুলির উদ্দেশ্য। তবে যখন যে বিষয়টি উল্লেখ করিবার প্রয়োজন ছিল তখন সে বিষয়টি উল্লেখ করা হইয়াছে শুধু।

১। অর্থাৎ সনদটি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত উন্নীত। হাদীছের পরিভাষায় ইহাকে মারফূ হাদীছ বলে।

২২৪। আল্লাহর মালে খেয়ানতের পরিণাম

وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ عامِرٍ الأنصارِيَّةِ، وَهِيَ امْرَأَةُ حَمْزَةَ رضي الله عنه وعنها، قالت: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنَّ رجالاً يَتَخَوَّضُونَ في مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النارُ يومَ القِيامَةِ» رواه البخاري

হযরত হামযা (রাঃ)-এর স্ত্রী হযরত খাওলা বিনতে ছামির আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, নিঃসন্দেহে এমন কিছু লোক আছে যাহারা আল্লাহর মালে (অর্থাৎ মুসলমানদের জাতীয় ও সরকারী সম্পদে) অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করে। কিয়ামতের দিন তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের আযাব। (বুখারী শরীফ)

ফায়দা ঃ

হস্তক্ষেপ করিবার অর্থ নিজে আত্মসাৎ করা। কিংবা অপচয় করা এবং যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা। এক কথায় শরীয়তের বিধান মুতাবিক ব্যবহার না করিয়া নিজ খেয়াল খুশি মত ব্যবহার করা।

সম্ভবতঃ এই হাদীছ দ্বারা ভবিষ্যত উম্মতের মাঝে আগমনকারী লোকদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। অথাৎ এমন এক সময় আসিবে যখন কিছু লোক মুসলমানদের সম্পদ লইয়া ছিনিমিনি খেলা শুরু করিবে। কিংবা সেই যুগের মুনাফিক শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে। কিংবা যাহারা বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে না করিয়া শিথিলতা করিতেন তাহাদিগকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে। আল্লাহ-ই সর্বোত্তম জানেন।